ভারতবর্ষ

শ্রাবণ, ১৩৩১

দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রথম খণ্ড | দ্বাদশ বর্ষ

ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরবাদ

অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী

ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা মতভেদ প্রচলিত আছে। দেহাত্মবাদী চার্ব্বাক, ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই, তাঁহার মতানুসারীরা ঐহিক ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন রাজা-কেই ঈশ্বর বলেন। চার্ব্বাক মতে মরণই মোক্ষ, কাজেই ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞানের কোনও আবশ্যকতাই অনুভূত হয় না।

বুদ্ধমতানুসারীরা বুদ্ধদেবকেই ঈশ্বর বলেন।

দিগম্বরেরা 'অর্হৎ'কেই ঈশ্বর বলিয়াছেন। যাঁহাদের 'কেবল' জ্ঞান বা অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহারা 'অর্হৎ'। তপোবিশেষের প্রভাবে মোহক্ষয় হইলে পঞ্চ জ্ঞানাবরণ দর্শনাবরণচতুষ্টয় ও পঞ্চ অন্তরায়ের অন্ত হয়। এই অবস্থায় 'কেবল' জ্ঞানলাভ হয় ও তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞ নামে অভিহিত হন। "আপ্তমীমাংসা"র প্রারম্ভে আচার্য্য সমন্তভদ্র এইরূপ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের সত্তার প্রমাণ দেখাইয়াছেন,—

"সূক্ষ্মান্তরিতদূরার্থাঃ প্রত্যক্ষাঃ কস্য চিদ্ যথা।
অনুমেয়ত্বতোহগ্ন্যাদিরিতি সর্ব্বজ্ঞসংস্থিতিঃ॥"

(৫ শ্লোক)

"অষ্টসহস্রীতে" বিদ্যানন্দ স্বামী ইহার অর্থ করিয়াছেন যে, সূক্ষ্ম পরমাণ্বাদি, কালান্তরিত রামচন্দ্রাদি, দূরস্থ হিমালয় প্রভৃতি, কোনও পুরুষের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, যে হেতু তাহা অনুমেয়। যাহা অনুমেয়, তাহা কাহারও প্রত্যক্ষও হয়, দৃষ্টান্ত পর্ব্বতীয় বহ্নি প্রভৃতি। এই সূক্ষ্মাদি পদার্থের যিনি প্রত্যক্ষকর্ত্তা, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ 'অর্হৎ'। এই 'অর্হৎ'ই দিগম্বর মতে ঈশ্বর। তাই, বিশ্ববিশ্রুত আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী, তাঁহার "ঈশ্বরপ্রতিপত্তিপ্রকাশে" লিখিয়াছেন,—"দিগম্বরাস্তু......স্থিরম্ অর্হন্তম্ ঈশ্বরম্ উপযন্তি।" —(২ পৃঃ)

পূর্ব্বোক্ত এই মতবাদগুলি অবৈদিক বলিয়া বেদানুযায়ী দর্শন শাস্ত্রে ইহাঁদের সিদ্ধান্ত সমূহ খণ্ডিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক, জরন্নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট, বৌদ্ধ জৈন সম্প্রদায়ের মতবাদ তৎকৃত "ন্যায়মঞ্জরীর" নানা স্থানে খণ্ডন করিলেও তিনি এক স্থানে (২৬৭-৭২ পৃঃ) বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরই সকল শাস্ত্রের প্রণেতা। তিনিই সকল প্রাণীর নানা প্রকার কর্ম্মবিপাক অবলোকন পূর্ব্বক করুণাসম্পাতে তাহাদিগকে অনুগৃহীত করিবার জন্য অপবর্গ লাভের বহু মার্গ থাকায় প্রত্যেকের কর্ম্মানুসারে কাহারও কোনও কার্য্যে যোগ্যতা বুঝিয়া তাহাদিগকে সেই সেই উপদেশ করেন এবং নিজের বিভূতিমহিমায় নানা শরীর পরিগ্রহ করিয়া নামভেদ প্রাপ্ত হন। 'অর্হৎ' 'বুদ্ধ' ইত্যাদি নামে ঈশ্বরই অভিহিত হইয়া থাকেন। যে হেতু, নানা সর্ব্বজ্ঞ আপ্ত কল্পনায় গৌরবের আপত্তি হয়। যদি বল, বুদ্ধ ত শুদ্ধোদনের অপত্য, সে কেমন করিয়া ঈশ্বর হইবে? ইহার উত্তর ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণই দিয়াছেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

শরীরই শুদ্ধোদন হইতে জাত,—আত্মা নহে। এই জন্যই শাস্ত্রবিদেরা বলিয়া থাকেন, "প্রতিযুগং বিষ্ণুরেব ভগবান্ ধর্ম্মরূপেণাবতরতি" প্রতিযুগে ভগবান্ বিষ্ণুই ধর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হন।

এখন শঙ্কা হইতে পারে, বৌদ্ধাদি আগমান্তরও যদি বেদকর্ত্তা ঈশ্বরেরই প্রণীত হয়, তবে সেই সকল আগম, শিষ্ট-পরিগৃহীত হয় নাই কেন? – হয় নাই এই জন্য যে, যাহাদের তাদৃশ কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়াছেন, সেইরূপ কতিপয় প্রাণীকেই ভগবান্ সেই পথে অনুগৃহীত করিয়াছেন। বৈদিক মার্গে অসংখ্য প্রাণী শ্রেয়োলাভ করিয়াছে, এই জন্য তাহাতেই অধিক আদর দেখা যায়। এক ঈশ্বরই সর্ব্ব শাস্ত্রের কর্ত্তা হইলে পরস্পর বিরোধ কেন, ইহা বলা সঙ্গত নহে, – বেদেও পরস্পর বহু বিরোধ-বাক্য আছে।

এই ভাবে জয়ন্ত ভট্ট, বর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রাণ আস্তিক-চূড়ামণি হইলেও জৈন বৌদ্ধ শাস্ত্রেরও ঈশ্বর-প্রণীতরূপে প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। তিনি অবৈদিক শাস্ত্র বিশেষকেও ঘৃণা করিতেন না। সে পথেও যে, কর্ম্মানুসারে তথাকথিত কতিপয় জীবের শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, ইহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার—

"নানাবিধৈরাগমমার্গভেদৈরাদিজশ্যমানা
বহবোঽভ্যুপায়াঃ।
একত্র তে শ্রেয়সি সম্পতন্তি সিন্ধৌ প্রবাহা
ইব জাহ্নবীয়াঃ॥"

এই লেখা—'মহিম্নঃ স্তোত্রের'—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

এই শ্লোকার্দ্ধ স্মরণ করাইয়া দেয়। আস্তিক—বেদধর্ম্মানুগত দার্শনিক-গ্রন্থকার সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ উদারতা দেখিতে পাই নাই।

পাতঞ্জল দর্শনে "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ"—(১।২৪) এই সূত্রে যে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, ক্লেশাদির দ্বারা সম্বদ্ধ হন না, তাঁহাকেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

ন্যায়-বৈশেষিক-মতে ঈশ্বর জগৎকর্ত্তা। "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ"—(৪।৩।১৯) এই গৌতম সূত্র ঈশ্বরের উপাদানকারণত্বে পূর্ব্বপক্ষস্বরূপ হইলেও ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতাপক্ষে সিদ্ধান্তবাক্যই। উৎপন্ন বস্তু মাত্রেরই একজন চেতন কর্ত্তা আছে,—কর্ত্তা ব্যতিরেকে কাহারও উৎপত্তি হয় না। কুম্ভকার না গড়িলে ঘট হইত না। এখন এই দৃষ্টান্তে সাগর-ভূধরাদিরও একজন চেতন কর্ত্তা আছে, স্বীকার করিতে হইবে। সে কর্তৃত্ব অস্মদাদির সম্ভবপর নহে। যিনি এই কর্ত্তা, তিনি ঈশ্বর। এইরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হয়। মহাকবি ও মহাদার্শনিক শ্রীহর্ষও তাঁহার "নৈষধ-চরিত" মহাকাব্যের সপ্তদশ সর্গে "মানবাশক্যনির্ম্মাণা কুর্ম্মাদ্যঙ্কবিলা শিলা।" ইত্যাদি শ্লোকে ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে এইরূপ অনুমানেরই উল্লেখ করিয়াছেন। বেদেও ঈশ্বর-সাধক প্রমাণ আছে,— "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব এক ইতি।"—নারায়ণোপনিষৎ, ৩।২

ভগবদ্গীতাতেও উদ্ঘোষিত হইয়াছে,—

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥"

ঈশ্বরের আটটী গুণ,—বুদ্ধি, ইচ্ছা, যত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ।—

"সংখ্যাদয়ঃ পঞ্চ বুদ্ধিরিচ্ছা যত্নোঽপি চেশ্বরে।"—
(ভাষাপরিচ্ছেদ)

'ন্যায়বার্ত্তিক'কার উদ্দ্যোতকর, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও যত্ন স্বীকার করেন নাই,—তাঁহার মতে সংখ্যাদি পাঁচ ও বুদ্ধি এই ছয়টীমাত্রই ঈশ্বরের গুণ। (ন্যায়বার্ত্তিক, ৪৬৪ পৃঃ) বার্ত্তিককারের এই সিদ্ধান্ত শ্রীধরাচার্য্যের "ন্যায়কন্দলী"তে উল্লিখিত হইয়াছে (১)। "তাৎপর্য্যটীকা"য় বাচস্পতি মিশ্র ইহার খণ্ডন করিয়াছেন (২)। "ন্যায়বার্ত্তিক"কার পরে কিন্তু আবার বলিয়াছেন, বুদ্ধির ন্যায় ইচ্ছাও ঈশ্বরের গুণ (৩)। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্তভট্ট, ঈশ্বরের দশটী গুণ স্বীকার করেন। তাঁহার মতে সংখ্যাদি পাঁচ ও জ্ঞান, সুখ, ইচ্ছা, যত্ন, ধর্ম্ম—এই দশটী ঈশ্বরের গুণ (৪)। ঈশ্বরের যে ধর্ম্ম একটী গুণ, তাহার আভাষ ন্যায়ভাষ্যেও পাওয়া যায়। বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন,—

"সঙ্কল্পানুবিধায়ী চাস্য ধর্ম্মঃ"—(ন্যায়ভাষ্য, ৪।১।২১)

ঈশ্বরের ত জীবের মত কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠান নাই, তবে ঈশ্বরে 'ধর্ম্ম' কেমন করিয়া থাকিবে? ইহার উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—ঈশ্বরের বাহ্যানুষ্ঠান না থাকিলেও 'সঙ্কল্প'রূপ অনুষ্ঠানেই তাঁহাতে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, আর সেই ধর্ম্মের ফলই হইল—অণিমাদি ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বর নিজের ধর্ম্মপ্রভাবেই প্রত্যাত্মবৃত্তি ধর্ম্মাধর্ম্মকে অনুগৃহীত অর্থাৎ ফলোন্মুখ করেন। কিন্তু ঈশ্বরে যে 'ধর্ম্ম' আছে, ইহা প্রকৃত সিদ্ধান্ত নহে,—"ন্যায়বার্ত্তিক"কার লিখিয়াছেন,—

"ন চেশ্বরে ধর্ম্মোঽস্তীতি"—(৪৬৪ পৃঃ) এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ, 'তাৎপর্য্যটীকা'র ৪১৮—২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৈশেষিক সূত্র ও প্রশস্তপাদ ভাষ্যে জীবাত্ম-নিরূপণের ন্যায় স্পষ্টভাবে ঈশ্বর-নিরূপণের কোনও প্রস্তাব দেখিতে না পাইয়া অনেকে বলেন যে, বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বর স্বীকার করা হয় না। তাঁহাদের মত এই যে, বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত—এই ষড়্দর্শনে একটীর পর একটী দর্শন, নিরীশ্বর ও সেশ্বরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। বৈশেষিক, নিরীশ্বর, ন্যায়, সেশ্বর, সাংখ্য, নিরীশ্বর, পাতঞ্জল সেশ্বর; মীমাংসা নিরীশ্বর, বেদান্ত সেশ্বর। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বৈশেষিক দর্শন সেশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী নহে। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝা এম-এ মহোদয়, হিন্দী ভাষায় "বৈশেষিক দর্শন" নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কেন যে—"ঔর ফির বৈশেষিক শাস্ত্রকে প্রাচীন গ্রন্থোঁ মেঁ ঈশ্বর য়া পরমাত্মা কী চর্চ্চা নহী পাঈ জাতী।" এ কথা লিখিলেন, বুঝিতে পারি না। বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তপাদ ভাষ্যের প্রথমেই আছে,—

"প্রণম্য হেতুমীশ্বরং——"

ভাষ্যের টীকায় শ্রীধরাচার্য্য লিখিয়াছেন,—নির্ব্বিশেষণ 'হেতু' পদের দ্বারা ঈশ্বর যে সমস্ত উৎপত্তিমান্ বস্তুর নিমিত্ত কারণ, তাহাই প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে (কন্দলী, ২ পৃষ্ঠা) তা'র পর, ভাষ্যকার, দ্রব্যাদি ষট্পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান, নিঃশ্রেয়সের হেতু, এই কথা বলিয়া লিখিয়াছেন,—

"তচ্চেশ্বরচোদনাভিব্যক্তাদ্ ধর্ম্মাদেব।"

"কন্দলী"তে শ্রীধর ঈশ্বরচোদনার অর্থ করিয়াছেন,—ঈশ্বরেচ্ছাবিশেষ (৮ পৃঃ)। "কিরণাবলী"তে উদয়নাচার্য্য 'ঈশ্বরনোদনা' এই পাঠ অনুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

(১) "অন্যে তু বুদ্ধিরেব তস্যাব্যাহতা ক্রিয়াশক্তিরিত্যেবং বদন্ত ইচ্ছাপ্রযত্নাবপ্যনঙ্গীকুর্ব্বাণাঃ ষড়্গুণাধিকরণোঽয়মিত্যাহুঃ।"—
(কন্দলী, ৫৭ পৃঃ)

(২) বুদ্ধিবদিচ্ছাপ্রযত্নাবপি তস্য নিত্যৌ সকর্তৃকত্বসাধনান্তর্গতৌ বেদিতব্যৌ। জ্ঞানচিকীর্ষাপ্রযত্নসমবায়লক্ষণত্বাৎ কর্তৃত্বস্য, তেষাঞ্চ পরম্পরাবিনাভাবাৎ অন্যতরসিদ্ধাবিতরয়োঃ সিদ্ধেঃ।'—
(তাৎপর্য্যটীকা, ৪২৫ পৃঃ।)

(৩) "ইচ্ছা তু বিদ্যতেঽক্লিষ্টাঽব্যাহতা সর্ব্বার্থেষু যথা বুদ্ধিরিতি।"
—(বার্ত্তিক, পৃঃ ৪৬৬।)

(৪) "তদেবং নবভ্য আত্মগুণেভ্যঃ পঞ্চ জ্ঞানসুখেচ্ছাপ্রযত্নধর্ম্মাঃ সন্তীশ্বরে।"—(ন্যায়মঞ্জরী, ২০১ পৃঃ)

“ঈশ্বরনোদনা উপদেশো বেদ ইতি যাবৎ”—

(কিরণাবলী, ১১ পৃঃ)

“তত্র দ্রব্যাণি পৃথিব্যপ্‌তেজোবায্বাকাশকালদিগাত্ম-মনাংসি—” এই ভাষ্যাংশে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই বলিয়া শ্রীধরাচার্য্য টীকায় লিখিয়াছেন,—

“ঈশ্বরোঽপি বুদ্ধিগুণত্বাদাত্মৈব—” (কন্দলী, ১০ পৃঃ)

ঈশ্বরেরও যখন ‘বুদ্ধি’ একটী গুণ, তখন তাহা আত্মাই। কাজেই ‘কন্দলী’র ব্যাখ্যানুসারে ঈশ্বর, আত্মপদার্থেরই অন্তর্ভূত।

প্রশস্তপাদ ভাষ্যের সৃষ্টিসংহার-নিরূপণের প্রস্তাবে ত ঈশ্বরেচ্ছার প্রভাবে কেমন করিয়া সৃষ্টি ও সংহার হয়, তাহার বিশদ বিবরণ প্রকাশিত আছে (৪৮—৪৯ পৃঃ)। তা’র পর, প্রশস্তপাদ, ভাষ্যের শেষে শ্লোকাকারে লিখিয়াছেন যে,—

“যোগাচারবিভূত্যা যস্তোষয়িত্বা মহেশ্বরম্।
চক্রে বৈশেষিকং শাস্ত্রং তস্মৈ কণভুজে নমঃ॥”

—যিনি যোগসমৃদ্ধির প্রভাবে মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া বৈশেষিক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই কণাদকে নমস্কার। ‘কিরণাবলী’তে উদয়নাচার্য্য, ‘উপস্কারে’ শঙ্কর মিশ্র ও ‘ন্যায়কন্দলী-পঞ্জিকা’য় রাজশেখর, বৈশেষিক শাস্ত্র রচনা সম্বন্ধে ভাষ্যকারের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কাজেই বৈশেষিক শাস্ত্রকার, মহর্ষি কণাদ ঈশ্বর স্বীকার করিতেন না, এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। “সংজ্ঞা কর্ম্ম ত্বস্মদ্‌বিশিষ্টানাং লিঙ্গম্।”—(১।১।১৮) এই সূত্রে ত মহর্ষি কণাদ, ঈশ্বর-সাধক অনুমান প্রণালীরই ইঙ্গিত করিয়াছেন (৫)।

তা’র পর, কণাদের মতে ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়াই বেদ প্রমাণ। তিনি লিখিয়াছেন,—

“তদ্‌বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।”—(১।১।৩)

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর মিশ্র ‘উপস্কারে’ বলিয়াছেন,—“তদ্‌বচনাৎ তেন ঈশ্বরেণ প্রণয়নাদাম্নায়স্য বেদস্য প্রামাণ্যম্।” শঙ্কর মিশ্র এখানে ‘তৎ’ শব্দের দ্বারা প্রসিদ্ধরূপে ঈশ্বরের গ্রহণ করিয়াছেন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, তাঁহার ‘কণাদসূত্রবিবৃতি’তে বলিয়াছেন,—‘তৎ’ শব্দ এখানে ঈশ্বরেরই বাচক, কেন না, ওঁ, তৎ, সৎ—এই তিনটী ব্রহ্মের নাম। তিনি প্রমাণরূপে ‘ওঁ তৎসদিতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ’ গীতাবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ‘তৎ’ শব্দ যে ব্রহ্মবাচক, তাহা আমরা “তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো”—এই মহাবাক্যেও দেখিতে পাই।

ব্রহ্মবাদীরা বেদান্তবেদ্য, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ পরমাত্মাকেই পরমেশ্বর বলিয়াছেন। ইহাঁরা “যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ—” “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”—ইত্যাদি শ্রুতিকেই ঈশ্বরের সাধকরূপে উপস্থাপিত করিয়া থাকেন।

পাঞ্চরাত্রিকাদি শাস্ত্রে বিষ্ণুকেই ঈশ্বর বলা হইয়াছে। ‘মুক্তাফল’কারের মতে বিষ্ণু পাঁচ প্রকার। প্রথমতঃ সাকার ও নিরাকার ভেদে দ্বিবিধ। সাকার আবার পুরুষ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ভেদে চারিপ্রকার। নিরাকার বিষ্ণুর আর কোনও প্রকার-ভেদ নাই, তাহা একরূপই।

বৈদিক দর্শনের মধ্যে সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই।

বিবিধ শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ করিয়া আচার্য্য উদয়ন ‘কুসুমাঞ্জলি’তে বলিয়াছেন,—

“ইত্যেবং শ্রুতিনীতিসংপ্লবজলৈর্ভূয়োভিরাক্ষালিতে
যেষাং নাস্পদমাদধাসি হৃদয়ে তে শৈলসারাশয়াঃ।”

কিন্তু তিনি আশা করেন,—

“কালে কারুণিক ত্বয়ৈব কৃপয়া তে তারণীয়া নরাঃ॥”

(৫) সংজ্ঞা নাম, কর্ম্ম কার্য্যং ক্ষিত্যাদি, তদুভয়মস্মদ্‌বিশিষ্টানাং ঈশ্বরমহর্ষীণাং সত্ত্বেঽপি লিঙ্গম্।...তথা হি ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবদিতি।”—উপস্কার।

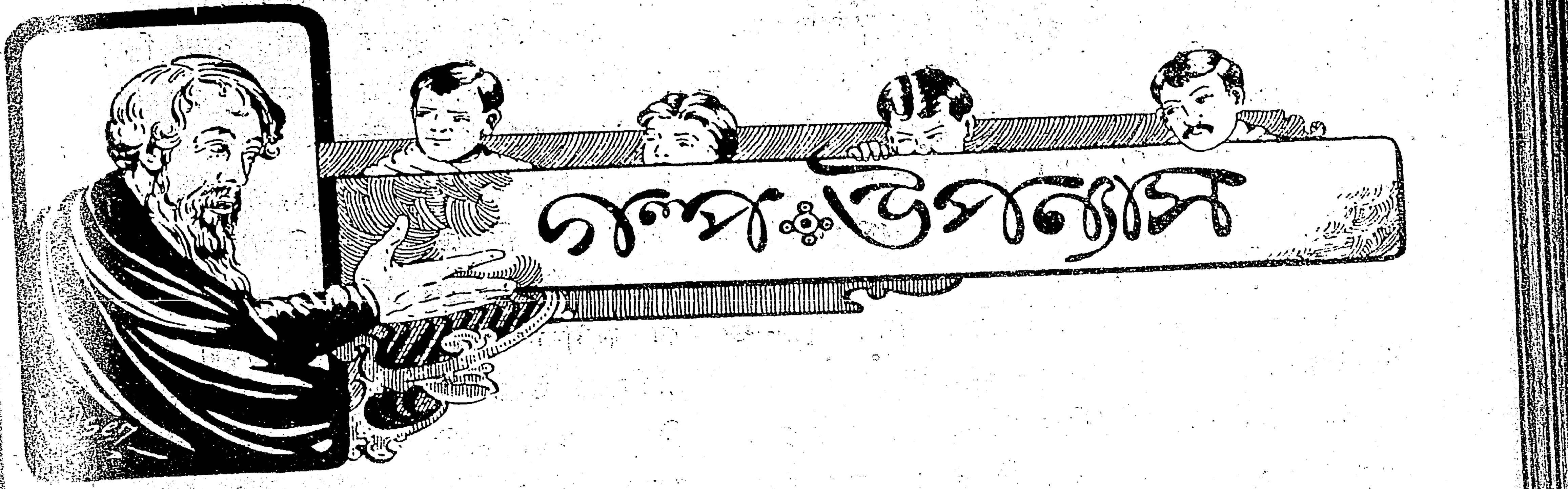

দানের মর্য্যাদা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১৫

রেখা আসিয়া বলিল “ব্যাপারখানা কি ?”

সতী তখন একখানা সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিল, চোখ তুলিয়া বলিল “কিসের ব্যাপার ?”

রেখা বলিল “আর যে তোমার দেখাই পাওয়া যায় না। একজামিন দিয়ে সত্যিই একেবারে কুনো ভূত হয়ে হয়ে পড়লে যে দেখছি। বাইরের জগতের সঙ্গে একেবারেই সব সম্পর্ক উঠিয়ে ফেললে ? চেহারাও তো খুব ভাল হয়েছে দেখছি, সব রকমেই চরম উন্নতি !”

সতী একটু হাসিয়া হাতের কাগজখানা টেবিলের উপর রাখিল, বলিল, “বস, দাঁড়িয়ে থেকেই চলে যাবে না কি ?”

রেখা পাশের চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া বসিল, বলিল, “ব্যাপারখানা প্রায় তেমনিই বটে। ভদ্রলোককে যে অভ্যর্থনা করতে জানে না, তার ঘরে মোটে আসতেই নেই। আমি এসেছি প্রায় আধঘণ্টা, নীচে যে এতক্ষণ ধরে চেঁচাচ্ছিলুম, অবশ্য সেটাও কাণে গ্যাছে ; কিন্তু তুমি না কি আমায় ভাগিয়ে দেবার চেষ্টাতেই ছিলে, তাই জেনেও কাণ দাও নি। ভেবেছিলে নীচে হতেই আমি চলে যাব, আর এখানে আসব না ; কিন্তু বড় দুঃখের কথা, তোমার আশাটা পূর্ণ হল না।”

সতী তাহার হাতখানা নিজের কোলে টানিয়া লইয়া একটা টিপ দিয়া বলিল, “ঠিক, মনের কথাই টেনে বের করেছ বটে।”

রেখা হাতখানা টানিয়া লইল, “থাক ভাই, অতটা টিপুনির আদর আমার সয় না। মুখে যা বলবে বল, ওরকম সাংঘাতিক টিপুনি দিও না, ওতে ব্যথাই লেগে থাকে।”

সতী বলিল, “সত্যি বলছি, কাগজটা পড়তে পড়তে ভারি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম, কোনও কথা কাজেই শুনতে পাই নি।”

“কেন, এতে কোনও ‘লাভ-সিকনেসের’ কথা আছে না কি, কোথাও কোনও অভাগিনী জো, তার লাভারের ভাবনায় আত্মহারা—”

বলিতে বলিতে সে কাগজখানা তুলিয়া লইল।

সতী হাসিয়া বলিল, “তুমি দিন-রাত কেবল লাভের স্বপ্নই দেখছ ! কোথায় কোন অভাগিনী জো, কোথায় কোন হতভাগা লাভার,—তোমার জাগন্তে ঘুমে কেবল লাভ। আমাদের তো অত লাভ দেখবার সময় নেই ভাই। যদি কোনও নভেল পড়তুম, তাও না হয় বলতে পারতে। এটা যে টাইমস পত্র, এর মধ্যে খবর ছাড়া আর কিছু নেই।”

রেখা চট করিয়া কাগজখানার হেডিং দেখিয়া লইয়া রাখিয়া দিল, বলিল "এ সব পত্রেও অনেক খবর পাওয়া যায়; দুঃখের বিষয় সবই ট্র্যাজেডিতেই দাঁড়ায়। আর নভেল তুমি পড়বে কি, তোমার বুকের মধ্যেই একটা জীবন্ত নভেল রয়েছে। নভেল পড়তে পড়তে যখন কোন বিরহিণীর পানে চোখ পড়ে—তখন—চোখ দিয়ে দর দর ধারে—"

সতী তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল "দূর—তা না কি হয়?"

রেখা মুখ সরাইয়া বলিল "দেখ, যার বুকে কেবল লাভ থাকে, সে জগতে আর কিছুই দেখতে পায় না। দেখে যায় কেবল লাভ, লাভ ছাড়া এ জগতের অস্তিত্ব যে আছে, তা সে স্বীকার করতেই চায় না। তুমি কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সায়মন লী'র পদ্যটা পড়েছ, যেখানে কবি বলছেন—হে পাঠক, তুমি যদি গল্প ভালবাস, অর্থাৎ তোমার হৃদয় যদি কল্পনা-প্রবণ হয়, তবে জগতে প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই গল্প দেখতে পাবে; মনে হবে, গল্প ছাড়া এ জগতে কিছুই নেই। আমিও তাই বলি, যে লাভার সে জগতে লাভ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না।"

সতী বলিল "আমার মধ্যে তুমি কি দেখতে পেলে?"

রেখা বলিল "দেখছি কেবল লাভ। এত দিন পড়ার চাপে সেটা লুকিয়ে পড়েছিল, ভারটা সরে যেতেই সে উছলে উঠেছে। তোমার চোখে মুখে ফুটে বেরুচ্ছে।"

সতী পরাভব মানিয়া বলিল, "তোমার কাছে কারও তো পারবার যো নেই। তুমি নিজেই কবি, চট করে একখানা কাব্য লিখে ফেল, খুব নাম হবে, লোকে একখানা কেন, পাঁচখানা করে কিনবে।"

রেখা বলিল "বাকি আছে কেবল সেইটা। দেখা যাক, লিখব ঠিকই, তা জেনো। তোমার নাম দিয়ে করব। নায়িকা হবে তুমি, আর নায়ক—"

সপরিহাসে সতী বলিল "সেটি কে হবে?"

রেখা গম্ভীর মুখে বলিল "কেন, তা বুঝি ঠিক করি নি ভাব্‌ছ? পথের থেকে যে সে একটা লোককে কুড়িয়ে আনা চলবে না, তুমি তাতে বেজায় চটে উঠবে। ঠিক তোমার লাভারটীকেই দাঁড় করাব, সে জন্যে ভাবনার কোন কারণ নেই।"

সতী বলিল "বুঝতে পেরেছ, সে কে?

রেখা বলিল "বুঝতে আবার পারা কি? চোখের সামনে দেখেও কানা হয়ে থাকব? তোমার বাপ, মা, ভাই না বুঝতে পারেন, কিন্তু আমায় তা বলে অবুঝ ভেব না। তোমার মুখ, তোমার চোখ, এরাই তোমায় আমার কাছে ধরিয়ে দিয়েছে। তবু যদি জানতে চাও—"

রেখা উঠিয়া, ঠিক টেবিলের ধারেই দেয়ালে মনীশের যে ফটোখানা ছিল, সেইটা পাড়িয়া সতীর সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—"তবে এই দেখিয়ে দিলুম। আশা করছি, আমার এই স্বলব্ধ ভাবটা সার্থক হয়েছে, নেহাৎ মাঠে পড়ে মারা যায় নি।"

সতীর মুখখানা নিমেষে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া সে বলিল, "মাঠে পড়ে মারা-ই গ্যাছে সত্যি! কোনও সার্থকতা লাভ করতে পারলে না এটা আবিষ্কার করে।"

রেখা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "এখনও বলছো মারা গ্যাছে? চোখ মুখের ভাব তুমি লুকাবে কি করে সতী, তোমার মুখ চোখই যে বলে দিচ্ছে, আমার আবিষ্কার যথার্থ হয়েছে। আর এতে লজ্জা করবার কি আছে, কি ভেবে তুমি লুকাতে চাচ্ছ এ কথা? আমি এর মধ্যে এত লুকালুকি করবার কারণ কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। তুমি আমাকে বন্ধু বল, তবে বন্ধুত্ব হবে কি করে? আমার কোন কথাটা তোমার কাছে গোপন আছে তা বল?"

আজ ছয় সাত মাস হইল রেখার বিবাহ হইয়াছে, স্বামীর কথা, পত্রাদি সবই সে এই বাল্য সখীটির কাছে বলিয়া ও দেখাইয়া বড় তৃপ্তিলাভ করিত। সতী সে কথা স্মরণ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "না, তুমি সবই বল। আমারও যদি বলবার মত কথা হত রেখা, আমি সব কথা তোমায় জানাতুম। আমার কথা বলবার মত নয় বলেই আমি তোমার কাছে পর্য্যন্ত গোপন করে গেছি।"

রেখা চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া একটা হাই তুলিয়া বলিল, "এটাতে তোমায় দোষী করা যায় না; কারণ, মানুষের মনের যা স্বাভাবিক কাজ, তোমার মনেও তাই হয়েছে। আজন্মকাল মনীশবাবুকে দেখে আসছ, তাঁর প্রকৃতি কেমন তাও জানো, তবে জেনে শুনে কি করে

তাঁকে ভালবাসলে আমি তাই জিজ্ঞাসা করি? আমি লোকটাকে একবার দেখেই বুঝেছি বড় সাংঘাতিক। এত তফাতে সরে গেছি—যেন তাঁর নাগাল আর না পেতে হয়। তুমি জেনে শুনে—"

বাধা দিয়া সতী বলিল "মনের ওপরে হাত নেই ভাই।"

উত্তেজিত হইয়া রেখা বলিল, "হাত নেই এমন কথা বল না। মন যা চাইবে, তাকে তাই যে দিতে হবে, এমন কোনও কথা থাকতে পারে না। মন যদি একটা অসৎ কাজ করতে যায়, তাকে ফিরাবার চেষ্টা না করে তাকে সেইটেই করতে দেবে? মনীশবাবুকে ভালবাসা—এর মত অপরাধজনক কাজ আমার বোধ হয় আর নেই। যে শিক্ষিতা মেয়েদের আদবে দেখতে পারে না—সে তার আদরও বুঝবে না। মনকে ফিরিয়ে নিয়ে এস সতী, আমি তোমার এ গর্হিত কাজে কখনই মত দেব না।"

সতী মলিন হাসিল।

রেখা রাগ করিয়া বলিল, "আরও একটা কথা—মনীশবাবু ভালবাসা কাকে বলে তা জানেন না। অস্বাভাবিক এমন এক একটা কথা বলে বসেন, যা শুনলে রাগে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে যায়। সেবার তোমাদের বাড়ীতেই আমার সঙ্গে তাঁর বেজায় রকম তর্ক বেধে গেল; তাতে কিছুতেই তিনি মানতে চান না, ভালবাসা একটা জিনিস। মায়ের ভালবাসা সে আলাদা কথা; কিন্তু আর কোনটাই তাঁর কাছে দাঁড়াতে পারে না। বিশেষ শিক্ষিতা মেয়েদের ভালবাসা—এ তিনি অগ্রাহ্য করে একেবারেই উড়িয়ে দেন। তিনি প্রমাণ করতে চান, এরা কিছুতেই প্রকৃত ভালবাসতে জানে না, ভালবাসার অভিনয় করে যায় মাত্র।"

সতী বলিল, "তাঁকে সে বিষয় নিয়ে কথা বলতেই বা যাবে কে? তাঁর মনের ভাব তাঁতেই থাক।"

রেখা বলিল "তবু তুমি তাঁকে ভালবাসবে?"

সতী হাসিল, বলিল, "তুমি তোমার স্বামীকে ভালবাস রেখা!"

রেখা সলজ্জ হাসিল।

সতী বলিল, "আমিও তেমনি ভালবাসি। তোমার ভয় নেই, নিজের মর্য্যাদা হারিয়ে ফেলব না। বরং আমার মনে হয়, এতে আমার মর্য্যাদা বাড়বে। নিজেকে নিঃস্ব করে বিলিয়ে দেব না, আমি যা—তাই-ই থাকব। কোনও দিন আপনার বলে কাছে যাব না, পর বলে এমনি দূরেই থাকব।"

রেখা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "একেবারেই অনর্থক। জীবনের সার্থকতা দেখছি কিছুই লাভ হল না তোমার।"

সতী বলিল, "অনর্থক নয় ভাই, এরই মধ্যে পাওয়ার সুর বেজে উঠছে। ত্যাগেই ভোগ, পাওয়াকে ভোগ বলে না। যদি যথার্থ সার্থকতা লাভ বল, তবে এরই মধ্যে থেকে তা আমি পাব। তোমরা বলবে—ভালবাসার জিনিসকে কাছে পাওয়াই সুখের, কিন্তু আমার তা মনে হয় না। চাঁদ দূরে থাকে বলেই সুন্দর, বাতাস দূর থেকে এসে স্পর্শ করে যায় বলেই মনোরম। যদি এদের কাছে পেতুম, ভোগ করতুম, তবে এরা এমন সুন্দর হতে পারত না। গাছে যে গোলাপ ফুলটী ফুটে থাকে, দূর হতে দেখতেই তা ভাল, তাকে তুলে নাও, সে শুকিয়ে ঝরে যাবে। যা ভাল, যা ভালবাসার জিনিস, আমি বলি সে দূরে থাক্, দূর হতে দেখতেই সে ভাল। আমি তাকে বড় ভালবাসি—আমার নিজের চেয়েও ভালবাসি, কিন্তু তাকে কাছে পেতে চাই নে। আমি ত্যাগের মধ্যে ভোগের যে স্বাদ পেয়েছি, তা তোমরা বুঝতে পারবে না। আমি কিছু চাই নে—এমন কি—তাঁকে দেখতেও চাই নে। তাঁর কাছ হতে বহু দূরে সরে গিয়ে আমি থাকব, তাঁর স্মৃতিটা শুধু মনের মধ্যে জাগিয়ে নিয়ে। আমার এ ভালবাসাকে ব্যর্থ বল না রেখা, এর সার্থকতা তুমি বুঝতে পারবে না।"

সতী মুখ ফিরাইল, তাহার কণ্ঠস্বরটা অত্যন্ত ভারি হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

রেখা স্তব্ধ ভাবে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর আবেগভরে তাহার একখানা হাত টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "যথার্থ ভালবাসতে শিখেছ সতী। জানো সে নারীদ্রোহী, সে জগতের সব নারীকেই সন্দেহের চোখে দেখে,—কাউকে ভালবাসতে পারবে না, কাউকে বিশ্বাস করতে পারবে না। তবু তার ওপরে তোমার এই ভালবাসা, এ যথার্থই অপার্থিব রত্ন। জগতে আদান প্রদান চলছেই, কেউ শুধু নিয়েই হাসতে হাসতে চলে যেতে পারে না;

তাকেও দিয়ে যেতে হয়। মনীশবাবু যে শুধু নিয়ে যাবেন, জেতার অহঙ্কারে যে তাঁর বুকটা পূর্ণ হয়ে থাকবে, এ কখনই হবে না। তাঁকেও পরাভব স্বীকার করতে হবে, দিতে হবে।"

সতী হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিল, বলিল, "কিন্তু সে সম্পূর্ণ মিথ্যেই হবে। আমি তাঁর কাছ হতে এক বিন্দু কিছু নেব না। যা দিয়েছি, তা আর ফিরাবার যো নেই, নইলে ফিরাবার চেষ্টাই করতুম। অনেক চেষ্টা করে দেখেছি, আমার জীবনে তাঁর স্মৃতি আমায় ছাড়বে না।"

রেখা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, "তবু যদি বল সতী—"

বাধা দিয়া সতী বলিল "কি, চেষ্টা করবে ?"

একটু কষ্টের হাসি তাহার মুখের উপর তরঙ্গ তুলিয়া গেল।

রেখা বলিল "তোমার নাম করে নয়, অন্যের নাম করে—"

সতী তাহার বড় বড় দুটি চোখ রেখার মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "না, এ জন্মে নয় রেখা, এ জীবনে আমি তাঁর স্ত্রী হ'তে পারব না। আমার সব কথাই বলেছি, তাঁর সম্বন্ধে একটা কথা আমি জেনেছি—কিন্তু তা বলতে ও—"

সে থামিয়া গেল, রেখা সাগ্রহে বলিল, "বলতে পারবে বই কি। না বললে আমার চেষ্টা আমি ছাড়ব না।"

সতী বলিল, "আমি জেনেছি, তিনি একটি মেয়েকে ভালবাসেন, কিন্তু—"

রেখা অধৈর্য্য হইয়া বলিল; "আবার কিন্তু কি ?"

সঙ্কোচ দূর করিয়া ধীর স্বরে সতী বলিল "একজনের চিন্তা তাঁর বুকে আছে,—তিনি বউদিদির বোনকে ভালবাসেন।"

রেখা চোখ দুইটী কপালে তুলিয়া বলিল, "সে তো বিধবা।"

সতী বলিল "হ্যাঁ, সে বিধবা। আমি তোমায় এটা অনুমান করে বলেছি মাত্র। অবশ্য এটা তোমরা কেউই ধরতে পারনি। কিন্তু একটা কথা আছে—যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত পড়ে। তাই আমি এ কথাটা জানতে পেরেছি। উমার নাম করতে তাঁর আনন্দোৎফুল্ল মুখ, আমার সন্দেহের সত্যতা প্রতিপন্ন করছে। অবশ্য আমি এ বলতে পারব না, তাঁর এই গোপন ভালবাসা—ভালবাসার পাত্রীর সামনে কখনও ব্যক্ত হয়েছে। বউদির মুখে যেমন শুনি, তাতে জানতে পারি, তার দিদির মত যথার্থ শিক্ষিতা মেয়ে খুব কম। আর এটাও জেনো—লোকে চায় তার ভালবাসার পাত্র বা পাত্রী যেন উন্নতই হয়, সে যেন অবনত না হতে পারে। যথার্থ ভালবাসা দেখবে সেখানে যেখানে কেউ কাউকে অক্ষত, উন্নত রাখতে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়। মনীশ বাবু নিজের বুকেই নিজের কথা লুকিয়ে রেখেছেন, সে কথা আর কেউ জানে না। তাঁর ভাবে বোধ হয়—তিনি উমা ছাড়া আর কোনও নারীর অস্তিত্ব মানতে চান না। আমার দাদা, বাবা, মা আমার এ কথা কোনও ক্রমে জানতে পারলে নিশ্চয়ই মনীশ বাবুকে বলবেন আমায় বিয়ে করতে। খাতিরে পড়ে তিনি রাজি হলেও হতে পারেন। কিন্তু সে বিয়ে করে আমার লাভ কি ? আমার অভীপ্সিতকে হয় ত আমি পাব। কিন্তু যেমন ভাবে পাবার কথা, তেমন ভাবে তো পেলুম না। এ পাওয়ায়, আমার সার্থকতা কি রেখা, আমি এমন পাওয়া পেতে চাই নে।"

রেখা চুপ করিয়া রহিল। এই গভীর, মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলার যে কি উত্তর দিবে, সে তাহা ভাবিয়াই পাইতেছিল না।

ঊষা বারাণ্ডা হইতে ডাকিতেছিল "দিদি—ও দিদি,"

তাহার কণ্ঠ আনন্দ-পূর্ণ।

সতী বলিল, "এই ঘরে আছি বউদি।"

শিশুর মত খিল্-খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে ঊষা গৃহে প্রবেশ করিয়াই রেখাকে দেখিয়া হাসি বন্ধ করিয়া ফেলিল। হাতে দুখানা পত্র ছিল—তাড়াতাড়ি কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া সে রেখার পানে চাহিয়া রহিল। বাস্তবিক রেখাকে সে মোটেই শ্রদ্ধা ভক্তি করিত না। বিবাহের পরেই এই বাড়ীতে পদার্পণ করিতে করিতে রেখা তাহার সম্বন্ধে যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা বেশ তাহার মনে আছে।

রেখা হাসিয়া বলিল, "গলাটা কি বন্ধ করে দিলুম ভাই

বউদি। আমি বাঘ কি সাপ নই যে, সামনে দেখে ভয়ে একেবারে কথা বন্ধ হয়ে যাবে ?"

সতী বলিল "এস বউদি, পত্র দু'খানা এসেছে বুঝি, দেখি কার পত্র ? রেখার কাছে লজ্জা কি, আমিও যা রেখাও তাই।"

রেখা মুখখানা কপট গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ করিয়া বলিল, "ইস্ তা আর হতে হয় না। তুমি হচ্ছো স্বামীর বোন, যাকে বলে ননদিনী, তাই। আর আমি তোমার একটী বন্ধু মাত্র। তাতে—আমার একটু না কি স্পষ্টবাদিতা রোগটা আছে,—যার যা দোষ গুণ সামনেই বলে দেই। এতে অনেকেই যে আমায় দেখতে পারে না, এই বউদিটী তাদের মধ্যে একজন। বউদি, রাগ করো না ভাই,—সত্যি কথা বল তো, কোনও দিন সকালে আমার মরণ প্রার্থনা না করে জল খাও কি না ? আর তোমাদের ওই পাড়াগাঁগুলোতে মেয়েরা আঙ্গুলগুলো যেমন মাটীতে রেখে মটকিয়ে বলে, হে যম, তুমি অমুককে নাও, তেমনি বল কি না ?"

ঊষা ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠিল; আরক্ত মুখে বলিল, "হ্যাঁ, তাই বলি বই কি, তোমার কথা আমার মোটে মনেই থাকে না।"

রেখা বলিল "মনে পড়লে নিশ্চয়ই বলতে ?"

সতী হাসিয়া বলিল, "কি কর ভাই, ছেলেমানুষটাকে কেন জ্বালাতন করে মারছ ? বেচারা নেহাৎ ভালমানুষ, কিছু বোঝে না। এস বউদি, চেয়ারটাতে বস।"

ঊষার চোখ দুইটী অভিমানে জলে ভরিয়া উঠিতেছিল; সতী তাহার কটি বেষ্টন করিয়া আনিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিল, বলিল, "কার পত্র এল দেখাও তো বউদি, সত্যি বলছি, আমি রেখাকে দেখাব না।"

আড়ে আড়ে রেখার দিকে তাকাইয়া ঊষা পত্র দু'খানা সতীর হাতে দিল। হাসিয়া উঠিয়া রেখা বলিল, "বউদি, চোখে একজোড়া চশমা দিয়ো, তোমার চাউনিটা ভাই বড্ড খারাপ। আমি না কি মেয়েমানুষ তাই ঘুরে পড়িনি,—পুরুষ কেউ হ'লে এতক্ষণ চেয়ার শুদ্ধই তিন হাত ঠিকরে গিয়ে পড়ত।"

ঊষা গর্জ্জিয়া উঠিয়া যাইতেছিল,—সতী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "পাগলামি কর, বলেই তো লোকে তোমায় আরও ক্ষেপায়। চুপ করে বস দেখি, রেখা আর কথা খুঁজেই পাবে না। এখানা তোমার দিদির দেখছি, এখান হতেই আসছে।"

ঊষা বলিল "দিদি এখানে এসেছে। লিখেছে দানীশ দা' কাল আমায় নিতে আসবে, মাকে পাঠাবার জন্যে আলাদা পত্রও দিয়েছে। দিদি, তুমি যাবে ?"

রেখা ধমকের সুরে বলিয়া উঠিল "ও কেন যাবে ? তোমার দিদি, সতীর কে ?"

সতী তখন আর একখানা পত্র খুলিতেছিল। ঊষা রাগ করিয়া উঠিয়া গেল, সে দিকে তাহার দৃষ্টিই রহিল না।

এ পত্রখানা মনীশ লিখিয়াছে তাহাকে,—পত্র আসিতেছে রংপুর হইতে। রংপুরে তাহার মামাতো ভাই কলেজের প্রফেসর, মনীশ সেখানে বেড়াইতে গিয়াছে। সে সতীকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছে, উমা কলিকাতায় যাইতেছে, সতী যেন ঊষাকে লইয়া অন্ততঃ একবেলা গিয়াও উমার সহিত দেখা করিয়া আসে।

সতী পত্রখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রেখার দিকে ফিরিল।

রেখা বলিল, "কার পত্র ?"

সতী পত্রখানা তার হাতে দিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "পড়ে দেখ।"

রেখা পত্র পড়িয়া বলিল, "সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—তা হলে অবশ্য যাওয়া উচিত ?"

সতী বলিল "দেখা যাক।"

রেখা উঠিল; বিদায় লইবার সময়ে বলিল, "আমারও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তুমি ওই লোকটার সঙ্গ এড়িয়ে চলো। ওকে জানতে দিয়ো না, তুমি ওর কাছে পরাজিত হয়েছ, নিজের নারী-শক্তিকে এমন করে মাটীতে লুঠতে দিয়ো না। বিজেতার আসন পাওয়া মানুষের সাধনার ফল, তাকে তা তুমি স্বেচ্ছায় দিতে পারবে না।"

(১৬)

উমা পূর্ব্বেই মনীশদাকে একখানা পত্র দিয়াছিল আসিবার জন্য; কিন্তু মনীশদা আসিল না, আসিল দানীশ।

উমা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "মনীশ দা' এলেন না দানীশ ?"

দানীশ মাথা চুলকাইয়া উত্তর দিল, "তিনি তো কলকাতায় নেই, রংপুর চলে গেছেন।"

উমা সবিস্ময়ে বলিল "রংপুর, সেখানে কেন?"

দানীশ বলিল "কি জানি? স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে বলে বেরিয়ে পড়লেন। সেখানে আমার এক দাদা থাকেন সেই জন্যে গেছেন।"

কলিকাতা গমনের উৎসাহ উমার যেন চলিয়া গেল। সে বড় আশা করিতেছিল, কলিকাতায় গিয়া মনীশদার ভুল ধারণার জন্য তাঁহাকে খুব কথা শুনাইয়া দিবে, তাঁহাকে বিশেষরূপ জব্দ করিয়া ছাড়িবে। সে যে আবার বিবাহ করিবে, এই কথাটা মনীশদা কেমন করিয়া অসংশয়িত চিত্তে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছেন, তাহা উমা কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

আর সেই প্রভাস লোকটা? তাহার কথা ভাবিতে উমার হৃদয় ঘৃণায়, লজ্জায়, রাগে ভরিয়া উঠিতেছিল। সে চট করিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল? সে যদি তাহার সামনে এখন একবার আসে, তাহা হইলে উমা তাহাকে বেশ গোটাকত কথা শুনাইয়া দিবে, তাহাও সে ঠিক করিয়া রাখিল।

অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিতই সে দানীশকে জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা দানীশ, মনীশদা গিয়ে কোনও কথা বলেছে না কি?"

দানীশ বিস্ময়ে বলিল "কি কথা?"

উমা বলিল "এই—কোন বিয়ে-টিয়ের সম্বন্ধে—"

দানীশ একটু ভাবিয়া শেষে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কই, আমি কিছু শুনিনি তো। নাঃ, দাদা কিছু বলেনি, বললে শোনা যেত।"

খুব নিশ্চিন্ত হইয়া উমা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। বগলাদেবীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর-মা, তুমি যাবে না?"

বগলাদেবী প্রথমটায় সবেগে মাথা নাড়িলেন—"না!"

তাহার পর কি ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা চল, একবার উষাকে দেখে আসব'খন। এর পর কোন্ দিন মরে যাব—আর হয় তো দেখাই হবে না।" তাঁহার কাশী যাত্রার কথা ইদানিং বড় একটা আর শুনা যাইত না। যাত্রার সময় অমরনাথ বলিলেন, "সাত আট দিনের মধ্যেই ফিরে এস মা। খালি বাড়ীতে আমি থাকতে পারব না। উষাকে যদি পাঠায়—তবে—" তিনি খানিক ভাবিলেন, তাহার পর বলিলেন "তবে নিয়ে এস। আর যদি না পাঠায়—তবে কাজ নেই।"

উমা ও বগলাদেবী দানীশের সহিত কলিকাতায় আসিয়া পৌছিল। দানীশের মা বগলাদেবীকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন; কারণ তিনি এই প্রথম তাঁহার বাড়ীতে পদার্পণ করিলেন। উমা কয়েকবার আসিয়াছিল, সে তাঁহাকে নিজের মায়ের মতই জানিত। তাহার সম্বর্দ্ধনা করার বিশেষ আবশ্যকতাও ছিল না।

শুচিপরায়ণা বগলাদেবী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া চারিদিক পানে চাহিতেছিলেন, "কি নোংরা বাড়ী, নিচেটা যেন সেঁৎসেঁৎ করছে। কেমনতর বিশ্রী গন্ধ! এখানে নাকি মানুষ থাকতে পারে।"

উমা একটু হাসিয়া বলিল "কলকাতার বাড়ী সামনে দেখতেই ভাল ঠাকুর-মা, ভেতরে দেখতে গেলেই এমনি।"

তেমনি মুখখানা করিয়াই বগলাদেবী বলিলেন, "এর চেয়ে আমার সে পাড়াগাঁ অনেক ভাল। এখানে না আছে রোদ, না আছে বাতাস। কলকাতায় লোকে থাকে কি করে? গলিগুলোতে তেমনি গন্ধ ছুটছে। না, উমা, তুই শিগগির আমায় টেনে বের করে দেশে নিয়ে চল বাবু, আমি একটা দিনও এখানে থাকতে পারব না।"

উমা বলিল, "বাঃ, আজই তো সবে এলে ঠাকুরমা, এখনিই যেতে চাচ্ছ? তবেই হয়েছে তোমার গঙ্গাস্নান আর কালীঘাট দেখা। উষাকে আনতে হবে, তবে তো। তার সঙ্গে দেখা শুনা না করে তুমি যাবে কি করে?"

বগলাদেবীকে দ্বিতলে বসাইয়া রাখিয়া উমা মনীশের মায়ের সাহায্যার্থ চলিয়া গেল।

বগলাদেবী সন্ধ্যা লাগিতেই সেখানেই শুইয়া পড়িলেন। এখানে তিনি কোন মতেই শয়নার্থ গৃহের মধ্যে যাইবেন না। উমা বলিল "তোমার সন্ধ্যেবেলা শোওয়া অভ্যাস ঠাকুরমা, শোও গিয়ে। রাত পর্য্যন্ত জেগে থাকলে এর পরে যদি কিছু হয়, তখন দোষ দেবে আমাদেরই।"

বগলাদেবী রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "তুই আমায় মেরে ফেলে দিতে চাস উমা? ওই ঘরের মধ্যে—একলা আমি

কক্ষনো শুতে পারব না। তুই এখানে বসে থাকবি, আর আমি—"

তিনি প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিলেন। এই পল্লীগ্রামের সেকেলে বৃদ্ধাটীর কথাগুলা মনীশের মায়ের হাসি আনিয়া ফেলিতেছিল। কষ্টে তিনি হাসি সামলাইয়া বলিলেন, "আপনি তবে ততক্ষণ এখানেই শুয়ে পড়ুন মা, উমা যাবার সময় আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবে'খন।"

নিশ্চিন্ত হইয়া বগলাদেবী উমার পাশে শুইয়া পড়িলেন এবং মুহূর্ত্তেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

উমা একটু হাসিয়া মনীশের মায়ের পানে চাহিয়া বলিল, "বড় ভীতু লোক খুড়িমা, চিরটাকাল পল্লীগ্রামেই আছেন কি না। এবার কি মন হয়েছে তাই এসেছেন, নইলে একবার আনবার চেষ্টা করেছি, কিছুতেই আসেন নি। উষা উষা করে বুড়ি পাগল হয়ে গ্যাছে—দেখতে এসেছেন। উষাকে তো তারা আর পাঠাবে না সেখানে—যে উষাকে দেখবেন।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উমা পথের দিকে চাহিল।

খুড়িমা বলিলেন, "মেয়েটার ভারি কষ্ট হয়েছে উমা, আজকাল তবু কতকটা সামলে গেছে। আমার মতে—যাকে যেমন শিক্ষা দিয়ে মানুষ করা হয়, তাকে তেমনি ঘরেই দিতে হয়। তোমাদের খাঁটি হিন্দু ঘরের মেয়ে, দিয়েছ সাহেব-ঘেঁসা লোকের বাড়ী—যেখানকার আহারাদি আলাদা, আচার বিচার কিছু নেই। এরা মনে ভাবে—এই শ্রেষ্ঠ জীবন নির্ব্বাহ করা। নিজেদের যা—তা ভাসিয়ে দিয়ে একেবারে পরের মতে চলা। মনীশ বলে, আমরা গর্ব্ব করে ইংরেজের ভাবটা নিই, ইংরেজী আচার, আহার সবই নিই, কিন্তু ইংরেজ তো আমাদের কিছু নেয় নি। দেড়শ বছর হয়ে গ্যাছে ইংরেজ আমাদের প্রতিবেশী,—কেউ বলতে পারবে না তারা আমাদের একটা কিছু নিয়েছে। কিন্তু আমরা তাদের সবটাই নিই। এতে যে তারা আমাদের যথার্থ প্রশংসা করে তা নয়। মুখে সম্প্রীতি দেখালেও অন্তরে তারা ঘৃণার ভাবই পুষে রাখে মাত্র। কুকুরের চেয়েও অধম বলে তারা আমাদের ভাবে।"

মনীশদার উন্নত হৃদয়ের কথা মনে করিয়া উমা বলিল, "মনীশদা বুঝেছেন ঠিক। তাই যা বলেন সবই ঠিক হয়। মনীশদার সঙ্গে আমার সব মতেরই মিল হয় খুড়িমা, তাই মনীশদাকে আমার বড় ভাল লাগে।"

খুড়িমা বলিলেন, "কিন্তু একটা মতের সঙ্গে তো মিল হয় নি মা।"

কথাটা ধাঁ করিয়া উমার মনে পড়িয়া গেল, তথাপি সে জিজ্ঞাসা করিল "কি মত খুড়িমা?"

কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া খুড়িমা বলিলেন "বিধবা বিয়ের।"

উমা বলিল "আগে বলুন, মনীশদা কি বলেন, তার পর আমি সব বলছি।"

খুড়িমা বলিলেন, "বিধবা বিয়ের পক্ষপাতী সে মোটেই নয়। সে বলে এতে আমাদের সমাজের অমঙ্গল সাধনই করা হবে, মঙ্গল কিছুতেই করা হবে না। যদি মঙ্গল হতো, তবে এ বিয়েটা অনায়াসেই সমাজে প্রচলিত থাকত। যখন নেই—তখন জানা যায়,—এটাতে মঙ্গল নেই বলেই নেই। সে বলছে বহু পুরাতন এক যুগে বিধবা বিয়ে আমাদের দেশেই প্রচলিত ছিল, সে তা অস্বীকার করছে না। কিন্তু সে বিয়েতে কোনও মঙ্গল উৎপন্ন করতে পারে নি বলেই সেটা সমাজে রহিত হয়ে গ্যাছে। সেই অমঙ্গলকর জিনিসটা সে আবার সমাজে ফিরিয়ে এনে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটাতে অসম্মত। এই মতটার সঙ্গে তোমার মত তো মিলল না মা।"

উমা একটু হাসিয়া বলিল, "ঠিক মিলেছে খুড়িমা। আপনি যদি ভেবে থাকেন আমি বিধবা বিয়ের পক্ষপাতিনী, তা হলে ভুল করেছেন। মনীশদাও এই ভুল করে সেখান হতে চলে এসেছেন, আর পাছে আমার সঙ্গে আবার দেখা হয় এই ভয়েই পালিয়েছেন। আচ্ছা খুড়িমা, মনীশদা না হয় এ কথাটা সত্যি বলে ভাবতে পারলেন, আপনি ভাবলেন কি করে?"

তাহার মুখের হাসিটা কথা বলিবার সঙ্গেসঙ্গেই মিলাইয়া গিয়াছিল, বেদনাটা কণ্ঠস্বরে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

খুড়িমা বলিলেন "তোমার সঙ্গে দেখা হবার ভয়েই যে সে পালিয়েছে তা নয় মা। সে গ্যাছে—তার স্বাস্থ্য ভারি খারাপ হয়ে গ্যাছে তাই। বলতে গেলে আমিই তাকে জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার বিশ্বাসের কথা বলছ মা, সে যে-রকম ভাবে বললে—সত্যি, তাতে অবিশ্বাস করবার মত

আমি কিছুই খুঁজে পাইনি। আর এ রকম আজকাল হচ্ছেও তো। তবে অবিশ্বাস করবার মত কি থাকতে পারে ?"

উমা মুখ ফিরাইয়া বলিল "সে কথা ঠিক। একজন যদি খারাপ হয়, লোকে সকলকেই সেই রকম ভেবে থাকে। একটী বিধবার হয় তো বিয়ে হয়েছে, লোকে সহজেই ধরে নিয়েছে সকল বিধবাই আবার বিয়ে করবার গোপন বাসনা বুকের মধ্যে পূরে রাখে। আপনাকে কি মনীশদাকে আমি দোষ দিচ্ছি নে খুড়িমা, এটা মানুষের স্বাভাবিক ধারণা। বিধবা মানে কি খুড়িমা ? বিধবার মানে যদি এতটুকু একটা কথাতেই ফুরিয়ে যায়, তা হলে তো কথাই নেই। বিধবা কি ছেলেখেলার জিনিস ? বিধবাকে আবার সধবা করা যায় কখনও ? তার কর্ম্ম-ফল যা—তা তাকে ভোগ করতেই হবে, নইলে সে বিধবাই বা হবে কেন ? বিশ্বের নিয়ম বিশ্বপিতা যা ঠিক করে রেখেছেন, সেই নিয়ম অনুসারে আমাদের চলতেই হবে। যদি তার বিরুদ্ধাচরণ করি, সেটা ভগবানেরই আদেশ লঙ্ঘন করা হল। আমার যদি এতটুকু ক্ষমতা না থাকে, আমি যদি নিয়মানুসারে চলতেই না পারি, তবে মানুষ হয়ে জন্মেছিই বা কেন ? আমাকে আমার প্রবল শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করতে হবে, আমার দেবতার জিনিস বলে ঠিক রাখতে হবে, তবে আমি মানুষ, তবে আমি যথার্থ শিক্ষালাভ করেছি। আমি লীন হয়ে যেতে তো আসি নি, পরাজয় লাভ করতে আসি নি। মানুষের কাছে ভগবান আমায় নত হতে দেন নি, আমি দাঁড়িয়ে থাকব। এরা তা কেউ বোঝে না, এরা আমায় চিনতে পারে নি—তাই আমার ওপরে জোর চালাতে চায়।"

উমার দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। খুড়িমা তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া অঞ্চলে তাহার মুখ মুছাইয়া দিতে দিতে আদরের সুরে বলিলেন—"পাগলি, কেঁদেই যে সারা হলে। ছি, মা, ছোট্ট মেয়ের মত কান্না তোমার সাজে না। কান্না মানায় যে দুর্ব্বলহৃদয়া তার, তোমার বুক যে লোহার চেয়েও শক্ত, ওখানে কোন ঘা ত বসবে না। কেঁদ না উমা, দৃঢ় হও।"

উমা তাঁহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ক্ষুদ্র বালিকার মতই কাঁদিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া, শেষে চক্ষু মুছিয়া মুখ তুলিল, রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "এই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি খুড়ি মা। বাবাকে সব কথা বলতে পারি নে, জানি নে কেন লজ্জা হয়। ঠাকুর-মা এ সব কথা মোটে শোনেনই নি। উষাকে এই রকম ঘরে দেওয়া হয়েছে বলে একেই কেঁদে মরছেন। তাতে যদি এ কথা শোনেন, তবে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করবেন। আমি বাবাকে বলেছি—এ কখনই হতে পারবে না। তিনি আর কোনও কথা বলেন নি, চুপ করে আছেন।"

উমার মাথায় হাতখানা রাখিয়া গভীর স্বরে খুড়িমা বলিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ করছি মা—তুমি সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হবে। মনকে এমনই উন্নত রাখ, এমনই উদার রাখ। আমাদের সংসার তোমার মত পুণ্যবতীর স্পর্শে ধন্য হয়ে যাক। যে সব অভাগিনী বিধবা হয়ে আছে, তাদের হৃদয় তোমারই মত জ্ঞানের কিরণ দ্বারা, তারা আপনাদের ভগবানের শ্রীচরণে উৎসর্গ ফুল বলেই ভেবে নিক, সংসারের কোনও আকর্ষণ তাদের লক্ষ্যচ্যুত করতে পারবে না।"

পরদিন প্রভাতেই উমা দানীশকে উষার শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিল। বেলা প্রায় নটা দশটার সময় দানীশ ফিরিয়া খবর দিল, উষা বৈকালে আসিবে, কিন্তু আবার সন্ধ্যাবেলাই তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

বগলা দেবী নির্ব্বিষ সর্পিণীর মতই গজরাইতে লাগিলেন—"ওঃ, মেয়ে একেবারে যেন বেচে খেয়েছি। বিকেলে আসবে, সন্ধ্যাবেলা ফিরে যাবে। এর চেয়ে একেবারে না পাঠালেই ভাল। দিলুম সব তবু নাম নেই। ছেলেমানুষ মেয়েটাকে আটকে রেখে ভারি বিত্তের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। ঝাঁটা মার অমন সব বিদ্বানের মুখে, উনানে পুড়িয়ে ফেলি অমন বিত্তেকে।"

উমা বলিল "মিথ্যে বকছ তুমি ঠাকুর-মা। বিয়ে দিলে তার উপরে আমাদের আর সর্ত্ত থাকে কি। যখন দান করা হয়েছে তখন সে তাদেরই, আমাদের কেউই নয়।"

গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় দানীশ পথে বাড়ী সব দেখাইয়া আনিতেছিল। দানীশ দেখাইল, "ওই দেখ সতী—উষার ননদ।"

মটরখানা পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। বগলাদেবী গালে হাত দিয়া বলিলেন "ওমা, এই না কি উষার ননদ ? এ যে খাঁটি মেম সাহেব।"

দানীশ হাসিয়া বলিল "খাঁটি মেমসাহেব হবে না তো কি আপনাদের মত হবে ? ওদের বাড়ীখানা দেখবেন ? চলুন না একটু ও-পথটা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি আপনাদের। যাবে উমা ?"

উমা তাহার সমবয়স্কা, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকিত।

উমা ঠাকুর-মায়ের স্বেদক্লিষ্ট মুখখানার পানে চাহিয়া বলিল, "না, একাদশী, বুড়ো মানুষ আর হাঁটতে পাচ্ছে না।"

বাস্তবিক বৃদ্ধা ঠাকুরমায়েরও আর বেশী হাঁটিবার সামর্থ্য ছিল না। তিনি বাড়ীর দিকে ফিরিতে ফিরিতে বলিলেন "হ্যাঁ দানীশ, ওদের বাড়ীর সবাই অমনি ?"

দানীশ বলিল "না, উষার শাশুড়ি আপনাদেরই মত!"

আশ্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঠাকুর-মা বলিলেন "তবু ভাল—একজনকে উমা নিজেদের মত পেয়েছে।"

উমা ব্যাপার সবই মনীশের মুখে শুনিয়াছিল, তাই সে বেদনাভরে একটু হাসিয়া মুখ ফিরাইল। (ক্রমশঃ)

কেরাণী

স্ত্রী। (সদ্য অফিস-ফেরৎ স্বামীর প্রতি) আজ এত দেরী হ'ল যে ?
স্বামী। দেরী হয়েছে ? দেখ সুরো, এই সময়টীতে তুমি এ'লে কি মনে হয় জান ? যেন ঝড় তুফানের পর চাঁদের আলো উঠ্‌লো।

দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্যকথা

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

'ভারতবর্ষ' স্বর্গীয় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের বড় সাধের মাসিকপত্র। কত আশা করিয়াই তিনি ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু 'ভারতবর্ষে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই কাল অকালে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবসান করিয়াছিল। আরব্ধ কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া, সঙ্কল্পসিদ্ধির পূর্ব্বেই বিশ্বজননীর চিরশান্তিময় ক্রোড়ে তাঁহাকে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। 'ভারতবর্ষ' দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ইহাতে তাঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে দুই একটি প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম; আশা করি এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না।

স্বর্গীয় কবিবরের অন্যতম সুহৃদ সুলেখক শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রণীত 'দ্বিজেন্দ্রলাল' বহু দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলেও, আমি অল্প দিন পূর্ব্বে এই বহুজন-প্রশংসিত জীবন-চরিতখানি পাঠের সুযোগ ও অবসর লাভ করিয়াছিলাম। উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া ৫৬ পৃষ্ঠায় স্বর্গীয় মহাত্মার বাল্যজীবন সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণটি দেখিতে পাইলাম,—

"তৎকালে কৃষ্ণনগরে একটা ছোট আদালত (Small Cause Court) ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের বড় দাদা ৺রাজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় উক্ত আদালতের পেস্কার ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বয়স তখন ৬।৭ বৎসর।"..."দ্বিজু ৬।৭ বৎসর বয়সে একবার বড় দাদা রাজেন্দ্র বাবুর কাছে মেহেরপুরে গিয়াছিল। এক দিন বিকালে খুব ঝড় বৃষ্টি হওয়ায়, তাহা দেখিয়া, ছাদের উপর উঠিয়া, দ্বিজু চীৎকার করিয়া, বিবিধ অঙ্গভঙ্গি সহকারে, মস্ত বড় বক্তার মত বলিতে থাকে, 'দেখ দেখ—জল পড়িতেছে, ঝড় বহিতেছে, পাখী উড়িতেছে'—ইত্যাদি। তাহার দাদা শিশুর এই অদ্ভুত বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'দেখিও, এ বাঁচিয়া থাকিলে কালে নিশ্চয়ই একটা মানুষ হইবে।'"

শ্রদ্ধেয় জীবনাখ্যায়িকা-লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন, এই গল্পটি তিনি মাননীয়া শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী স্বর্গীয় সার আশুতোষ চৌধুরী মহোদয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয় এক সময় মেহেরপুরের সন্নিহিত চুয়াডাঙ্গার 'সব্‌ডিভিসনাল আফিসার' ছিলেন; অল্পদিনের জন্য তিনি মেহেরপুর সবডিভিসনেরও ভার পাইয়াছিলেন। "তৎকালে কৃষ্ণনগরে একটা ছোট আদালত" নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু পূজনীয় ৺রাজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় সেই আদালতের কর্ম্মচারী ছিলেন না; এবং তিনি ছোট আদালতের 'পেস্কারী'র ন্যায় সামান্য কর্ম্মেও নিযুক্ত ছিলেন না। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল বাবু মেহেরপুরের ছোট আদালতের হেড্ ক্লার্ক ছিলেন; তিনি আদালতের আমলা (ministerial officer) হইলেও মেহেরপুরের জনসাধারণ তাঁহাকে হাকিমের মতই শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। তাঁহার অধীনে অন্য একটি লোক মেহেরপুর ছোট আদালতের পেস্কার ছিলেন।

মেহেরপুরের চাকরী উপলক্ষে স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল বাবু সপরিবারে সেখানে বাস করিতেন। তাঁহার এক ভাই, বোধ হয় নরেন্দ্রবাবু, মেহেরপুর স্কুলে কিছু দিন 'মাষ্টারী' করিয়াছিলেন। লজেঞ্জুস তাঁহার বড় প্রিয় খাদ্য ছিল, মসলার পরিবর্ত্তে তিনি অনেক সময় মুখে 'লজেঞ্জুস' রাখিতেন। রাজেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় সুখেন্দ্রলাল রায়ের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব ছিল। সুখেন্দ্র যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার হৃদয় সেইরূপ কোমল ও স্নেহ-প্রবণ ছিল। সুখেন্দ্রলাল আমাদের এক ক্লাশ উপরে পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ করিতেন; সে বাঙ্গলা ১২৮৬ সালের কথা। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া এল-এ পড়িতেছিলেন। সেইবার গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে তিনি মেহের-পুরে বেড়াইতে আসিয়া কয়েক দিন তাঁহার বড়দাদার

বাসায় ছিলেন; তৎপূর্ব্বে (অর্থাৎ ৬।৭ বৎসর বয়সের সময়) দ্বিজেন্দ্রলাল মেহেরপুরে আসেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রীষ্মাবকাশে মেহেরপুরে আসিলে—আমার স্পষ্ট মনে আছে—একদিন মেহেরপুরের স্কুল-গৃহে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা স্কুলের বহু ছাত্র তাঁহার 'বক্তৃতা' শুনিতে গিয়াছিলাম। প্রবন্ধের বিষয় ছিল, 'কবিত্ব।' প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া তিনি কবিত্বপূর্ণ ভাষায় সেই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা তখন বালক মাত্র,—'কবিত্বে'র আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি কি বলিয়াছিলেন, এই সুদীর্ঘ ৪৪ বৎসর পরে তাহা স্মরণ নাই; তবে তাঁহার সুললিত কণ্ঠস্বরে ও মনোহর বর্ণনা-কৌশলে আমরা সকলেই মোহিত হইয়াছিলাম, এবং আমরা বালকের দল তাঁহার অন্ধ স্তাবক হইয়া উঠিয়াছিলাম। সেই সময় মেহেরপুরের শিক্ষিত সমাজের ধারণা হইয়াছিল, 'রাজেন্দ্রবাবুর ছোট ভাই কালে একজন বিখ্যাত লোক হইবেন।'—কেহ বলিয়াছিল, "ছেলে ত নয় যেন হীরের টুকরো! না হবে কেন? কত বড় বাপের ছেলে; যে সে ঘরে কি অমন ছেলে জন্মায়?" কেহ বলিয়াছিল, "কি চমৎকারই বল্‌লে, যেন তুবড়ীতে আগুন দিলে। মা সরস্বতীর কৃপা না থাকলে কি এরকম 'ক্ষ্যামোতা' হয়?"—ইত্যাদি।

আমি সন্ধান লইয়া জানিয়াছি, এই ঘটনার দশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ স্বর্গীয় কবিবরের ৬।৭ বৎসর বয়সের সময় রাজেন্দ্রবাবু মেহেরপুর 'স্মলকজ কোর্টে'র হেড্ ক্লার্ক ছিলেন, আদালতের কাগজ পত্র হইতে ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এই জন্য মনে হয় 'দেওয়ানজীর' কৃষ্ণ-নগরের বাড়ীতেই ঐরূপ শৈশবাবস্থায় দ্বিজেন্দ্রলালের বক্তৃতা-শক্তির বা প্রতিভার উন্মেষের এই প্রকার পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকিবে; এক স্থানের ঘটনা স্থানান্তরে আরোপিত হইয়া থাকিবে।

এরূপ অনুমান করিবার আরও একটি কারণ আছে। মেহেরপুরের বাসায় যে ঐরূপ হয় নাই, তাহার একটি অকাট্য প্রমাণের উল্লেখ করিতে পারি। তাহা এই:—পূজনীয় ৺রাজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় যত দিন মেহেরপুরে ছিলেন, তত দিনের মধ্যে তিনি তাঁহার বাসা পরিবর্ত্তন করেন নাই। মেহেরপুরের প্রান্তবাহিনী ভৈরব নদীর পূর্ব্বতীরে, থানার ঠিক দক্ষিণে স্থানীয় মুখুয্যে বাবুদের একটি উদ্যানভবন ছিল; সেই উদ্যানে পলাশ, কাঞ্চন, কাঠ-মল্লিকা প্রভৃতি নানা জাতীয় ফুলের গাছ ছিল এবং উদ্যানের মধ্যে নদীর ঠিক পাড়ের উপর একখানি প্রকাণ্ড আটচালা 'বাঙ্গলা' ছিল। এই বাঙ্গালার দেও-য়ালগুলি ও স্তম্ভাদি ইষ্টক-নির্ম্মিত এবং চূণকাম করা হইলেও চালগুলি উলুখড় দিয়া ছাওয়া। বলা বাহুল্য, উলুখড়ের চালে উঠিবার সিঁড়ি থাকে না! ৬।৭ বৎসরের শিশু দ্বিজেন্দ্রলাল (যদি কেহ সপ্রমাণ করিতে পারেন যে তিনি ঐ বয়সে সত্যই মোহরপুরে আসিয়াছিলেন) যে সেই বিকালে খুব ঝড় বৃষ্টির মধ্যে, বাঁশের মৈ সংগ্রহ করিয়া তাহার সাহায্যে সেই আটচালার মট্‌কায় উঠিয়া 'চীৎকার করিয়া, অঙ্গভঙ্গি সহকারে মস্ত বড় বক্তার মত' বক্তৃতা করিয়া তাঁহার পূজনীয় বড় দাদাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, ইহা কতদূর সম্ভব পাঠকগণ তাহা বিচার করিতে পারি-বেন। অন্ততঃ এরূপ কল্পনা হাস্যোদ্দীপক ও অসঙ্গত ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? রাজেন্দ্রলাল বাবুর সেই বাসা আমাদের অনেকেরই সুপরিচিত ছিল,—এখন তাহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল বাবুর কন্যা—সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র-লাল মজুমদার মহাশয়ের পত্নী তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বে এই 'বাঙ্গলায়' অনেক দিন তাঁহার পিতামাতার সহিত বাস করিয়াছিলেন। বোধ হয় এত দিন পরেও তাঁহার স্মরণ থাকিতে পারে, তাঁহার ছোট কাকার সেই 'ঘরের ছাদে' উঠিবার কথা কিরূপ অসম্ভব।

বস্তুতঃ, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল সকল রকমে এতই বড় ছিলেন যে, তাঁহার চরিত্রগত বিশিষ্টতা সপ্রমাণের জন্য ঝড় বৃষ্টির মধ্যে তাঁহাকে আটচালা ঘরের চূড়ার উপর টানিয়া তুলিবার আবশ্যকতা ছিল না।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথার উল্লেখ কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও সেই লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের গ্রন্থ পাঠে আমরা জানিতে পারি—স্বর্গীয় 'কান্ত কবি' রজনীকান্ত সেন কবিবর দ্বিজেন্দ্র-লালকে 'গুরুজি' বলিতেন, তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল কিরূপে রজনীকান্তের 'গুরুজি' হইলেন, কোথায় কিরূপে তাঁহাদের প্রথম

পরিচয় হয়—গ্রন্থকার মহাশয় 'দ্বিজেন্দ্রলাল' নামক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় তিনি সেই বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

আমি সে সময় রাজসাহী-প্রবাসী—স্বর্গীয় 'কান্ত কবির' সহিত তাঁহার 'বড় কুঠী'র বাসায় বাস করিতাম। রজনী বাবু তখন রাজসাহীর জজ আদালতের 'জুনিয়ার' উকীল, আর আমি জজ সাহেবের 'দায়রা কোর্টে'র আমলা। কোন্ সালের কথা, আমার ঠিক মনে নাই—সম্ভবতঃ ১৮৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল সরকারী কার্য্যোপলক্ষে রাজসাহী গিয়াছিলেন। তখন তিনি আবকারী বিভাগের পরিদর্শক। রাজসাহীতে গিয়া তিনি 'সার্কিট হাউসে' বাসা লইয়াছিলেন। রজনীকান্ত তাহার পূর্ব্ব হইতে জননী বীণাপাণির একনিষ্ঠ সেবক; তখন তিনি প্রায় প্রত্যহ নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া 'হারমোনিয়ম' সহযোগে গান করিতেন,—আমরা তাঁহার সম্মুখে বসিয়া সেই সকল গান শুনিতাম ও তারিপ করিতাম। নদীয়া জজ কোর্টের ভূতপূর্ব্ব নাজির ৺অবিনাশ চন্দ্র রায় তখন রাজসাহী জজ কোর্টের পেস্কার। তিনি আমাদের পরম বন্ধু ছিলেন, এবং রজনীকান্তকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। অবিনাশ বড়ই সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। রজনীকান্ত যখনই যে গান রচনা করিতেন, অবিনাশকে দিয়া তাহা না গাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন না। কিন্তু সে সময় রজনীকান্ত 'হাসির গানে' তেমন দক্ষতা লাভ করেন নাই; দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান তখন বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজে নির্ম্মল আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির জোয়ার বহাইয়াছিল। সেই সকল গান শুনিয়া রজনীকান্তেরও হাসির গান রচনা করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে তখন বাঙ্গলার বৈঠক সমূহ মস্‌গুল। আমরা তাঁহাকে উৎসাহিত করিলে তিনি বলিতেন, "তুমিও যেমন! ডি, এল, রায় থাকিতে আমরা কল্‌কে পাইব না, বৃথা চেষ্টা!" —তখন পর্য্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয় হয় নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল রাজসাহীতে আসিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য রজনীকান্ত অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সহিত রাজসাহীর ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ লোকেন্দ্রনাথ পালিতের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। মিঃ পালিত দ্বিজেন্দ্রলালেরও পরম বন্ধু ছিলেন। প্রতিভা কখন প্রচ্ছন্ন থাকে না। অক্ষয়বাবু রজনীকান্তকে দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত পরিচিত করিলেন। সেই মজলিসে দ্বিজেন্দ্রবাবুর কণ্ঠ-নিঃসৃত হাসির গান শুনিয়া রজনীকান্ত মোহিত হইলেন। রজনীকান্তও তাঁহার স্বরচিত দুই চারিটি হাসির গান গায়িলেন। গুণমুগ্ধ দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার সেই সকল গান শুনিয়া এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি রজনীকান্তকে তাঁহার গানের জন্য অজস্র প্রশংসা করিয়া হাসির গান রচনায় উৎসাহিত করিলেন। সেই দিন রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলালকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন।

তখন 'বাণী' ও 'কল্যাণী'র অতি অল্প গানই রচিত হইয়াছিল। তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশের সুদূর-সম্ভাবনাও রজনীকান্তের কল্পনায় স্থান পায় নাই। কিন্তু তাহার পর হইতেই রজনীকান্ত মহা উৎসাহে হাসির গান রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার অল্প দিন পরেই 'বাজার হুদ্দ কিন্তা আন্তা'—'বেহায়া বেহাই' প্রভৃতি হাসির গানের রচনা। আমি বলিলাম, "বড় চমৎকার হয়েছে, ডি, এল, রায়ের পাশেই আপনার আসন।' রজনীকান্ত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া (ওটা তাঁহার একটা মুদ্রাদোষ ছিল) আমার নাক ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিলেন, এবং হাসিয়া বলিলেন, "ক্ষেপেছো! কার সঙ্গে কার তুলনা করচ? গুরুজির পাশে আমার আসন! ও-রকম পাগলামীর কথা আর ব'লো না।" সেই স্মরণীয় দিনে রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে না পারিলে, হাসির গান রচনায় তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হইতে কি না সন্দেহ! কোন কারণে দ্বিজেন্দ্রলালের নাম উচ্চারণ করিবার সময় রজনীকান্ত উভয় করতল যুক্ত করিয়া ললাট স্পর্শ করিতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এ বিষয়ে সত্যই রজনীকান্তের গুরু। কিন্তু রজনীকান্তের সাধনা কতকটা একলব্যের সাধনার মত। প্রকাশ্য ভাবে বিশেষ কোন সাহয্যে না পাইলেও রজনীকান্ত তাঁহার নিকট inspiration পাইয়াছিলেন।

রাজ্‌গী!

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল

(৩)

আমার বয়স যখন বছর ষোল, তখন এক দিন বিপিনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমি ঠিক করিলাম, রাণীমা ও গোবিন্দকে হঠাৎ অপ্রস্তুত করিয়া ফেলিব। বিপিন বলিল, সে খবর দিলেই, আমি খট করিয়া মায়ের ঘরে ঢুকিয়া পড়িব। সব ঠিক, বিপিন খবর দিল, কিন্তু অগ্রসর হইয়া রাণীমায়ের অপরাধ সম্বন্ধে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে ভরসা হইল না। আমি গেলাম না।

যে পাপের বিরুদ্ধে এত দিন নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করিয়া আসিয়াছি, তাহা নিশ্চয় করিয়া ধরিবার সুযোগ পাইয়াও আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। তার একটা প্রধান কারণ এই যে, এখন আমি অন্তরের ভিতর অনুভব করিলাম যে, আমার ভিতরও এমন পাপ ঢুকিয়াছে, যাহা হয় তো সকলেই জানে। রাণীমায়ের এই ব্যাপার লইয়া নাড়াচাড়া করিলে, আমার সেই পাপের কথাটা উঠিয়া পড়া খুবই সম্ভব। তাই আমি হঠাৎ একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। যদিও আমার মাত্র ষোল বছর বয়স, তবু এর মধ্যে বিধুর সঙ্গে আমার সম্প্রীতি ক্রমশঃ বাড়িয়া এখন একটা সম্পূর্ণ অবৈধ সম্পর্কে দাঁড়াইয়াছিল। আমি বিধুর প্রেমে সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম। ফাঁক পাইলেই আমি বিধুর বাড়ী গিয়া পড়িয়া থাকিতাম। যতক্ষণ থাকিতাম, তার সঙ্গেই থাকিতাম। বিপিন আমাদের সহায়তা করিত ও আমাদের আগলাইত, যাহাতে কোনও মতে ধরা না পড়ি।

ধরা পড়িবার কোনও সম্ভাবনা নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস ছিল। তবু এই অপকর্ম্মটা করিয়া আমি আমার সাহস সম্পূর্ণ হারাইয়া বসিলাম,—জোর করিয়া যে কিছু করিব এমন ভরসা হইল না।

তার পর এক দিন আমি দেওয়ানজীকে বলিয়া বসিলাম যে, আমি বিষয়-কর্ম্ম দেখিব। দেওয়ানজী বলিলেন, "দেখবে বই কি বাবা, তোমার বিষয় তুমিই তো দেখবে। তা' আগে লেখাপড়াটা শেষ করে ফেললেই ভাল হয় বাবাজী।" এমনি করিয়া আস্তে আস্তে মিষ্টি মুখে তিনি আমাকে সরাইয়া দিলেন। শীঘ্রই বিপিনের কাছে জানিতে পারিলাম যে, দেওয়ানজী গোবিন্দের মারফত কথাটা রাণীমাকে জানাইয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়াছেন; এবং রাণীমা দেওয়ানজীকে হুকুম দিয়াছেন যে, কিছুতেই যেন আমাকে জমীদারী দেখিতে না দেওয়া হয়।

আমি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলাম। পরে এক দিন দেওয়ানজীকে গালাগালি দিলাম। দেওয়ানজী শান্ত ভাবে আমাকে এমন ভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, আমি কোনও কথা বলিবার ফাঁক পাইলাম না। কিন্তু তিনি কাগজপত্র দেখাইলেন না।

বিফল-মনোরথ হইয়া দেওয়ানের আফিস হইতে বাহির হইলাম। অন্যমনস্ক ভাবে বিপিনের বাড়ী চলিলাম। বিপিন তখন সঙ্গে ছিল না। কিঙ্কর সিং সঙ্গ লইল তাহাকে একটা টাকা দিয়া নদীর ধারে বসাইয়া রাখিলাম। মনটা জ্বলিতে লাগিল।

পার্ব্বতী পিশিকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। সে মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তাই তো, ওদের সঙ্গে তুমি পারবে কোথ্‌ থেকে? ওরা এক পাল ঘুঘু!"

"আচ্ছা, তবে কি করি বল দিকিনি পার্ব্বতী পিশি আমি তো সম্পত্তিটা এমনি ছারখার হ'তে দিতে পারি না।"

বিধু হাসিয়া বলিল—কি মন-মাতান সে হাসি—"সম্পত্তির কথা মা একটু ভেবে দেখুক, ততক্ষণ তুমি একটু এদিকে এসো দেখি।" বলিয়া সে আমাকে টানিয়া তুলিল।

আমি একেবারে আত্মহারা হইয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। সে আমাকে লইয়া গেল নদীর ধার দিয়া

একটা খুব নিভৃত ঝোপের ভিতর। আমি আনন্দ-কম্পিত অন্তরে তার অনুসরণ করিলাম।

কিন্তু বিধু আমাকে চুম্বন করিল না, আলিঙ্গন করিল না। তার সুন্দর চক্ষে বিলোল কটাক্ষ খেলিয়া গেল না। সে গম্ভীর ভাবে কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি আমাকে খুব ভালবাসা রাজাবাবু?"

আমি বেশ ভাল করিয়া জবাব দিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। সে আমাকে বাধা দিয়া বলিল, "দাঁড়াও, ওই-খানেই ব'স। আজ আমার ভয়ানক দরকারী কথা আছে; আজ আমার মাথা গুলিয়ে দিও না। বল সত্যি, তুমি আমাকে খুব ভালবাস কি না।"

আমি বলিলাম, "হাঁ রে হাঁ, খুব ভালবাসি।"

"তা হ'লে তোমার যা ব'লবো, তা' কাউকে বলবে না? আমার বিপদে ফেলবে না?"

"কক্ষনো না।"

"আমার গা ছুঁয়ে বল।"

আমি গা ছুঁইয়া শপথ করিলাম। তখন সে বলিল, "দেখ রাজাবাবু, মা আর দাদার কথা তুমি শুনো না। ওরা তোমায় ভুলিয়ে নানা রকম মিথ্যে কথা বলে, রাণীমার সঙ্গে তোমার ঝগড়া বাধাতে চায়। দাদা বলছিল, তা' হ'লেই একটা মামলা বাধবে, আর সে বড়মানুষ হ'য়ে যাবে। মাতে আর দাদাতে বসে' পরামর্শ হ'য়েছে, ওরা তোমার সর্ব্বনাশ করে' টাকা লুটবার ফন্দী ক'রছে। তুমি ওদের কথা শুনো না, শুনো না।"

বলিয়াই বিধু ছুটিয়া পলাইল, আমি আর তাহাকে ধরিতে পারিলাম না।

এ কি নূতন কথা! আমি একেবারে আকাশ হইতে পড়িলাম। এ কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে! পার্ব্বতী পিশি ও বিপিন যদি এমন বিশ্বাসঘাতক হয়, তবে তো আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই। দেওয়ানজী, রাণীমা প্রভৃতি সকলেই যে চক্র করিয়া আমাকে ঠকাইতেছে, তাহা আংশিক প্রমাণের বলে আমার মনে এত বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, বিধুর এ কথায় আমার সে বিশ্বাস মোটে টলিল না। কিন্তু এ কথা স্থির বিশ্বাস হইল যে, বিপিন ও পার্ব্বতীও আমাকে খেলাইয়া তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় করিতেছে। তবে আমি দাঁড়াই কোথায়? জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘের মাঝে পড়িয়া আমার বুদ্ধি একদম এলাইয়া গেল। মনটা ভারি দমিয়া গেল, এ পৃথিবীতে কি তবে বিশ্বাসের স্থান কোথাও নাই?

কেন থাকিবে না? এই তো বিধু আছে। সে আপনার মা ও ভাইয়ের চক্র ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, নিজের অনিষ্ট করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় নাই কেবল আমাকে ভাল-বাসিয়া। আমার অন্তর একেবারে গলিয়া গেল। বিধুর এই নিঃস্বার্থ ভালবাসায় প্রাণ ভরিয়া উঠিল। আমি তাহার সন্ধানে ছুটিলাম। কোথাও তাহাকে পাইলাম না। তাহাদের বাড়ীর উঠানে আসিয়া পড়িতেই, পার্ব্বতী পিশি বলিল, "দেখ রাজাবাবু, আমি বলি, তুমি মাজিষ্টরের কাছে একখানা চিঠি লিখে দাও, তিনি এসে এর একটা বিহিত করতে পারবেন। তা' ছাড়া তো গতি দেখি নে।"

বিধুর কথায় আমার মনটা ইহাদের উপর অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তাই আমি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উত্তর দিলাম, "আচ্ছা, দেখি বিবেচনা করে।" সামনে চাহিয়া দেখিলাম, বেড়ার আড়াল হইতে বিধু আমাকে নানা রকম ইসারা করিয়া সাবধান করিয়া দিতেছে, যেন কিছু না বলিয়া ফেলি, আর, যেন তার মায়ের কথা না শুনি।

এমন সময় বিপিন ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "রাজাবাবু, ছুটে যান; এই সময় তল্লাসী করুন গে। রাণীর বাপের বাড়ী পূজার নৌকা যাচ্ছে। রাণীমা আপনার কথায়-বার্ত্তায় ভয় পেয়ে একেবারে সব সিন্ধুক উজাড় করে বাপের বাড়ী পাঠাচ্ছেন।"

প্রতি বৎসর পূজার সময় রাণীমা বাপের বাড়ীতে নানা দ্রব্যসম্ভারে ভরিয়া একখানা নৌকা পাঠান। তাহাতে তাঁর পিত্রালয়ের সকলের জন্য কাপড় থাকে, আর প্রায় এক বৎসরের যোগ্য খাদ্য এবং নানা রকম সৌখীন দ্রব্য থাকে। বিপিন যাহা বলিল, তার তাৎপর্য্য এই যে, রাণীমা এ বৎসর চা'ল ডালএর তলায় চাপা দিয়া হীরা মণি মুক্তা প্রভৃতি সকল মূল্যবান বস্তু চালান দিতেছেন।

এক মুহূর্ত্তে আমার মাথার মধ্যে আগুন জলিয়া উঠিল। আমি ছুটিয়া চলিলাম সেই নৌকার সন্ধানে! বিপিন বাড়ীতেই রহিল।

বিপিনদের বাড়ী ছাড়াইয়া একটা ঝোপের ধারে আসিতেই আমার জামায় টান পড়িল। ফিরিয়া

চাহিয়া দেখিলাম, বিধু! সে বলিল, "সাবধান, রাজাবাবু! ওরা এই কথাই কাল পরামর্শ ক'রেছে। তুমি খানাতল্লাসী করলেই রাণীমার সঙ্গে এক চোট লেগে যাবে, তাই ঠিক ক'রেছে। তুমি কিচ্ছু করো না। আমার মাথা খাও।"

আমি গভীর ভাবে ভাবিতে ভাবিতে নৌকার দিকে না গিয়া একেবারে অন্দরে গেলাম।

বিধু আমাকে বড় ভাবাইয়া দিয়াছে—তবে কি এদের সব কথাই ভূয়া? রাণীমা, দাইমা, দেওয়ানজী, গোবিন্দ প্রভৃতির লুটতরাজের কথা সব কি মিথ্যা? এ সব তো পার্ব্বতী ও বিপিনের কাছে শোনা। তারা যে কেবল মাত্র আমার সঙ্গে রাণীমার ঝগড়া বাধাইবার জন্যই এই কাণ্ড করিয়াছে, তাহাতে তো এখন আর সন্দেহ নাই। তবে এদের কথায় বিশ্বাস কি?

আমি অনেক সময় ভাবিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার সমস্ত চিন্তা ভাসাইয়া দিল এই একটা পরম আনন্দের কথা যে, বিধু আমাকে ভালবাসে, আর তার ভালবাসার মধ্যে এক ফোঁটাও স্বার্থের খাদ নাই। এই পরম আনন্দময় চিন্তায় ডুবিয়া আমি আমার ঘরে ঢুকিয়া খাটের উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

(৪)

বৈকাল বেলায় ঘুম হইতে রাণীমা আমাকে ডাকিয়া উঠাইলেন। তার পর তিনি আমাকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া, মুখ ধোয়াইয়া নিজ হাতে গামছা দিয়া মুছাইয়া দিলেন। একটু পাউডার মাখাইয়া আমার স্বভাব-গৌরবর্ণকে আরও উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। নিজ হাতে যত্নের সহিত মাথা আঁচড়াইয়া দিলেন। আমার গণ্ডের পার্শ্বে চিক্কণ নব রোম-রাজি বুরুষ দিয়া আঁচড়াইয়া দিলেন। সুন্দর সুন্দর কাপড় চোপড় পরাইয়া আমাকে নিজ হাতে সাজাইয়া মুখখানা তুলিয়া ধরিলেন। তার পর বলিলেন, "যাও বাবা, এক-বার বাইরে যাও,—কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছেন, দেখা করে এসো।"

বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলাম, ফরাসের উপর কিংখাবের গদী পড়িয়াছে। তার মধ্যস্থলে আমাদের সেই বহু-বিশ্রুত রূপার গড়গড়াটিতে তাওয়া দিয়া তামাক চড়ান হইয়াছে। তামাক খাইতেছেন একটী সুন্দর-কান্তি ভদ্রলোক, যাঁকে আমি মোটেই চিনি না। তাঁর সামনে দেওয়ানজী অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন।

দেওয়ানজীর আদেশ মত আমি ভদ্রলোকটীকে প্রণাম করিয়া সেই কিংখাবের উপর বসিয়া পড়িলাম। ভদ্রলোকটি স্মিতমুখে আমাকে সম্ভাষণ করিলেন। আমার সম্বন্ধে দেখিলাম তাঁর কৌতূহলের অন্ত নাই। এত কথা তিনি আমায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহা বলা যায় না। বিশেষ করিয়া আমার পড়াশুনার কথা। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিতে হইল না। কেন না আমার মাষ্টার মহাশয় এক পাশ হইতে আমার বুদ্ধি ও বিদ্যার এত প্রশংসা আরম্ভ করিলেন যে, বিদ্যার পরিণাম সম্বন্ধে কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। যদি কথাটার নিতান্তই জবাব দিতে হইত, তবে এই অপ্রিয় সত্যটা প্রকাশ হইয়া পড়িত যে, ষোল বৎসর বয়স হইলেও, এখনও প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার উপযুক্ত হইতে আমার আরও কয়েক বৎসর বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা।

কথাটা আর আমার কাছে অপ্রকাশ রহিল না। আমার কার্ত্তিকের মত চেহারাখানা ভদ্রলোকটির ভয়ানক পছন্দ হইয়াছিল। তার পর কথাবার্ত্তা, নম্র স্বভাব (!) ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া, তিনি অতিশয় প্রীত হইয়া, আনন্দের আতিশয্যে স্বীকার করিয়া ফেলিলেন যে, তাঁহার কন্যাকে তিনি আমার হাতেই সমর্পণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ করিবেন।

ভদ্রলোকটীর পরিচয় ক্রমে পাইলাম। তিনিও জমী-দার। আমাদের তুলনায় ক্ষুদ্র জমীদার হইলেও, তাঁর লাঠির জোর আমাদের চেয়ে বোধ হয় বেশী। তাঁহার নাম আমাদের দেশে সুপ্রসিদ্ধ।

নায়েব মহাশয়ের কাছে শুনিলাম, মেয়েটি ডানাকাটা পরী,—রূপে গুণে অতুলনীয়া। তা'ছাড়া ইহাঁর বড় মেয়ের বিবাহে ইনি যে পরিমাণ যৌতুক দিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া অনুমান করিতে গেলে মনে হয় যে, তিনি যৌতুকে বাড়ী ভরিয়া দিবেন।

আমার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ভাবী শ্বশুর মহাশয়কে বিদায় দিয়াই আমি বাড়ী হইতে বাহির হই-লাম। দেউড়ী হইতে কিঙ্কর সিং লাঠি লইয়া পিছু পিছু ছুটিল, আমি তাহাকে ফিরিয়া পাঠাইলাম।

অভ্যাস মত বিপিনের বাড়ীর দিকে চলিলাম। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, গোধূলির আলোয় আকাশ উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। আমাদের বাড়ীর সামনে বিস্তীর্ণ ময়দানের পশ্চিম দিকে কতকগুলি গাছের ঝোপের আড়ালে বিপিনের বাড়ী। আমি একরকম নাচিতে নাচিতে সেখানে চলিলাম। আমার ভারী আনন্দ বোধ হইল, ফুট্‌ফুটে সুন্দর বউ, আর দামী যৌতুক, কত জিনিস না জানি আমার হইবে! তা ছাড়া, কালীকান্ত চক্রবর্ত্তী শ্বশুর হইলে দেওয়ানজী, রাণীমা প্রভৃতির জারীজুরী একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। তিনি আমার সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিয়া আমাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিবেন। কাজেই চারি দিক দিয়া এ সংবাদ আমার কাছে ভারী আনন্দদায়ক মনে হইল।

বিপিনের বাড়ীর পথেই ঘাটের ধারে বসিয়া বিধু বাসন মাজিতেছিল। আমাকে দেখিয়াই লজ্জিত হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া সে উঠিয়া আসিল।

আমি তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলাম, "আজকের খবর জানিস বিধু, ভারি সুখবর।" বিধু সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া উঠিল,—তার সহজেই আনন্দের ছোঁয়াচ লাগিত। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি খবর?" তার ফুটফুটে গাল দুটীতে দুটী ক্ষুদ্র টোল যেন আনন্দের ঘুরপাক খাইতে লাগিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমার বিয়ে!"

এক মুহূর্ত্তের জন্য বিধুর মুখখানা সাদা হইয়া গেল, কটাক্ষ স্থির হইয়া গেল, হাসি মিলাইল। আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম। সেই এক মুহূর্ত্তে আমার মনের একটা বদ্ধ দুয়ার খুলিয়া গেল। এত দিন আমি ছিলাম সম্পূর্ণরূপে স্বার্থপর। নিজের কথা ছাড়া অন্য কথা ভাবিতে পারি নাই। আজ হঠাৎ বিধুর কাতর মুখ আমাকে জানাইয়া দিল যে, আমার নিজের সুখ-সুবিধা ছাড়াও অন্য কথা ভাবিবার আছে। যেটা আমি এতটা আনন্দের কথা মনে করিতেছি, সেটা বিধুর দিক হইতে বড় বেদনার কথা, সে কথার এতক্ষণে একটু আঁচ পাইলাম।

এক মুহূর্ত্ত বিধুর মুখ বিকৃত হইয়াছিল। পর মুহূর্ত্তেই সে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "বাঃ, বেশ তো! তা যাও, বলগে মাকে। দাদাও বোধ হয় ওখানে আছে। আমি বাসন ক'খান মেজেই আসছি।" বলিয়া নিমেষের মধ্যে সে আমার হাত ছাড়াইয়া ঘাটে গিয়া বসিল।

আমার ইচ্ছা হইল, বিধুকে কিছু মিষ্ট কথা বলি। কিন্তু হঠাৎ ধাক্কা খাইয়া আমি এমন হতভম্ব হইয়া গেলাম যে, চট্ করিয়া কিছু বলিবার কথা খুঁজিয়া পাইলাম না। তাই বিধুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আমি তাহাদের বাড়ীর দিকেই গেলাম। পার্ব্বতী পিসি ও বিপিনের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কহিলাম; কিন্তু মনটা ভারি অপ্রসন্ন হইয়া রহিল। ইহাদের সঙ্গে কথা বলিতে আমার ঘৃণা বোধ হইতেছিল। এমন পয়োমুখ বিষকুম্ভ এই দুটি! ইহাদের কুটিলতা যেন ইহাদের চক্ষুর ভিতর দিয়া এখন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

আমার ভ্রূ কুঞ্চিতই রহিল। আমি বেশী কথা কহিতে পারিলাম না। বিপিন ও পার্ব্বতী পিসি অনেক কথা বলিল; তার অর্দ্ধেক আমি শুনিতেই পাইলাম না। যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার বিরক্তি বাড়িল বই কমিল না। আমি তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ধ্যান করিতে লাগিলাম কেবল বিধুর সেই বেদনা-কাতর মুখের কথা। সে মুখ আমার মনে এমন একটা বিষাদের ছাপ মারিয়া দিল যে, আমার কিছুই ভাল লাগিল না। আমার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল।

আমি তাড়াতাড়ি বিদায় হইলাম। রাজবাড়ী ফিরিতে আমার ইচ্ছা হইল না—মনটা বড় খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। আমি নদীর ধার দিয়া ঝোপ জঙ্গল ডিঙ্গাইয়া চলিতে লাগিলাম।

একটু তফাতে টের পাইলাম, কে যেন আমার পিছু লইয়াছে। ফিরিয়া দেখিলাম—বিধু।

সে হাসিয়া বলিল, "বারে, আমাকে না বলেই যে বড় যাওয়া হ'চ্ছে। আমি পাঠিয়ে দিলাম তোমায় বসতে, আর তুমি অমনি ছুট।'

বিধুর মুখে হাসি দেখিয়া আমার মনের মেঘ আধখানা কাটিয়া গেল। সে তখন আমার সঙ্গে আমার বিবাহ, আমার ভাবী বধূর কথা প্রভৃতি লইয়া কত রকম আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিল যে, তাহা বলিবার নয়। সে বক্ বক্ করিয়া কথা বলিতে লাগিল, আমি শুনিতে লাগিলাম—আনন্দে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। সে আমার কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করিল যে, আমি তাহাকে বউ ঠাকুরাণীর খাসের ঝি করিয়া দিব। আমি আপত্তি জানাইয়াছিলাম। সে বলিল, "ও সব বাজে কথা। বউ ঠাক্‌রুণ এলে তো আর আমাকে মনে থাকবে না। রাজ-বাড়ীতে থাকলে বরঞ্চ তোমায় দেখতে শুনতে পাব।"

আমি উদীয়মান চন্দ্রের দিকে চাহিয়া বিধুকে স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, বউ আসুক না আসুক, বিধুর প্রতি আমার ভালবাসা কিছুতেই কমিবে না,—আমি যেমন আছি তেমনি থাকিব। বিধু আনন্দে গলিয়া গেল। তার অনেকক্ষণ পরে আমি বিদায় হইলাম।

আনন্দে আমার অন্তর নাচিতেছিল। আমি লাফা-ইয়া লাফাইয়া, খানা-খন্দ ডিঙ্গাইয়া চলিলাম। পা দুইটা যেন অত্যন্ত হালকা হইয়া গেল। পৃথিবী যেন সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে লাগিল! চারিদিকে সবই যেন সুন্দর দেখিলাম।

কিছুদূর গিয়া সামনে দেখিলাম, একটি সুন্দরী কিশোরী নদীতে গা ধুইয়া কলসী কক্ষে নদী হইতে উঠিয়া চলিয়াছে। আমি থমকিয়া গেলাম। কিশোরী সুন্দরী, তার কটাক্ষ হিল্লোল, তার দেহলতায় তরঙ্গে তরঙ্গে রূপ ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল।

সে আমার দিকে একটু চাহিয়া, মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেল। মাথার কাপড়খানা একটু টানিয়া, আবার মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

আমি পিছু পিছু চলিলাম। মেয়েটি যে বাড়ী গিয়া উঠিল, সে আমার জানা বাড়ী। অছিমদ্দি আমাদের একটি বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা; জমন মণ্ডলের পরেই গ্রামে তার স্থান। বুঝিলাম, মেয়েটি অছিমদ্দির বাড়ীর বউ। আমি দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া অছিমদ্দির বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। মেয়েটি সোজা অন্দরে চলিয়া গেল।

মধ্যস্থলে চাটাই বিছাইয়া অছিমদ্দি ও জমন মণ্ডল বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে গল্প করিতেছিল। আমাকে চিনিতে পারিবামাত্র তাহারা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। অছিমদ্দি ছুটিয়া গিয়া একখানা ছোট জলচৌকী আনিয়া আমাকে বসিতে দিল।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ কি মনে করে এ ধারে?"

আমি কি জবাব দিব খুঁজিয়া পাইলাম না। যে অভি-সন্ধিতে আসিয়াছিলাম, তাহা বলিতে যে সাহস হইল না, তাহা বলাই বাহুল্য। একটু ভাবিয়া বলিলাম; "নদীর ধার দিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, রাত হ'য়ে পড়লো,—তাই ভাবলাম, তোমাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাই।"

অছিমদ্দি তাড়াতাড়ি তার লণ্ঠনটা জ্বালাইয়া মাথায় একটা পাগড়ী জড়াইল ও একখানা লম্বা লাঠি হাতে করিয়া বলিল, "আজ্ঞা, চলেন মহারাজ!" অছিমদ্দি কেবল সম্পন্ন গৃহস্থ নয়, বিচক্ষণ লাঠিয়াল। কোন হাঙ্গামা উপস্থিত হইলে সে "রে রে" করিয়া আমাদের সর্দ্দারের দলে গিয়া জুটিত। আমার সত্যই একলা যাইতে ভয় করিতেছিল। অছিমদ্দির সঙ্গ পাইয়া সুখী হইলাম।

অছিমদ্দি আমাকে দেউড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া বিদায় লইল।

(ক্রমশঃ)

"মিলন মিলত না"

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক, এম্, এ, বি-সী-এস্

কাঁহে মিলন মিলত না!
মিলন মাঞয়ি প্রাণ ফুরাঅত;
মিলন-পিয়াসা খালি সাধা;
দিবাকর-ভাতি,—শর্ব্বরি-চন্দ্রমা
মিলনমে মিলাওয়ে বাধা।
মেরি আশ মিটাওয়ে না!
বক্ষ-বিকম্পন বাঞ্ছা স-চঞ্চল
সাধনমে বাধাঅ বিনাশা;
সূরয-বিধুয়া,—আঁখ লাগাওয়ে
টুটয়ত পিয়া-আশোয়াসা।

মুঞি জীবন যাচয়িনা!
এক সাধ মিটি লক্ষঅ-মিটনা
জীবনক পথে রোয় ঢোরি;
এক সার্থ-যারে,—অগণন তারা
আঁ-ধোয়া আকাশে যাঅ ছোড়ি।
তেঁই মিলন মিলল না!
দীনে নিবেদয়ে,—"বিরহ যে সাধা,
মিলাঅত মিলনক যন্ত্র;
মরণক-অন্তরে সংযত বাসনা
ভেদে দেঞি পূরণক মন্ত্র!"

সোম

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম-এ

Sir George Watt সোম সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন? উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে পারদর্শী Sir George Watt, সোম সম্বন্ধে Roth ও Max Mullerএর মধ্যে যে বাদানুবাদ, তৎসম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য কিছু বিশেষরূপে তাঁহার কৃত Dictionary of Economic Products নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশ করেন। বোম্বাই প্রদেশের পার্শীগণ হোম যাগ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে—ঐ হোমের বৈজ্ঞানিক নাম Ephedra। এই কারণে Ephedra জাতীয় উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোনও পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, হোম আমাদের পরিচিত—Periploca aphylla। Periploca aphylla দণ্ডায়মান তরু, নিষ্পত্র, বহুবর্ষজীবী। ইহার প্রশাখাগুলি হাঁসের কলমের ন্যায় স্থূল এবং ইহাতে দুগ্ধবৎ রস আছে। কিন্তু হোমের আরও কয়েকটী নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, পার্শীগণ যে হোম আধুনিককালে ব্যবহার করেন, তাহা Ephedra জাতীয়। এই সিদ্ধান্তটী Dr. Aitchison সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে হরিরুদ্ উপত্যকায় সুম্ বা হুম্ শব্দে Ephedra Pachyclada বুঝায়; এবং ইহা প্রস্তরময় ভূমিতে জন্মায়। এবং হুম্-ই বন্দক শব্দে Ephedra foliata বুঝায়। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, পার্শীগণের হোম ও বৈদিক সোম একই বস্তু কি না?

Academy নামক পত্রিকায় Prof. Max Muller যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই পাঠককে জানাইয়াছি। সেই প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া Watt বলিয়াছেন, যে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সোম যদিও বৈদিক সোম নহে, কিন্তু সম্ভবতঃ সোম প্রতিনিধি মধ্যে প্রধান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। Sarcostemma এতদ্দেশে সংগ্রহ করা কঠিন। ইহা দাক্ষিণাত্য প্রদেশেই পাওয়া যায়, এবং সেখান হইতে উত্তর-ভারতে আনয়ন করা আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদোক্ত লক্ষণগুলিই Sarcostemmaতে সুন্দর ভাবে পাওয়া যায়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পূতিকার (পূইশাক) প্রতিনিধিত্বের কারণও বুঝিতে পারা যায়। কারণ পূইশাককে নিষ্পত্র করিলে, প্রায়—Sarcostemmaর সদৃশ হয়। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের আরও স্মরণ রাখা উচিত যে, Roxburgh বলিয়াছেন যে, ঐ Sarcostemmaর দেশীয় নাম সোমলতা বটে; এবং তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ইহাতে দুগ্ধবৎ রস এত অধিক পরিমাণে আছে যে, দেশীয় পথিকগণ ভ্রমণক্লান্ত হইয়া ঐ রস পান করিয়া ক্লেশ ও তৃষ্ণা নিবারণ করে। Watt যদিও এই কথাটীকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু পাঠক দেখিবেন যে, Roxburgh সোমলতা নামে Ruta graveolensও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের বিবেচনা হয় যে, এই কথাটী প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা উচিত নহে। Duthie বলিয়াছেন যে, Setaria glauca নামক উদ্ভিদ্কেও দেশীয় ভাষায় সোম বলিয়া থাকে; এবং ভারতবর্ষের নানা ভাষায় সোম বা হোম নামধারী নানা প্রকার উদ্ভিদ্ আছে। যথা—Verronia anthelmitica ও Paederia Foetida এতদুভয়ের হিন্দুস্থানী ভাষায় নাম সোমরাজ। মাংসল শাখা দুগ্ধবৎ রসযুক্ত লতা হইলে Asclepiadeae বা Euphorbeaceae এতদুভয়ের অন্যতম হইবেই। Ephedra জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে কতকগুলি নিষ্পত্র লতা বটে, কিন্তু তাহাদিগের দুগ্ধবৎ রস নাই এবং তাহার বমনদ্রব্যও নহে; পরন্তু তাহারা সুগন্ধযুক্ত ও য়ুরোপখণ্ডের hop সদৃশ। অপর পক্ষে দ্রষ্টব্য যে, Sarcostemma জাতীয় উদ্ভিদের বর্ণ ঘোর নহে, পরন্তু সেগুলি কোমল সরস সবুজ বর্ণ। তাহারা প্রধান লতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায় বটে—কিন্তু যতক্ষণ তাহাতে রস থাকে, ততক্ষণ তাহার বর্ণ-বিকৃতি ঘটে না। পরন্তু, নিষ্পত্র Periploca aphyllaর শাখাগুলিকে ঘোরবর্ণ বলা যাইতে পারে। ঐ উদ্ভিদের দুগ্ধবৎ

রস আছে; এবং Aitchison বলেন যে, বেলুচিস্থানের উত্তর প্রদেশে ইহার নাম উম। Periploca aphylla ও Ephedra vulgaris এতদুভয়ের দাবী প্রায় সমান। কিন্তু আর একটী কথা এই যে, দক্ষিণ আসিয়ার আর্য্যগণের সোম যদি Periploca হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়া সেই উদ্ভিদ্টীকে চিনিতে পারিলেন না, এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের নূতন রাজ্যের প্রান্তভাগে একটী তরু দেখিলেন, যেটী দেখিয়া তাঁহাদের বোধ হইল, যে, সেইটী প্রাচীন সোমের আখ্যা পাইবার উপযুক্ত। কোন্ উদ্ভিদ্টী যথার্থ বৈদিক সোম, তাহা এরূপ প্রমাণের দ্বারা স্থির করা যায় না। ফলতঃ, Watt সাহেব বলিলেন যে, সোম কোনও উদ্ভিদ্ বিশেষের নাম নহে; পরন্তু, গাঁজ্লাইয়া কোন উদ্ভিদ্কে বিকৃত করিয়া মত্ততার উৎপাদক করিয়া তুলিবার যে বিদ্যা, তাহাকেই সোম বলে। ক্রমশঃ নূতন উপায় উদ্ভাবিত হওয়ায় প্রাচীন উপায় স্মৃতি-বহির্ভূত হইয়া পড়িল। Dymock বলিয়াছেন যে Zend Avesta নামক ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন যে, ইহা পেষণ করিয়া রস নিষ্কাশিত করা হইত, সে কথা বলা যায় না; পরন্তু ইহাই বোধ হয় যে, উহার কিয়দংশ ধান্যসুরাতে মিশ্রিত করা হইত। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন যে, সোম hop সদৃশ কোনও বস্তু এবং ইহা সুরা প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

আমাদিগের মন্তব্য।

Sir George Watt উদ্ভিদ-শাস্ত্রে বিশারদ বটে, কিন্তু বৈদিক পণ্ডিত ছিলেন না। Prof. Max Muller ও Roth ইঁহারা দুইজনে সোমের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া বিজ্ঞানবিদের ন্যায় Watt বলিলেন যে, সোমের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা শুনা যাইতেছে, তাহা হইতে বস্তুতঃ পক্ষে কোন উদ্ভিদ বিশেষের অনুমান অসম্ভব। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, তিনি কি লক্ষণ শুনিয়াছিলেন। পাঠক পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন যে, Roth ও Max Muller সংবাদে প্রকৃত পক্ষে আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত সোম সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়াছিল; এবং সকলেই প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত সোম ও বৈদিক সোম ভিন্ন বস্তু। বৈদিক সোমের রূপ ও গুণ নির্দ্ধারণের জন্য প্রকৃত চেষ্টা করা হইল না; এবং একটী ভাষ্যটীকা ধৃত বচনের উপর নির্ভর করিয়া নানা তর্ক ও যুক্তির ঘটা চলিতে লাগিল। সোম কাহারও মতে লতা বিশেষ। কেহ বলিলেন লতাত্মকতার প্রমাণ নাই। কেহ বলিলেন যে ইহা পেষণ করিয়া যে রস নিষ্কাশিত হয়, তাহাই পানীয় রূপে ব্যবহৃত হইত। অন্য একজন পণ্ডিত বলিলেন যে ইহা গাঁজলাইয়া তুলিলে ইহার মাদকতা শক্তি আবির্ভূত হইত। কেহ বলিলেন যে, এ সকল কথাই ভুল; ধান্যসুরাতে সোমের শাখাগুলি মিশ্রিত করা হইত। অবশেষে Sir George Watt বলিলেন, সোম নামে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। আয়ুর্ব্বেদোক্ত সোম ও বৈদিক সোম যে ভিন্ন বস্তু, তৎসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি; এবং বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যায় যে, ইহারা রূপে ও গুণে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, দেশীয় ভাষার মধ্যে নানা প্রকার উদ্ভিদ্কে সোম-আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে Muir, Hillebrandt ও Macdonell ইঁহারাই বৈদিক সোমের রূপ ও গুণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কেহই সেই সোমের উদ্ভিদ্ শাস্ত্রীয় জাতি নির্দ্ধারণ করেন নাই; এবং করিবার চেষ্টা করিলেও যে সফল হইতে পারিতেন, তাহা বোধ হয় না। কারণ, অনেকগুলি শব্দের অর্থ তাঁহারা উপযুক্ত মতে বিচার করেন নাই। সোম প্রস্তুত করণের প্রণালী সম্বন্ধে প্রয়োগ গ্রন্থের সাহায্য লওয়াও আবশ্যক। এবং ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তিব্বতীয় ভাষায় সোম অর্থে ভঙ্গা, এবং চীন ভাষায় সুম ও সিসম অর্থেও ভঙ্গা এবং মোগল ভাষায়ও সোম শব্দের অর্থ—ভঙ্গা। সোম যে গাঁজাইয়া তুলিয়া ব্যবহার করিতে হয়,—তাহার প্রমাণ কেহ দেখান নাই। পার্শীগণ আধুনিককালে যে উদ্ভিদ্ সোম বিবেচনায় ব্যবহার করেন, সেইটী যে প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রের হোম, তাহার প্রমাণ কেহ দেখান নাই। সোমে যে দুগ্ধবৎ রস আছে, তৎসম্বন্ধে বৈদিক গ্রন্থের কোনও প্রমাণ কেহ দেখান নাই।

প্রতিশোধ

শ্রীআশুতোষ ঘোষ, বি-এল

১

মাঘীপূর্ণিমা। সালুম্ব্রা রাজ্যের বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর এক বৎসর পরে, তাঁহার একমাত্র কন্যা রাণী মঞ্জরীর রাজ্যাভিষেকের উৎসব। নগরী দীপমালায় সজ্জিত, তোরণে তোরণে পুষ্পমালা, পতাকা ও নহবতের ধ্বনি। সামন্তরাজ সকলেই আসিয়াছেন। আসে নাই কেবল একজন। সে—অমরকেতন। অপুত্রক বৃদ্ধ রাজা কুমারী কন্যাকে সিংহাসনে মনোনীত করিয়াছেন—স্ত্রীলোকের বশ্যতা সে স্বীকার করিবে না। এক বৎসর ধরিয়া সে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রই করিতেছে।

উৎসবের পর যখন অমরকেতন যুদ্ধ ঘোষণা করিল, রাণী মঞ্জরী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

২

যুদ্ধক্ষেত্র—

মস্তকে নীলবর্ণের উষ্ণীষ, তেজস্বী অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া বর্ম্মপরিহিতা রাণী মঞ্জরী সৈন্য চালনা করিবার জন্য একটি উচ্চ মঞ্চস্থিত শিবিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুদ্ধের গতি নিরীক্ষণ করিতেছেন। বিদ্রোহীরা সংখ্যায় কম, কিন্তু সুশিক্ষিত। অনেক সৈন্য ক্ষয়ের পর রাণীর জয়লাভ হইল—অমরকেতন বন্দী।

৩

বিচারালয়—রাণী মঞ্জরী সিংহাসনে উপবিষ্টা—স্বর্ণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ বন্দী অমরকেতন সভায় আনীত হইল। মস্তক অবনত—

রাণী—"তুমিই অমরকেতন ?"

অ—আমি বন্দী—শীঘ্র বিচার শেষ করুন।

রাণী—যদি শীঘ্রই না হয়—আমি নারী বইত নয়—আজ থাক—কারাগারে ফিরে নিয়ে যাও।

সভা সেদিনকার মত ভঙ্গ হ'লো।

৪

কারাগার—কাল রাত্রি। বন্দী অমরকেতনের হস্ত মুক্ত—স্বর্ণশৃঙ্খল শুধু কটিদেশে আবদ্ধ। স্থির হ'য়ে সে কি ভাবছিল,—বুঝি তার স্বপ্নের কথা,—কোথায় আজ সিংহাসন, মরীচিকার মত মিলিয়ে গেল। দুইজন পরিচারিকা বর্ত্তিকা হস্তে সঙ্গে—

কে ও,—এ কি,—স্বয়ং রাণী মঞ্জরী যে!—অমরকেতন একটা ক্ষুদ্র অভিবাদন করিলেন।

রাণী—এই কি রাণীর প্রতি বন্দীর উপযুক্ত অভিবাদন ?

অমর—মৃত্যুর উপকূলে দাঁড়িয়ে আছে যে,—তার কাছ থেকে আবার শিষ্টতা কে আশা করে ?

রাণী—সখি, তোরা যা,—না—না,—দাঁড়া—আমিও যাবো,—বন্দী তুমি মুক্ত" নিজ হাতে শৃঙ্খল খুলিয়া দিলেন। বন্দী ধীর পদবিক্ষেপে চলিয়া গেলেন। সহচরী দ্বার মুক্ত করিয়া আসিয়া দেখিল—রাণী মূর্চ্ছিতা ও অপর সহচরী বীজন-রতা।

৫

রাণী মঞ্জরী পীড়িতা—তাই আজ বৃদ্ধ মন্ত্রী সভায় আসীন। আজ আর সে উৎসব নাই—শুধু আজ রাণীর ঘোষণাপত্র পঠিত হবে যে, কার উপর রাজ্যশাসন-ভার অর্পিত হবে। পরিচারিকা স্বর্ণপাত্রে মখমল-মণ্ডিত ঘোষণা-পত্র আনিয়া মন্ত্রীর হস্তে প্রদান করিল। সভাস্থ সকলেই স্থির। তুরী-ভেরী বাজিয়া উঠিল,—সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া মস্তক অবনত করিলেন। সামন্তগণের মুখে উৎকণ্ঠা,—রাণী কাহাকে না জানি শাসন-ভার দিবেন। মন্ত্রী গম্ভীর স্বরে ঘোষণাপত্র পাঠ করিলেন—শেষ অংশ—"অমরকেতনকেই উপযুক্ত বোধে শাসন ভার অর্পণ করিলাম।"

মধুচক্রে লোষ্ট্র পতনে গুঞ্জন শব্দবৎ ধ্বনি উত্থিত হইল। বজ্রগম্ভীর স্বরে মন্ত্রী সভা ভঙ্গ করিলেন!

৬

অমরকেতন পুনরায় বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে মগ্ন,—কয়েকটি সর্দ্দারের সহিত আলাপ করিতেছেন। সালুম্ব্রার অশ্বারোহী দূত পত্র-হস্তে সভার দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।

'সসম্মানে লইয়া এস'—

দূত অভিবাদনান্তে অমরকেতনের হস্তে পত্র প্রদান করিলেন। পত্র পাঠ করিয়া অমরকেতন ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন—

দূত—রাজন, মন্ত্রী ও অন্যান্য সামন্তগণ, আজ হইতে এক চান্দ্রমাস পরে আপনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবেন। বিদায়।

৭

রাণী রোগ-শয্যায়—বসন্তের শেষ গোলাপ যেন বৃন্তচ্যুত। শুষ্ক ধরণীতলে যেন তার সব পাপড়ি খসিয়া গেছে,—একটিমাত্র অবশিষ্ট—"সখি,—আর ক'দিন আছে!" "আর দুদিন মাত্র।"—একটি দীর্ঘ শ্বাস,—তারপর স্থির নিস্পন্দ। প্রাসাদে বাঁশরীর করুণ সুর রহিয়া রহিয়া বাজিয়া উঠিল—শ্বেতবস্ত্র পরিহিত শুভ্রকেশ আচার্য্য শেষ কার্য্য সমাধা করিয়া চলিয়া গেলেন।

৮

অমরকেতন প্রাসাদের আলেখ্য-মন্দিরে পাদচারণা করিতেছেন—পূর্ব্বতন রাজগণের আলেখ্যদর্শন করিতেছেন। ঐ যে আবৃত আলেখ্য—কার ? আবরণ উন্মোচন করিলেন। এই কি রাণী মঞ্জরী—কুসুম-পেলব বাহু-বল্লরী—নীল অঞ্চল যেন সরমে ভূমিতে লুটিয়া পড়িতে চায়!

অমরকেতন স্থির দৃষ্টিতে বলিলেন,—এ আলেখ্যের স্থান এখানে নয়—আমার কক্ষে লইয়া যাও—

৯

সে কি আর আসিবে না,—আজ এক বৎসর কত মিনতি করেছি 'ওগো অন্তরতম, মিটায়ে দাওগো সকল পিয়াস, আসি অন্তরে মম'।—সেদিন,—আবার মাঘী-পূর্ণিমা,—বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,—কাননে ফুটেছে বকুল পারুল, রজনীগন্ধা—সভার সময় উত্তীর্ণ,—রাজা কৈ ?—রাণীর আলেখ্য কক্ষচ্যুত—অমরকেতন তীক্ষ্ণধার ছুরিকায় নিজ বক্ষ বিদ্ধ করেছেন—তরুণ রক্তে আলেখ্যের বক্ষ রঞ্জিত।

ব্যর্থ

শ্রীঅনাথবন্ধু ঘোষাল

নীরব বীণার স্বর, থামিয়া গিয়াছে গান,
সুরটি পরাণে বাজে জাগায়ে মধুর তান ;
মিশায়ে গিয়াছে মেঘে ইন্দ্রধনুর শোভা,
হৃদয়ে এখনো ভাসে কান্তি মানস-লোভা ;

পড়েছে ঝরিয়া ফুল—সুবাস তাহার হায়,
এখনো মলয়ানিলে ভাসিয়া ভাসিয়া যায় ;
গিয়াছ চলিয়া সখে, ছিঁড়িয়া প্রণয় ডোর,
পরাণে জাগে গো সদা সে মধু-স্বপন মোর ;

সোনার স্বপন সেই জাগে গো মানস মাঝ,
কনক উদয়াচলে ফুল্ল প্রভাত সাজ ;
নর্ম্ম নটন তান বিমল তটিনীটির,
তরুণ অরুণ রাগে উঠিত প্লাবিয়া তীর ;

শুকায় কুসুম যবে, পাপড়ি তাহার ঝরি
পরাগ প্রিয়ের তরে বিছায় অবনী'পরি ;
নীরব বীণার স্বর, থামিয়া গেলেও গান
সুরটি পরাণে বাজে জাগায়ে করুণ তান।

আকাশের কথা

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায় বি-এস্‌সি

বর্ত্তমান ১৩৩১ সালে সৌরজগতের খবরটা একবার লওয়া যাউক্। এই সনের বৈশাখ মাসটি জ্যোতিষীগণের পক্ষে একটি স্মরণীয় সময়। কারণ গত ২৪শে বৈশাখ, বুধবার বা ইংরাজি ৭ই মে তারিখে সূর্য্যের নিকটতম বুধ বা Mercury গ্রহটি, পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝখানে সমসূত্রে অবস্থান করিয়াছিল। সুতরাং সূর্য্য, বুধ ও পৃথিবী এক সরলরেখা সূত্রে অবস্থান করায়, আমরা পৃথিবী হইতে বুধকে সূর্য্যদেহের উপর একটি ক্ষুদ্র মসীবিন্দুরূপে দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই ক্ষুদ্র মসীবিন্দুটি ধীরে ধীরে সৌরদেহের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল ; এবং জ্যোতিষীগণ এই সময় দূরবীক্ষণ-যোগে বুধ গ্রহটির নানা বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। এ বিষয় আলোচনার পূর্ব্বে বুধগ্রহটির বিষয় আমরা কিছু আলোচনা করিব।

সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর ন্যায় যে সকল সুবৃহৎ জ্যোতিষ্ক আপন আপন পথে ভ্রমণ করিতেছে, আমরা তাহাদিগকেই সাধারণতঃ গ্রহ বলিয়া থাকি। এই গ্রহগণের সংখ্যা সাধারণতঃ আটটি। সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া পর পর আটটি বৃত্ত অঙ্কিত করিলে, সেগুলি মোটামুটি ঐ গ্রহদিগের কক্ষা (orbit) নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই আটটি সমকেন্দ্রযুক্ত বৃত্তের সর্ব্বকনিষ্ঠ বৃত্তটিই বুধ বা Mercury-র ভ্রমণপথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। সুতরাং বুধগ্রহটিই হইতেছে সূর্য্যের নিকটতম নক্ষত্র। বুধের ভ্রমণ-পথের পরবর্ত্তী বৃহৎ বৃত্তটি শুক্র বা Venus-এর ভ্রমণপথ নির্দ্দেশ করে এবং তৃতীয় বৃত্তটিই আমাদের পৃথিবীর ভ্রমণপথ। সুতরাং সৌরজগতের একমাত্র পালক এবং রক্ষক সূর্য্যের কোলের উপর আদুরে ছেলেটির মত বুধগ্রহটি অবস্থিত রহিয়াছে। বুধের পর ভিনাস্ বা শুক্রগ্রহের নাম ও তার পর পৃথিবীর নামের কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। বুধ এবং পৃথিবী গ্রহ নাম ধারণ করিলেও উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ বুধের আহ্নিক গতি নাই ; অর্থাৎ পৃথিবী যেমন লাটুর মত নিজের চারিদিকে ঘুরপাক্ খাইয়া দিন ও রাত্রির সৃষ্টি করে, বুধ কখনো তেমন ভাবে

নিজের চারিদিকে ঘুরপাক্ খায় না। সৌসাদৃশ্যের দিক্ দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয়, চন্দ্র ও বুধ এক শ্রেণীরই গ্রহ। ইহারা চিরকালই সূর্য্যের দিকে একটা পিঠ রাখিয়া নিজেদের ভ্রমণ-পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। সুতরাং বুধ ও চন্দ্রের একটা পিঠ্ই আজন্মকাল ধরিয়া রৌদ্র পাইয়া আসিতেছে ; এবং অপর পিঠটা চিরকালের জন্য ঘোর তমসাচ্ছন্ন। বুধ সাধারণতঃ অষ্ট-আশী দিনে সূর্য্যের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসে। সুতরাং বুধের এক বৎসর অষ্ট-আশী দিনে। বুধের ভ্রমণ-পথ বড় কম লম্বা নয় ; এবং এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ-পথ সে মোটে অষ্ট-আশী দিনে নিঃশেষ করিয়া ফেলে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, বুধের গতির বেগ কত দ্রুত। জ্যোতিষীগণ হিসাব করিয়া বলেন যে, বুধের গতির বেগ সেকেণ্ডে ত্রিশ মাইল করিয়া। এই প্রবল গতির জন্যই প্রাচীনকালে গ্রীকেরা বুধকে 'মারকারি' (Mercury) বা "সূর্য্যের দূত" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সূর্য্যের খুব নিকটে থাকিলেও সূর্য্য হইতে ইহা প্রায় সাড়ে তিন কোটী মাইল ব্যবধানে রহিয়াছে। ইহার ব্যাস বা Diameter তিন হাজার মাইল। প্রাচীন গ্রীসের পুঁথি উল্টাইলে ১৫ই মে তারিখটি একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন্ গ্রীকেরা এই তারিখে তাঁহাদের দেবতা মারকারির (Mercury) পূজা করিয়া নানা উৎসবাদির আয়োজন করিতেন। এই ১৫ই মে তারিখের উৎসবটি গ্রীক্‌গণের বার্ষিক উৎসব। ইহার সহিত বুধগ্রহের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও, বর্ত্তমান সনে যখন বুধগ্রহ, পৃথিবী ও সূর্য্যের সহিত সমসূত্রে অবস্থান করিতেছে, এবং তাহাদের এই অবস্থিতির সময় ৭ই মে, তখন উভয়ের মধ্যে কতকটা সৌসাদৃশ্য দেখিয়াই কথাটার উল্লেখ করিলাম। কেবল-মাত্র বর্ত্তমান্ সনেই এই ৭ই মে ঘটনাক্রমে ১৫ই মে তারিখের সহিত মাস হিসাবে যে সামান্য ঐক্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, সেই কথাই বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মার্কিনদেশের জ্যোতিষীগণ দূরবীক্ষণ দিয়া তথাকার ২—৪২ মিনিটের সময় বুধগ্রহকে একটি মসীবিন্দুরূপে সৌরদেহের উপর প্রথম আবির্ভূত হইতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। অতঃপর ইহাকে সৌরদেহের উপর দিয়া নিম্ন ও দক্ষিণাভিমুখে ধীরে ধীরে বিচলিত হইতে দেখা যায়। অবশেষে সূর্য্যাস্তকালে ইহা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া যায়। এই চার-পাঁচ ঘণ্টাকাল জ্যোতিষীগণ বুধগ্রহ বিষয়ে নানা নূতন তথ্য জানিতে পারিয়াছেন। সৌরদেহে যে সকল সৌরকলঙ্ক বা Sunspot রহিয়াছে, তাহারা অপরিবর্ত্তনীয় ; কিন্তু এই মসীবিন্দুরূপ বুধগ্রহটি এই পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া কেবল সরিয়া সরিয়া সৌরদেহের নিম্নভাগে নামিয়া আসিতেছিল। সুতরাং সৌরকলঙ্ক ও বুধগ্রহের সহিত গোল হইবার কোনই কারণ ছিল না। ইংরাজি কোন্ কোন্ সালে ও কি কি মাসের কোন্ কোন্ তারিখে বুধগ্রহ, সূর্য্য ও পৃথিবীর সহিত সমসূত্রে অবস্থান করিয়াছিল, তাহার একটা তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

তারিখ	খৃষ্টাব্দ
৬ই নভেম্বর,	১৯১৪।
১৩ই নভেম্বর,	১৯০৭।
১০ই নভেম্বর,	১৮৯৪।
৭ই মে,	১৮৯১।

বর্ত্তমান সনের হিসাব ধরিয়া মাত্র পাঁচবারের হিসাব এই তালিকায় দেওয়া হইয়াছে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আগের হিসাব আমরা সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে কোন্ কোন্ খৃষ্টাব্দে এই একই ঘটনা ঘটিবে, তাহার একটা তালিকাও জ্যোতিষীগণের হিসাবের অন্তর্গত আছে। নিম্নে তাহার উল্লেখ করা হইল—

তারিখ।	খৃষ্টাব্দ।
৯ই নভেম্বর	১৯২৭।
১১ই নভেম্বর	১৯৪০।
১৩ই নভেম্বর	১৯৫৩।
৫ই মে	১৯৫৭।
৭ই নভেম্বর	১৯৬০।

পূর্ব্বোক্ত তালিকা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বুধগ্রহ সাত হইতে তিন বৎসরের ব্যবধান হিসাবে এক-একবার সূর্য্য ও পৃথিবীর সহিত সমসূত্রে অবস্থান করে। কোনো নির্দ্দিষ্টকালের ব্যবধানে ইহা কদাপি সূর্য্য ও পৃথিবীর সহিত এক ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হয় না। সুতরাং ইহাকে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে ফেলিতে পারা যায় না।

নৃতত্ত্ব *

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল ভাষাতত্ত্বরত্ন এম-এ

প্রাণিবিদ্যায় প্রাণীদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, তাহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়,—(১) দণ্ডী, অর্থাৎ যাহাদের মেরুদণ্ড আছে; এবং (২) দণ্ডহীন, অর্থাৎ যাহাদের মেরুদণ্ড নাই। মশা, মাছি, কেঁচো, চিংড়ি মাছ ইত্যাদি দণ্ডহীন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দণ্ডী জন্তু চারি প্রকারের,—(ক) সরীসৃপ, যেমন সাপ, (খ) মৎস্য, (গ) পক্ষী এবং (ঘ) স্তন্য-পায়ী। স্তন্যপায়ীদিগকে নানা বর্গে (genus) বিভক্ত করা যাইতে পারে, এবং প্রত্যেক বর্গে এক, দুই বা ততোধিক জাতি (species) পাওয়া যায়; যেমন সারমেয় বর্গে কুক্কুর, শৃগাল, নেকড়ে ইত্যাদি কয়েকটী জাতি। আবার, কুক্কুর জাতিকে কয়েকটী উপবিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা হাউণ্ড, গ্রে হাউণ্ড, বুল্‌ডগ, মাষ্টিফ্, টেরিয়র, স্পানিয়েল ইত্যাদি। ইহাদিগকে অপরা জাতি বলা যাইতে পারে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মনুষ্য স্তন্যপায়ীদের কোন্ বর্গ ও কোন্ জাতির অন্তর্গত? মনুষ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে বহুকাল পর্য্যন্ত বাদানুবাদ চলিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই স্বীকার করেন যে, স্তন্যপায়ীদের মধ্যে মনুষ্য একটী স্বতন্ত্র বর্গ, এবং মনুষ্যবর্গ মধ্যে কেবল একটী মাত্র জাতি বিদ্যমান, অন্য জাতি নাই। একটী মনুষ্য-মিথুন হইতে সকল মনুষ্যের উৎপত্তি নাও হইতে পারে, কিন্তু ইহারা যে একটী পৃথক্ গোষ্ঠীসম্ভূত, তাহা এক প্রকার নিশ্চিত। এখনও দুই-একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁহারা বলেন যে, ককেসীয়, মোঙ্গোলীয়, ইথিওপিয়, মলয়, ও আমেরিকান এই পাঁচ শ্রেণীর মনুষ্য পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন নরযুগল হইতে উৎপন্ন; অর্থাৎ তাহারা পাঁচটী ভিন্ন ভিন্ন জাতি (species)। কিন্তু এক্ষণে সে মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং স্থির হইয়াছে যে, মনুষ্য একটী পৃথক্ বর্গ, এবং এক্ষণে এই বর্গে একটীমাত্র জাতি আছে। প্রাণিতত্ত্ব-বিদ্‌গণ এন্থ্রোপইডিয়া নামক একটী বৃহৎ পরিবারকে দুই বর্গে বিভক্ত করিয়া, এক বর্গের নাম হোমিনইডী, এবং অপর বর্গের নাম সিমিইডী দিয়াছেন। এই হোমিনইডী বর্গই মনুষ্য-বর্গ। সিমিইডী বর্গের চারিটী শাখা বা জাতি (species),—গিবন্, ওরাঙ্গ্-উটান্, গোরিলা ও শিম্পাজী। মনুষ্যকে স্বতন্ত্র বর্গ ও জাতি বলিয়া ধরা হইয়াছে; এবং মনুষ্য যে বানর হইতে উৎপন্ন নয়, তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ পৃথিবীর বয়সকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পৃথিবীর শৈশবে এক প্রকারের জীবনিচয় পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। বাল্যাবস্থায় অন্য প্রকারের জীবসমূহের আবির্ভাব হইয়াছিল। যৌবনে নূতন প্রকারের জীব দেখা দিয়াছিল। বর্ত্তমান যুগের জীব ভিন্ন প্রকারের। প্রাথমিক যুগের অনেক জীব ক্রমোন্নত হইয়া দ্বিতীয় যুগের জীবে পরিণত হইয়াছিল। আবার অনেক জীব জীবন সংগ্রামে পরাহত হইয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। এইরূপে তৃতীয় যুগে দ্বিতীয় যুগের অনেক জীবের ক্রমোন্নতি হইয়াছিল, এবং অনেকের লোপ হইয়াছিল। প্রথম যুগকে Palaeozoic বা প্রত্নজীবক বলে, দ্বিতীয় যুগকে Mesozoic বা মধ্যজীবক বলে, তৃতীয় যুগকে Cainozoic বা নব্যজীবক বলে, এবং চতুর্থ যুগকে আধুনিক যুগ বলে। প্রত্যেক যুগকে কতকগুলি উপযুগে ভাগ করা হইয়াছে; যথা—

* শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত।

নিস্তব্ধ নিশীথে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মহম্মদ আবদার রহমান চঘ্‌তাই

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATION

(১) প্রত্নজীবক (Palaeozoic)	আদিম (Archaean) কাম্ব্রীয় (Cambrian) অর্দোভিসীয় (Ordovician) সিলিউরীয় (Siluran) ডিবোনীয় (Devonian) অঙ্গারবহ (Carboniferous) পার্মীয় (Permian)
(২) মধ্যজীবক (Mesozoic)	ত্রায়াসীয় (Triassic) জুরাসীয় (Jurassic) খটিক (Cretacious)
(৩) নব্যজীবক (Cainozoic)	প্রাগাধুনিক (Eocene) অল্পাধুনিক (Oligocene) মধ্যাধুনিক (Miocene) বহ্বাধুনিক (Pliocene) অন্ত্যাধুনিক (Pleistocene)

(৪) আধুনিক

বহ্বাধুনিক (Pliocene) যুগে এন্থ্রোপইডী পরিবার-ভুক্ত জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন তুইটী ধারা অবলম্বন করিয়া তুইটী পৃথক বর্গে পরিণত হইয়াছে। এক বর্গে মনুষ্য, ও অপর বর্গে গিবন, ওরাঙ্গ্-উটান্, গোরিলা ও শিম্পাঞ্জী। অন্ত্যাধুনিক (Pleistocene) যুগ হইতে মানবের নিশ্চিত নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী বহ্বাধুনিক (Plieocene) যুগে মুনুষ্যের অস্তিত্বের পরিচয় না পাইলে, সিমইডী বর্গ ও হোমিনইডী বর্গ একই আদিম পরিবারের তুইটী বিভিন্ন শাখা প্রমাণিত হয় না।

রাইন প্রদেশে নিয়ান্দের থাল নামক একটী উপত্যকা আছে। সেখানে অতি প্রাচীন কালের মনুষ্যের একটী কঙ্কালের কয়েকটি অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা অন্ত্যাধুনিক যুগের নর-কঙ্কাল বলিয়া প্রমাণিত হয়, এবং ইহাই সর্ব্ব প্রাচীন নর-কঙ্কাল বলিয়া বিশ্বাস ছিল। নৃবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বহুকাল হইতে বহ্বাধুনিক যুগের মনুষ্য-কঙ্কালের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন ; কিন্তু আবিষ্কারে সফলকাম হয়েন নাই। হঠাৎ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ইয়ুজীন ডুবয় যবদ্বীপে সোলো নদীর তীরবর্ত্তী বহ্বাধুনিক ভূস্তরে একটী নরকঙ্কালাবশেষ আবিষ্কার করেন। এই কঙ্কালাবশেষ বহ্বাধুনিক (Pliocene) যুগের নরের কঙ্কাল বলিয়া প্রমাণিত হওয়াতে, শৃঙ্খলের যে অংশটী লুপ্ত ছিল, তাহা সংযোজিত হইয়া গেল, এবং প্রমাণিত হইয়া গেল যে, মনুষ্য ও বানর একই বংশের তুইটী বিভিন্ন শাখা প্রসূত।

যবদ্বীপে আবিষ্কৃত নরকপালটী শিম্পাঞ্জীর ও নিয়ান্দের থালের কপালের মধ্যবর্ত্তী লক্ষণ বিশিষ্ট। একজন সাধারণ য়ুরোপবাসীর করোটীর আভ্যন্তরীণ পরিমাণে ও নিয়ান্দের থালের করোটীর আভ্যন্তরীণ পরিমাণে যে প্রভেদ, নিয়ান্দের থালের করোটীর আভ্যন্তরীণ পরিমাণে ও যবদ্বীপস্থ ঐ সর্ব্ব প্রাচীন করোটীর আভ্যন্তরীণ পরিমাণেও সেই প্রভেদ। এই আবিষ্কারের দ্বারা মনুষ্যের বহু প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় ; এবং প্রত্নজীবতত্ত্ববিদেরা যে স্থানকে মনুষ্যের আদি জন্মভূমি বলিয়া অনুমান করিতেন, সেই স্থানেই এই সর্ব্ব প্রাচীন কঙ্কাল আবিষ্কৃত হওয়াতে, তাঁহাদের অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে।

এই জন্মভূমি হইতে মনুষ্য পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যের মাল্যভূমি অতি প্রাচীন, —হিমালয় পর্ব্বত হইতেও অনেক প্রাচীন। মনুষ্য জাতির বিস্তারের সময় দাক্ষিণাত্য মালভূমি মাদাগাস্কর ও দক্ষিণ

আফ্রিকার সহিত সংযুক্ত ছিল। তখন স্থমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিও ইত্যাদি ছোট বড় ভূভাগ দ্বীপে পরিণত হয় নাই; ইহারা এসিয়ার সহিত সংযুক্ত ছিল। অষ্ট্রেলিয়া নিউগিনীর সহিত সংযুক্ত থাকিয়া পশ্চিমে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন নিউজীলন্দের আয়তন আরও বৃহৎ ছিল। ভূগোলকের উত্তরার্দ্ধে জিব্রল্টারে ও তুই তিনটী অপর স্থানে আফ্রিকার সহিত য়ুরোপের সংযোগ ছিল। ব্রিটেন য়ুরোপের সহিত সংযুক্ত ছিল, এবং এখান হইতে আইসলণ্ড, গ্রীনলণ্ড ইত্যাদি হইয়া উত্তর আমেরিকা পর্য্যন্ত এক অবিচ্ছিন্ন ভূমিখণ্ড বিদ্যমান ছিল। এদিকে এসিয়ার পূর্ব্বোত্তরে সাইবীরিয়ার পূর্ব্বাংশের সহিত উত্তর আমেরিকার পশ্চিমোত্তরস্থ আলস্কার সংযোগ ছিল।

যখন মনুষ্যগণ প্রথমে স্বস্থান ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা কোন উদ্দেশ্য লইয়া ভ্রমণে বাহির হয় নাই। অন্যান্য জন্তুরা যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিচরণ করে, সেই ভাবেই তাহারা বহির্গত হইয়াছিল। এখনকার সাধারণ য়ুরোপবাসীর মস্তিষ্কের আয়তন ১৫০০ বা ১৬০০ কিউবিক সেণ্টিমীটার। ওরাঙ্-উটানের মস্তিষ্কের আয়তন ৫০০ কিউবিক সেণ্টিমীটার। যবদ্বীপের অতি প্রাচীন অধিবাসীর মস্তিষ্কের পরিমাণ ৯৫০ কিউবিক সেণ্টিমীটারের অধিক ছিল না। অতএব ঐ প্রাচীন সময়ে মনুষ্য ও নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে অধিক ব্যবধান ছিল না। অবশ্য তখন মনুষ্য পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে ও চলিতে পারিত, এবং তাহার হস্ত সুগঠিত অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। ইন্দু-চায়নাতে বহ্বাধুনিক (Pliocene) যুগের যে সকল অস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তখন সে সেই হাত দিয়া তাহা নির্ম্মাণ করিতে পারিত। কিন্তু অপরাপর বিষয়ে সে অপরাপর জন্তু হইতে অধিক বিভিন্ন ছিল না। অপরাপর জন্তুরা যে ভাবে জীবন-সংগ্রাম চালাইত, মনুষ্যও সেইরূপে জীবন-সংগ্রাম চালাইত। কেবল প্রভেদের মধ্যে এই যে, অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা মানুষের অধিক বুদ্ধি থাকাতে, সে তাহাদের উপর নিজ আধিপত্য স্থাপিত করিতে পারিয়া, একটীমাত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। যেমন আধুনিক যুগে ভূগোলকের সর্ব্বাংশ মনুষ্য কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তেমনই অন্ত্যাধুনিক (Pleistocene) যুগেও তাহা দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বস্থান পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পৃথিবীর সর্ব্বাংশ হইতে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যাহা হইতে বুঝা যায় যে, উত্তর ও দক্ষিণ গোলকার্দ্ধে ক্রমান্বয়ে যে কয়েকটী হিমানীর উৎপাত হইয়াছিল, সেই উৎপাতগুলির সময়েও পৃথিবীর সর্ব্বাংশ মনুষ্য কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল। যখন মনুষ্য বাহ্য-প্রকৃতিতে বহ্বাধুনিক যুগের মনুষ্য অপেক্ষা বিশেষ উন্নত হয় নাই, যখন সে সভ্যতায় অগ্রসর হয় নাই, যখন সে শিল্প-নৈপুণ্য-বিহীন প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্রাদি ব্যতীত অন্য শ্রমশিল্পে অনভিজ্ঞ ছিল, তখনও সে পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

পূর্ব্ববর্ণিত স্থলাংশগুলির সংযোগ থাকাতে অন্ত্যাধুনিক যুগের মনুষ্যেরা ভারতের পূর্ব্বদক্ষিণস্থ ভূভাগ হইতে উত্তর অভিমুখে যাত্রা করিয়া এসিয়া খণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং বেয়ারিং ষ্ট্রেটের সমীপস্থ সংযোগস্থল দিয়া আমেরিকায় গমন করিয়াছিল। পশ্চিমে ভারত-সাগরের মধ্যে দাক্ষিণাত্য হইতে আফ্রিকা পর্য্যন্ত ভূমি সংযুক্ত থাকাতে, তাহারা আফ্রিকা মহাদেশে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেখান হইতে জিব্রাল্টর ও সিসিলীর সংযোগপথ দিয়া য়ুরোপে অবতীর্ণ হইতে পারিয়াছিল, এবং সেখান হইতে হিমানী যুগে গ্রীনল্যাণ্ড দিয়া আমেরিকায় পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মনুষ্যজাতির বিস্তারের এই সিদ্ধান্ত হইতে আর একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তাহা এই যে, তাহাদের পরবর্ত্তী শারীরিক ও মানসিক উন্নতির পূর্ব্বে এই বিস্তার সজ্ঘটিত হইয়াছিল। অতএব মনুষ্যজাতির ক্রমবিকাশ দ্বারা ককেশিয়ান ইত্যাদি যে সকল উপজাতি উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে যে সকল সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রত্যেক উপজাতির মধ্যে পৃথক্ ও স্বাধীন ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। এ কথা সত্য নয় যে, কোন বিশেষ এক শ্রেণীর লোক এক দেশ হইতে অন্যান্য দেশে স্থানান্তরিত হইবার সময়ে নানা প্রকার বিশিষ্টতা গ্রহণ করিয়াছে; যেমন ধরুন, কৃষ্ণবর্ণ কোন এক শ্রেণীর লোক আফ্রিকা হইতে য়ুরোপে যাইয়া শ্বেতবর্ণ হইয়া গেল, আর একটী দেশে গিয়া পীতবর্ণ হইয়া গেল, তৃতীয় একটী দেশে গিয়া পিঙ্গলবর্ণ হইয়া গেল ইত্যাদি। মনুষ্যজাতির বিবর্ত্তনের

ধারা এরূপ নহে। অন্ত্যাধুনিক (Pleistocene) যুগের লোক পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই যুগের সকল লোক সর্ব্বত্র একই প্রকারের ছিল। দীর্ঘকাল এক একটী স্থানে বাস করায়, সেই সেই বাসস্থানোপযোগী কতকগুলি বিশেষত্ব স্বতঃই তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতির মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই কারণেই মনুষ্যজাতির উপজাতিগুলি উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের বাসস্থান, জলবায়ু, আহার, বংশপরম্পরাগত গুণ, ও কাল তাহাদিগকে যেরূপভাবে গঠিত করিয়াছে, তাহারা তাহাই হইয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে তাহারা যদি নিজস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে আশ্রয় লয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে এই নূতন স্থানটী তাহাদিগের উপযোগী কি না। যদি নূতন স্থানটী পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানের সদৃশ হয়, তাহা হইলে সেই জাতি সেখানে তিষ্ঠিতে পারে। নতুবা অন্য স্থানে যাইতে হয়, বা আদিম বাসীদের সহিত মিশ্রণ দ্বারা তাহাদের বিশিষ্টতা লোপ পায়, অথবা তাহারা ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া যায়।

অন্ত্যাধুনিক যুগের মনুষ্যেরা নিজ নিজ মনোমত বাসস্থান অধিকার করিবার পর হইতেই উপজাতির বিবর্ত্তনের এবং মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষের যুগপৎ সূত্রপাত হইল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্নতা বশতঃ ফলের বিভিন্নতা ঘটিল। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক স্থানে, যথা নাতিশীতোষ্ণ উত্তর মণ্ডলে, মানুষ শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষের চরম সীমায় উপনীত হইল। প্রাচীনকালে মিসর, বারিরুষ, আসুরীয়া, পারস্য, ভারতবর্ষ, চীনদেশ, এসিয়া মাইনরের উপকুল, ফিনীসীয়া, গ্রীস, ইটালী, এবং পরবর্ত্তী সময়ে য়ুরোপ, বিশেষ বিশেষ সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই মণ্ডলই প্রধান প্রধান ধর্ম্মের—যথা বৈদিক, আবেস্তীক, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের—উৎপত্তি স্থান। এই মণ্ডলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষাসমূহ—যথা সংস্কৃত, পারসী, আরবী, হীব্রু, গ্রীক, লাটিন এবং কয়েকটী আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। এই উৎকর্ষ আকস্মিক নহে, ইহার মূলে স্থান-মাহাত্ম্য আছে। ইহা হইতে "পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে প্রত্যেক জীবের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধিত হয়" এই সত্যের উপলব্ধি হয়।

অন্যত্র মনুষ্যজাতি পিছাইয়া পড়িয়াছে। অনেক স্থানের মনুষ্য এখনও বন্য ও অসভ্য রহিয়া গিয়াছে, যেমন দক্ষিণ গ্রীষ্মমণ্ডলবর্ত্তী মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে, পূর্ব্ব ম্যালেসিয়াতে, নিউগিনীতে, অষ্ট্রেলিয়াতে, মেলানেসিয়াতে, ফিউএগিয়াতে।

এখন সভ্যতার বিবর্ত্তনের কিছু উল্লেখ করিব। প্রথমে মনুষ্য নিরামিষভোজী ছিল। হিমানীযুগে উদ্ভিদের ধ্বংস বশতঃ মনুষ্যকে মাংসভোজী হইতে হইয়াছিল। আহার সংগ্রহের জন্য শিকার করিতে ও মাছ ধরিতে হইত। পরে সে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। এই সকল কার্য্যের জন্য যে সকল যন্ত্র আবশ্যক হইত, তাহার কৌশল তাহাকে ক্রমে ক্রমে শিখিতে হইয়াছিল। প্রথমে এই সকল অস্ত্র প্রস্তর হইতে, পরে ধাতু হইতে নির্ম্মিত হইত। বিভিন্ন স্থানের অস্ত্রের নির্ম্মাণ-প্রণালীতে এরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় যে, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

অতএব বৈজ্ঞানিকেরা মানবের প্রাথমিক সভ্যতাকালকে তুইটী যুগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের নাম দিয়াছেন "প্রাচীন প্রস্তরযুগ" ও "নব্য প্রস্তরযুগ"। প্রাচীন প্রস্তরযুগ অতি দীর্ঘকালব্যাপী যুগ। এই যুগে অগ্ন্যুৎপাদক প্রস্তর (Flint)কে ছোট ছোট খণ্ডে, পাতলা পাতে বা অন্য কোন আকারে পরিণত করিয়া যে অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করা হইত, তাহাতে স্থূলতা ব্যতীত সূক্ষ্মতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু নব্য প্রস্তর যুগের অস্ত্রাদি যত্নসম্ভূত, সুপরিষ্কৃত ও কৌশল-নিষ্পন্ন। এক্ষণে প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ইতিহাস-পরিচিত কয়েকটী জাতি আদি হ্যামাইট্, আদি সেমাইট্, আইবীরীয়, লিগুরীয়, পোলাস্‌জীয় এবং আর্য্যভাষা-ভাষী কয়েকটী জাতি—নব্যপ্রস্তর যুগেই মধ্য ও পশ্চিম য়ুরোপে, ভূমধ্যসাগরের তীর হইতে মেসোপটেমিয়া পর্য্যন্ত স্থানে আবাস স্থাপন করিয়াছিল। যদিও এই সকল জাতি প্রস্তর-নির্ম্মিত আয়ুধ ব্যতীত অন্য প্রকারের আয়ুধ নির্ম্মাণে সমর্থ ছিল না, তথাপি তাহারা অন্ত্যাধুনিক যুগের মানব অপেক্ষা সভ্যতায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রাচীন প্রস্তর-যুগের দৈর্ঘ্য কল্পনার অতীত।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই যুগ কয়েক লক্ষ বৎসরব্যাপী। অন্ত্যাধুনিক যুগের মানবকুলের এই দীর্ঘ

যুগে এক স্থানে আবদ্ধ থাকা সম্ভব নহে। ভ্রমণকালে তাহাদের মধ্যে যাহারা সুবিধামত স্থান পাইয়াছিল, তাহারা সেখানে বাস করিয়া অন্যান্য দল অপেক্ষা সভ্যতায় অগ্রসর হইয়াছে। অতএব দুইটী প্রস্তর-যুগের মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যবধান নিরূপণ করা যায় না। মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে যে, নব্যপ্রস্তর যুগের লোকেরা অগ্নির উপর অধিকতর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল, ধর্ম্মের অধিকতর উন্নত ভাবের উপলব্ধি করিয়া মৃতের সমাধি ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিত, শস্যাদি উৎপন্ন করিতে পারিত, কতকগুলি পশুকে স্ববশে আনিতে পারিয়াছিল, প্রয়োজনীয় শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়া মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ, বস্ত্রবয়ন, গৃহনির্ম্মাণ ইত্যাদি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহাদের সমাধিস্তূপগুলি এত দৃঢ় যে তাহা এখনও পর্য্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র—ব্রিটেন, ব্রিটানী, স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, সীরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ভারতবর্ষ, কোরিয়া, জাপান, প্রশান্ত মহাসাগরস্থ অনেক দ্বীপ ও আমেরিকাতে বিদ্যমান আছে। সেই সকলের আদর্শেই পরবর্ত্তী সময়ে ইট্রুরিয়া, মাইকীনী, ফিনিসিয়া ও মিসরে সৌধ ও পিরামিডাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই প্রকারে এখনও ডেন্মার্কের, জাপানের, অষ্ট্রেলিয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্রতীরে উভয় প্রস্তরযুগের যে সকল শামুকের খোলার স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে উভয় যুগের সংযোগের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন কালের অসভ্য মানবের আরও একটী চিহ্ন এ যুগের অসভ্য মানবের মধ্যেও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কাম্বোডিয়া, নিউগিনী, বোর্ণিও, ভেনেজুয়েলা ইত্যাদি পরস্পর হইতে বহু ব্যবধানে অবস্থিত দেশে অসভ্য জাতিদিগকে হ্রদের জল মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠকীলক প্রোথিত করিয়া তদুপরি গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে দেখা যায়। নবপ্রস্তর যুগেরও এরূপ হ্রদমধ্যস্থিত গৃহের চিহ্ন সুইজারল্যাণ্ডে, উত্তর ইটালীতে, আয়ারল্যাণ্ডে, ও স্কটল্যাণ্ডে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রস্তর-যুগের পরেই ধাতু-যুগ। ইহাকে তিন উপযুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) তাম্রযুগ, (২) ব্রোঞ্জযুগ এবং (৩) লৌহযুগ। এই যুগে অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের জন্য প্রস্তরের পরিবর্ত্তে প্রথমে তাম্র, পরে ব্রোঞ্জ বা কাংস্য ও শেষে লৌহ ব্যবহৃত হইতে থাকে। পরবর্ত্তী ধাতু পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুকে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করে নাই। ব্রোঞ্জ উপযুগে তাম্র ও ব্রোঞ্জ উভয়ই নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। লৌহ উপযুগ এখনও পর্য্যন্ত চলিতেছে, এবং তিনটী ধাতুই পূর্ব্ববৎ ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার পরেই মানুষের দেহের ক্ষতি হইয়া মস্তিষ্কের উন্নতি হইয়াছে। মানুষ ক্রমশঃই বুদ্ধির বৃদ্ধি সহকারে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির অধীনতা কাটাইয়া স্বাধীন হইয়াছে, প্রত্যুত পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সে নিজের আয়ত্তে আনিয়াছে এবং অন্যান্য জীবকে নিজের অধীন করিয়াছে। এই রূপে নিজেকে সে একটী মাত্র জাতিতে (species) পরিণত করিয়াছে। সে নৌকাযোগে সমুদ্র পার হইতে পারে এবং স্থলেও গমনাগমনের নানা প্রকার সুবিধা করিয়া লইয়াছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া নব্য প্রস্তরযুগ হইতেই চলিতেছে। তাহার ফলে মনুষ্যের প্রাথমিক উপজাতিগুলি এখন মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। এখন যে সম্প্রদায়গুলিকে জাতি বলে, তাহারা শোণিত-সূত্রে জাতি নয়, কেবল সভ্যতা-সূত্রে জাতি।

ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রভেদ যথার্থ ভাবে করা যায় না। ঐতিহাসিক যুগের যথার্থ লক্ষণ লিখনের ব্যবহার। তাহার পূর্ব্বের কাল প্রাগৈতিহাসিক যুগ।

এখনকার মিশ্র জাতিগুলিকে নৃতত্ত্ববেত্তারা সর্ব্ববাদী-সম্মতিক্রমে চারিটী শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—(১) ইথিওপিক বা নীগ্রো, (২) মোঙ্গোলীয় বা পীত, (৩) আমেরিকান বা পিঙ্গল এবং (৪) ককেশীয় বা শ্বেত। ইথিওপিকের বাসস্থান ভারত সাগরের উভয় পার্শ্বের গ্রীষ্মপ্রধান মণ্ডলে (অর্থাৎ সাহারার দক্ষিণে ও অষ্ট্রেলিয়ায়)। এসিয়ার অধিকাংশ স্থান এবং য়ুরোপের সংলগ্ন স্থল পীত জাতি দ্বারা অধ্যুষিত। পিঙ্গল জাতির বাস আমেরিকাতে। সমগ্র য়ুরোপে, আফ্রিকার উত্তরাংশে এবং এসিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ককেশীয় জাতির বাস। ভারতবর্ষ ইহার অন্তর্গত।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

প্রজাস্বত্ব আইন ও দেশের অবস্থা

শ্রীকৃষ্ণনাথ সেন

ইংরেজ বাঙ্গলা দেশ হাতে লইয়া শাসন সংরক্ষণ ও আদায় তহসিলের কোনরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহাদের পক্ষান্তরে একদল প্রতিপত্তিশালী লোকের অভাবও বড়ই অনুভব করিতেছিলেন। মুসলমান আমলে যাহাদের সহিত রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত ছিল, তাহাদেরই অনেকের সহিত প্রথম দশ বৎসর ম্যাদে মুদ্রায় রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া, তাহাতেও অসুবিধা দূর হইল না। ব্যবসায় বাণিজ্যের অন্তরায় উপস্থিত হইল, রাজকার্য্য পরিদর্শন কাজেও ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। তাই ইংরেজ একদল প্রতিপত্তিশালী লোকের স্বার্থে নিজেদের স্বার্থ এমন এক করিয়া দিলেন যে, ইংরেজের রাজ্যের বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়াইবেন, ইঁহারা শতজন তাঁহার শত্রু, ইংরেজের রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিলে ইঁহারা নিরাপদ, ইংরেজকে যাইতে হইলে ইঁহাদের জমীদারীর স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বাঙ্গলা এবং পদানুগত বাঙ্গালীর স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থের দিকেই বেশী তাকাইয়া এ দেশে নিজেদের স্থায়িত্বের বুকভরা ভরসায় অনন্যোপায় হইয়া কতকগুলি প্রকৃষ্ট সর্ত্ত দিয়া তৎকালীন চৌকস ও প্রতিপত্তিশালী লোকগুলির সহিত ইংরেজ যে বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন, তাহা Lord Cornwallisএর "Independent of all the considerations I can assure you that it will be of utmost importance for promoting the solid interest of the Company" এই উক্তি হইতেও বেশ বুঝা যায়। এইরূপে বঙ্গে ইংরেজ আমলে জমীদার শ্রেণীর অভ্যুদয় হইল; অন্যদিকে থাকিলেন দেশের অন্নদাতা কৃষককুল ও অপরাপর জাতিগত ব্যবসায়াবলম্বী দেশের অন্যান্য লোক। জমীদার হইলেন ভূম্যধিকারী, অপরাপর সকল শ্রেণীই হইলেন কোন না কোন প্রকারে প্রজাগণ্ডীভুক্ত।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও প্রজা ও ভূম্যধিকারীতে কোন প্রকার সংঘর্ষ ছিল না। জমীদারগণ সন্তান বাৎসল্যে প্রজাকুলকে নিরীক্ষণ করিতেন, সর্ব্বদা তাহাদের হিত চিন্তা করিতেন, প্রজাবর্গও ভূস্বামীকেই পিতৃপুরুষের একমাত্র প্রতিভূজ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেন। সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার প্রথা এদেশে নূতন নহে! এই সংঘবদ্ধ হওয়ার ফলেই প্রজাকুল স্বেচ্ছায় তাহাদের গ্রাম্য দেবতার অর্চ্চনা ও জনহিতকর যাবতীয় কার্য্যের ভার নিঃশঙ্ক চিত্তে জমীদারের হাতে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে চাষ আবাদের কার্য্যে নিজদের মূল্যবান সময় নিয়োগ করিতেন। এই সব কার্য্যের ব্যয়ভার কখনই জমীদারকে বহন করিতে হইত না। গত বৎসর যে ব্যয় হইয়াছে অথচ খরচায় কুলায় নাই, যাহা জমীদারকে হাওলাত স্বরূপ দিতে হইয়াছে, তৎসহ বর্ত্তমান বর্ষের এই প্রকার কার্য্যাদি জন্য যে ব্যয় হওয়া সম্ভব, তাহার আনুমানিক হিসাব প্রত্যেক গ্রামের প্রধান প্রধান প্রজাবর্গ এক সঙ্গে বৈঠক করিয়া ধার্য্য করতঃ, প্রতি টাকা খাজনা মুখে আদায়ের ব্যবস্থা পূর্ব্বক খরচার ফর্দ্দে দস্তখত করিয়া জমীদারের উপর খাজনা সঙ্গে এ টাকা আদায় কার্য্য নির্ব্বাহের ভার অর্পণ করিতেন। এই টাকা জমীদার সেরেস্তা দ্বারা বিনা খরচে আদায় হইয়া দীঘি পুষ্করিণী আদি খনন, দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় ইত্যাদি সদনুষ্ঠানের কার্য্য সম্পন্ন হইত। আর হইতই বা বলি কেন,—যে সব স্থানে এখনও প্রজা ভূম্যধিকারীতে সৌহার্দ্দটুকু বজায় আছে, সেখানে এখনও চলিতেছে। কিন্তু ফলভোগী চিরকালই প্রজাবর্গ—যাহাদের অর্থ। খরচার এই টাকা আদায়ই আবুয়াব নামে অভিহিত। এখানে বলা প্রয়োজন, এই খরচার ফর্দ্দে জমীদারের স্বার্থ একরূপ কিছুই থাকিত না; থাকিলেও দু এক টাকা নজর মাত্র। আদালতের আরদালী চাপরাশীর পৌরবী মত জমীদার সেরেস্তার পাইক কোতোয়ালের পৌরবী ঘর ঘর ভিক্ষায় আদায় হইলে অনেক বেশী আদায় হয় বলিয়া দুই চার টাকা খরচায় ভঙ্গন কোন কোন স্থানে হইতে দেখা যায়। এ টাকা আদায় হয় সমস্ত বৎসর ধরিয়া প্রজাদের সুবিধা মত। কিন্তু তাহা বলিয়া বসিয়া থাকিলেও কাজ চলে না। তাই জমীদার সংগৃহীত অর্থের সঙ্গে নিজ কোষের অর্থ মিলাইয়া নির্দ্ধারণানুযায়ী কার্য্য সমাধা করিয়া ক্রমে ব্যয়িত সমুদায় টাকা আদায় করিয়া লইতে চেষ্টা করেন। তাহা সমস্ত আদায় হইতে অনেক সময় চার বৎসরও যায়। আবার যে সব স্থানে খাজনা আদালতের আশ্রয় ব্যতীত আদায় হওয়া অসম্ভব, সে সব ক্ষেত্রে জমীদারকে ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হয়।

১৮৮৫ সনের খাজনা আইন প্রবর্ত্তনের সঙ্গেই প্রজা ও ভূম্যধিকারীর প্রীতির সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন বিশেষ ভাবে সুরু হইয়াছে। তাই বলিয়া খাজনা আইন প্রবর্ত্তন করিয়া প্রজাদিগকে জমীতে কিছু স্বত্ব-স্বামিত্ব দেওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়ান একালে অর্ব্বাচীনতা। গবর্ণমেণ্ট সামঞ্জস্যের দিকে নজর রাখিয়া চিরন্তন divide and rule policyতে একটুকু কম হাঁটিলেই আর দেশের এ দুর্গতি দেখিতে হয় না। এই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী লোকদের ক্রমে চক্ষু ফুটিল। তাঁহারা দেখিলেন, জমীর খাজনা অল্প, অথচ বৎসরব্যাপী উৎপন্ন শস্যের মূল্য অনেক অধিক;

এবং তাঁহাদের অবলম্বনীয় ব্যবসা হইতে লাভও ইহাতে অত্যধিক। তদুপরি স্থায়ী ভাবে পুরুষানুক্রমে একটী সম্পত্তি অর্জ্জিত হয়। তাই যাহার উপার্জ্জন যত বেশী, তাহার ছলে বলে কৌশলে নিরক্ষর কৃষক-কূলকে প্রলুব্ধ করিয়া জমী আত্মসাৎ করিবার প্রয়াস বাড়িয়া চলিল তত বেশী। কৃষকের লক্ষ্মী এই সময় হইতেই উচ্চস্তরের লোকের অঙ্কগতা হইতে চলিল। বর্ত্তমানে এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, কৃষক জোতদার আর বড় নাই—সমুদায়ই উচ্চস্তরের লোকের ভৃত্য বা আধিয়ারে পরিণত। এখন প্রত্যেক গ্রাম অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় একচতুর্থাংশ জমীও প্রকৃত কৃষকের দখলে পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। সুতরাং শুধু জমীদারই এখন দেশত্যাগী নন, প্রধান প্রধান জোতদারগণও নিজ নিজ কার্য্য ব্যপদেশে বিদেশবাসী। ইহাই গ্রামের অবনতির এখন একটী মুখ্য হেতু। নূতন জোতদার দেখিতে-ছেন, তাঁহারা নিজেরা গ্রামে বাস করেন না, গ্রামের জলকষ্টে তাঁহাদের কণ্ঠ শুষ্ক হয় না। বিদ্যালয়ের অভাবেও ছেলেপিলে মূর্খ হয় না, চিকিৎসালয়ের অভাবে রোগযন্ত্রণায় চিকিৎসার অভাবে কালের করাল কবলে পতিত হইতে হয় না। বরং এই সব গ্রাম্য লোক একটু নিরক্ষর, একটু নির্ব্বোধ, একটু দুর্ব্বল থাকিলেই জোতদারী ও মহাজনী ব্যবসাতে দুস্থের অর্থে ফাঁপিয়া উঠা সহজ। তাই তাহারা জনহিতকর সৎকার্য্যের জন্য খরচার দেয় অর্থ ব্যয় হইতে নিজেরা ত বিরত হইলেনই, অন্যান্য প্রজাদিগকেও তদনুরূপ মতিতে প্রবুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সরলপ্রাণ প্রজারা দেখিল অর্থ দিতে যে নিষেধ করে সেই প্রকৃত বন্ধু। তাই তাহারাও অর্থ দেওয়ার বিরুদ্ধে মুখ খুলিল। এ দিকে চিরন্তন প্রথানুসারে পর বৎসর আদায়ের ভরসায় জমীদার যে অর্থ ঘর হইতে খরচায় দিয়াছেন, তাহা ঘরে ফিরিয়া আসিতে বিঘ্ন ঘটিল। এইরূপে তাঁহারও অর্থকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইল। তিনি আর অর্থ দিতে সঙ্কুচিত হইলেন; প্রজা ও ভূম্যধিকারীতে পরস্পরে অবিশ্বাসের ছায়াপাতের সুরু হইল এই সব নূতন জোতদারের কূটবুদ্ধির ফলে। অনেক ক্ষেত্রে বৎসরের খাজনা বৎসরে পরিশোধ করিতে অবস্থাপন্ন জোতদারগণই পশ্চাৎপদ হইলেন। চতুর্থ বৎসরের শেষে তমাদীর সময় দিলেই যখন ভূম্যধিকারী অনেক সময়ই অর্থাভাব বশতঃ বিনা সুদেও মোটা অঙ্ক দেখিলে লইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন, তখন ঘরের অর্থ কেন পরের ঘরে দিয়া রাখিবে। ইহাতে অবশ্য আবার অনেক জোতদারই ক্ষতিগ্রস্তও না হন এমন নয়। বৎসরে ১০০৲ দেওয়া যেমন সহজ, চতুর্থ বৎসরে ৪০০৲ এক সঙ্গে দেওয়া সকলের পক্ষেই অবশ্য তেমন সহজ নয়। কাহারও কাহারও সময় সময় মহাজনের পায়ে পড়িয়া শতকরা ৮।১০৲ গদি সেলামী দিয়া ১২॥০ মাসিক শতকরা সুদেও টাকা ঋণ করিয়া খাজনার টাকা পরিশোধ করিয়া শেষে গ্রাসাচ্ছাদনের জোতটুক সেই রাঙ্গাচরণে ডালি দিয়া শুষ্ক মুখে ঘরে ফিরিয়া খাজনা না দেওয়ার পরিণাম চিন্তা করিতে হয়। ২০ বৎসর পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে, বড় বড় জোতদারগণ রাজার খাজনা অপরিশোধিত রাখা অত্যন্ত গর্হিত ও অসম্মানজনক মনে করিতেন। আজকাল আর প্রজাও ভূম্যধিকারীর মধ্যে সে সৌহার্দ্দের দিন নাই। কিস্তির দিন রেভিনিউ দাখিল না হইলে পর দিন জমীদারের জমিদারী নিলামের ব্যবস্থা। কিন্তু কিস্তি ত পরের কথা, বৎসরের পরও বড় জোতগুলির খাজনা আদায়ের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থার অভাবেই আজ জমীদারশ্রেণী এত বিব্রত। প্রজায় এখন জমীদারের সে দুঃখ বুঝিতে অক্ষম। সে তাহার টাকা পাটে খাটায়, লাভ করে। আর ভূম্যধিকারী পৈত্রিক জীর্ণ পাকা বাড়ীতে ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তৈয়ারী খেরুয়ার বনিয়াদি আস্তরণযুক্ত তাকিয়ায় ঠেস দিয়া হ্যাণ্ডনোটে দস্তখত করেন। এই সব ব্যবহারে মোকদ্দমায় অশান্তির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেশময় ব্যাপ্ত হইতেছে; পুড়িয়া মরিতেছেন জোতদার ও ভূম্যধিকারী উভয় শ্রেণী। মজা লুটিতেছেন চিরদিন ইন্দ্রের শচী সেই ব্যবহারাজীব, যাহাদের কোমল করস্পর্শ ব্যতীত প্রজা, ভূম্যধিকারী নির্ব্বিশেষে কাহারই মোকদ্দমা রাজদ্বারে পেস হয় না। আর ফাঁপিয়া উঠিতেছেন মহাজনশ্রেণী, যাঁহাদের ঘরে উভয়ের লক্ষ্মী চিরতরে গচ্ছিতা। এই উভয় শ্রেণী আবার সততই জমীদারের সম্পত্তিটুক বা জোতদারের জোতটুক যখন যেমন সুযোগ উপস্থিত হয়, আত্মসাৎ করিয়া লইতে সর্ব্বদাই কুক্কুর মার্জ্জারবৎ উপবিষ্ট। ১৮৮৫ সনের খাজনা আইন প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে চার বৎসর একাদিক্রমে খাজনা না দিলে উচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল; আইন লঙ্ঘন জনিত দণ্ড আর কয়জনকে ভোগ করিতে হইত। কিন্তু প্রজার মনে ভয় ছিল,—খাজনাটা প্রতি বৎসরই অবশ্য দেয় বলিয়া তাহাদের ধারণা থাকাতে, জমীদারের সংসার একরূপে চলিয়া যাইত। খাজনাটা যাহাতে রীতিমত আদায় হয় সেই ব্যবস্থাটিও কি বিধিবদ্ধ হওয়া ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ অসঙ্গত?

এখন অনেক প্রজাহিতৈষীর মুখেই শুনা যাইতেছে, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী, জমীদারের হস্তে প্রজাকুল চিরনির্জ্জিত। বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় যে সমুদায় লোকের সহিত গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্ত হয়, তাহারা সত্যই জমীদারের মত উচ্চ পদবীর লোকই ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা অত্যাচার উৎপাত বড় অসম্ভবও ছিল না; কারণ তখন বৈকুণ্ঠ-ভীতি না থাকিলেও আতঙ্কটুকু চিত্ত হইতে নড়ে নাই। বিশেষ দেবীসিংহ ও হেষ্টিংসের শক্ত শাসনই তখনও আদর্শ। বর্ত্তমানে অনেক জমীদারেরই বংশের প্রসার বশতঃ এবং অনেকেই বিলাসিতার কোলে গা ঢালিয়া দেওয়ায়, এবং স্বার্থান্বেষী জমীদারবিদ্বেষী একশ্রেণীর তথাকথিত প্রজাহিতৈষী লোকের অবির্ভাবে জমীদারের ঘরে অনাদায় অশান্তি লাগিয়া থাকায়, জমীদারদের অবস্থার বিশেষ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে; আজ যদি বঙ্গের সমুদায় জমীদারের আয়ের একটা তালিকা সংগৃহীত হয়, তবে আমার মনে হয় দশ হাজার টাকা ও তদূর্দ্ধ আয়ের ভূম্যধিকারীর সংখ্যা সমগ্র বঙ্গে চারিশতও হইবে কি না সন্দেহ। দশ বিশ হাজার টাকা বাৎসরিক আয়ের মূল্য একালে কতটুকু, তাহা বোধ হয় অনেকেরই অবিদিত নাই। জমীদারের চাল ও দশ দিক বজায় রাখিয়া পরিবার প্রতিপালন ও ছেলে মেয়েদের আধুনিক শিক্ষা প্রদান এবং কন্যাদিগকে সৎপাত্রে অর্পণের ব্যয়-বাহুল্য—একটী একটী

করিয়া সমষ্টি করিতে থাকিলে কিছু ত থাকেই না, বরং বৎসরের পর বৎসর ঋণের মাত্রাই বাড়িয়া চলে। প্রকৃত কৃষক প্রজারও অবস্থা ততোধিক। সে মাঠে ধান মাড়াই করিয়া দেড়া দ্বিগুণ সুদে ধান দ্বারাই মহাজনের দেনা পরিশোধ করিয়া শুধু খড়কগাছি মস্তকে বহিয়া বাড়ী পৌঁছায় এবং তখন হইতেই আবার উদরান্নের ধানের জন্য তীর্থকাক-বৎ মহাজনের দ্বারস্থ হয়। সুতরাং ভূম্যধিকারী ও প্রকৃত কৃষক প্রজা উভয় শ্রেণীই সমভাবে বিব্রত। সমুদায় প্রজাকুল যে উপরিউক্ত অবস্থায় জমীদার শ্রেণীর হস্তে কিরূপ নির্জ্জীত তাহা ইহা হইতে সহজেই অনুমেয়। ইহা একটা কথার কথা, দশের চক্ষে জমীদারকে হীন করিবার জন্য জমীদারবিদ্বেষীদের প্রয়াসে ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়া গণ্য। যে নিজে শক্তিহীন তাহার কি অপরের উপর জুলুম করা সম্ভবে? বরং প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, কৃষক প্রজাকুল এবং নিরন্ন ভূম্যধিকারী শ্রেণী অনেক শ্রীমান্ ব্যবহারাজীবী ও মহাজন প্রজার হস্তে সর্ব্বদা নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত। তাই বলিয়া বাঙ্গলা দেশে খুব বড় জমীদারও যে ২।১ জন না আছেন, এমন নয়। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই অঋণী, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ব্যয় বাহুল্যও তাঁহাদের অত্যধিক। এইসব কারণে ঋণও এত ইহাদের বাড়িয়া গিয়াছে যে, মান বাঁচাইয়া চলাও দায়। ইঁহাদের কাহারও কাহারও দ্বারা হয় ত কার্য্যব্যপদেশে সময় সময় এক আধটুক জুলুম যে হয় না, এ কথা বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হয়। ইহাদের অর্থশক্তি কথঞ্চিৎ আছে, তাই দুর্ব্বলের মত সহিয়া থাকার প্রবৃত্তি ইহাদের কম। তা' শক্তিশালী হইতে এ জগতে নির্য্যাতন না সহে কে? জার্ম্মাণীর মত শক্তিশালী জাতি—যাহার ভয়ে সেদিনও সমস্ত য়ুরোপীয় জাতি পশ্চাতে লাঙ্গুল গুটাইতেন, আজ অবস্থার বিপর্য্যয়ে সেই জাতি ফরাসীর নিকট কত না লাঞ্ছিত।

কোন বনে একটী নধরদেহ মেষ শাবক বাহির হইবামাত্র ব্যাঘ্র বলিলেন আজ সুপ্রভাত। সিংহ তাঁহার ভাষায় কানন বিকম্পিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, বনে পশুর রাজা আমি—এমন সুন্দর জিনিষটীতে দাবী আমার সর্ব্বোপরি। শৃগাল মৃদুস্বরে বলিলেন, আমার কত দিনের অনাহার—এটিকে দয়া করে আমাকে দিন। ছাগশিশুটী দৌড়াইয়া লোকালয়ে প্রবেশ করিল এবং ভাবিল মানুষ ত আর হিংস্র জন্তু নহ, ইহাদের মুখে মুখে সহৃদয়তার বক্তৃতাও কত শুনা যায়। বাড়ীর কর্ত্তা দেখা মাত্র বলিয়া উঠিলেন, মায়ের কৃপায় যদৃচ্ছয়াচোপপন্নং—মায়ের প্রীত্যর্থে ইহাকে বন্ধন কর। শিশুটী প্রমাদ গণিল। সে অনন্যোপায় হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মাবস্থা সমুদায় নিবেদন করিল। ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন, বাপু, তোমার যে নধর দেহ,—তোমাকে দর্শন মাত্রে আমারই রসনা জলসিক্ত হইতেছে; অন্যকে আর কি বলিব। যে দুর্ব্বল, তাহার সর্ব্বত্রই এই দশা। ইহাতে প্রজা-ভূম্যধিকারী ভেদ নাই। স্থল ভেদে ভূম্যধিকারী প্রজার হস্তে নিগৃহীত। আবার অবস্থা বিশেষে প্রজাও ভূম্যধিকারীর হস্তে লাঞ্ছিত। কোন দৃষ্টান্তেরই অভাব নাই।

বর্ত্তমানে খাজনা আইনখানির খসড়া কিন্তু বঙ্কিমবাবুর স্বর্ণ গোলকের মতই দেশ মধ্যে পতিত হইয়াছে। ইহা যাহার চক্ষে পড়ি-তেছে, তিনিই গেল গেল রবে কপালে করাঘাত করিতেছেন। জমীদার ভাবিতেছেন, তাঁহার সব গেল। জোতদারের ধারণা, তাহাকে দেওয়ার নামে দুধের সরখানি তুলিয়া অন্যকে দেওয়া হইতেছে। কোর্ফাদার ও আধিয়ার ভাবিতেছেন, আমরা চিরদুর্ব্বল, আমাদের মৃদু রোদন-ধ্বনি আমাদের প্রবল প্রতাপান্বিত সুশিক্ষিত জোতদার মুনিবের সিংহনাদের নিকট ম্লান হইয়া যাইতেছে। প্রজা ও ভূম্যধিকারী সকলেই স্ব স্ব স্বার্থ সংরক্ষণ জন্য সংঘবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সভাসমিতি করিতেছেন। জমীদারের সভায় জোতদারের প্রবেশাধিকার নাই; জোতদারের সভায়ও জমীদারের স্থান নাই। যেন ইহারা একদেশবাসী নন; একের হিতাহিতে সুখে দুঃখে অপরের কিছুই যায় আসে না। জমীদার তাঁহার একটুও প্রজাকে দিতে রাজি নন, প্রজাও জমীদারের সর্ব্ব স্বত্ব কাড়িয়া লইতে উদ্গত প্রাণ। দেশময় প্রীতির ঘণ্টা ত অহোরাত্র কত বাজিতেছে! এমন কি কেহ দেশে এখনও জন্মেন নাই, যিনি উভয় শ্রেণীকে ভগ-বানের নাম লইয়া এক মহামিলনের ক্ষেত্রে টানিয়া আনিতে সমর্থ? হিন্দু মুসলমানে প্রতিকার্য্যে এত নিত্য বৈষম্য ও এত দাঙ্গা হাঙ্গামা সত্ত্বেও যদি মিলন সম্ভবপর বলিয়া তাহার চেষ্টা হয়, তবে এ মিলনের আশা কি তদপেক্ষাও সুদূরপরাহত? আর এই মিলন সংঘটিত হইলে দেশ উন্নতির পথে দ্রুত ধাবিত হওয়ার পক্ষে যে কত সুগম হয়, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার কি কেহ নাই? খাজনা আইনে এই right of transferability ত যত গোলের গোড়া। ইহারই পরিবর্ত্তন জন্যই ত প্রজা পক্ষ রাজদ্বারে প্রধানতঃ উপস্থিত। তাহার ফলেই ত আইনখানির আমূল পরিবর্ত্তনের চেষ্টা। বর্ত্তমানে ইহা গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে মীমাংসা করিয়া দিতে প্রস্তুত এবং যাহা উভয় পক্ষ নতশিরে মানিয়া লইতেছেন, এ মীমাংসা কি উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ চিত্ত সরল করিয়া মিলিলে একেবারে অসম্ভব ছিল? অহরহঃ পৃথিবীতে চারিদিকে যে সমস্ত ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে, তাহা কি বঙ্গের শিক্ষিত প্রজা ও ভূম্যধিকারী সমাজে নিষ্ফল লোষ্ট্রবৎ গৃহীত?

এখন জমীদার ভাবিতেছেন, আমরা পুরুষানুক্রমে শুধু রাজ-ভক্ত নই, ব্যুরোক্রেসীরও ভক্ত; তাঁহাদের সর্ব্ব কার্য্যে আমরা সহায়। রৌলাট বিল পর্য্যন্ত আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া আইন করিয়া দিয়াছি। আমাদিগকে গবর্ণমেণ্ট কখনও বেহাত করিতে পারিবেন না—নূতন আইনে আমাদের জিত সুনিশ্চিত। জোতদার ভাবিতেছেন, দেশময় আমরা মিলিলে জমীদার ত অল্প কথা, গবর্ণমেণ্টকেও এক হাত দেখাইতে পারি। সেই আতঙ্কেই ত ১৮৮৫ সালের খাজনা আইনের প্রবর্ত্তন। এবারে ভূম্যধিকারীর সকল স্বত্ব আমরা কাড়িয়া লইয়া জমীদারকে দাঁড়ে বসাইব; গবর্ণমেণ্ট কখনই আমাদের বিরুদ্ধে যাইতে সমর্থ হইবেন না। উভয়ের এই ভাবটুকুই মিলনের পরিপন্থী। উভয় শ্রেণীর চিত্ত সরল না হইলে, একের প্রতি অন্যের আত্মীয় ভাব না জাগিলে, কোন ক্ষেত্রেই মিলন সংঘটন হয় না—এ ক্ষেত্রেও হইবে না। গবর্ণমেণ্ট বেশ্ কনের মাসী ও বরের পিসি সাজিয়া বসিয়া আছেন।

কারণ উভয় পক্ষেরই ভার তাঁহাদের উপরে। এই সুযোগে তোলাইয়া সমান করিয়া দিতে বসিয়া দাঁড়ির যে দিকে ভারী সে দিক হইতেই নিজের কিছু রাখিতে প্রয়াস পাইতেছেন। অর্থাৎ প্রতিপদে প্রজা, ভূম্যধিকারী ও অধস্তন প্রজার সংঘবর্দ্ধনের মামলা মোকদ্দমার দ্বারা মীমাংসার ব্যবস্থা করিতেছেন। দুস্থ দেশের রক্তবিন্দু সম অর্থ এই ভাবে অযথা মামলা মোকদ্দমায় ব্যয়িত হইলে, রাজকোষ কাণায় কাণায় ভর্ত্তি হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের সুখ শান্তি চিরতরে তিরোহিত হইবে, আদালতের প্রাঙ্গণের বটতলা লোকের স্থায়ী বাসস্থান হইবে। বিদ্বেষ বহ্নি সহস্র শিখায় প্রজ্জ্বলিত হইবে। যাহা কিছু একতা—সব ভাঙ্গিয়া যাইবে; হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা স্বরাজ ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে। বিদেশী মালের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে। ব্যুরোক্রেসীর রাজত্ব আরও শতাধিক বর্ষ নির্ব্বিবাদে চলিবে। তাই বলিতেছি, প্রজা ভূম্যধিকারী এখনও সম্মিলিত হও। তোমাদের একতায় কি মহাশক্তি নিহিত আছে, জগৎ দেখিয়া স্তম্ভিত হউক। *

আফ্রিকান কয়লা ও বোম্বে বাজার

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জ্যৈষ্ঠের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার গুপ্ত লিখিত 'আফ্রিকান কয়লা ও বোম্বে বাজার' নামে একটী প্রবন্ধ পড়িলাম। শ্রীযুক্ত গুপ্ত তাঁহার প্রবন্ধটী পাঠক পাঠিকাদের সম্মুখে এমন ভাবে ধরিয়াছেন, যাহাতে প্রথম হইতেই লক্ষ্য পড়ে একটা জিনিষের উপর;—তাহা তাঁহার কয়লা-খনির মালিকগণের প্রতি একটা অহেতুক বিদ্বেষ। ইহার কারণ কি বলিতে পারি না। প্রবন্ধ লেখক পাঠক-পাঠিকাগণকে কতকগুলি ভুল খবর দিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি কয়লার খনির মালিকগণকে অত্যধিক লোভী বলিয়াছেন। তিনি যে লিখিয়াছেন, যুদ্ধের সময় কয়লার বাজার "ধাপে ধাপে লাফে লাফে উঠিয়াছে" তাহা সত্য নহে। যুদ্ধ শেষ হয় ১৯১৮ সালে। কয়লার বাজার ঐ সময়, এমন কি, ১৯১৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত কিছুই উঠে নাই। ১৯২০-২১ সালে কিছুদিন বাজার চড়িয়াছিল বটে, কিন্তু চার টাকার কয়লা ত্রিশ টাকায় বিক্রীত হওয়ার খবর ভুল। তা' ছাড়া, খরচ চার টাকার অনেক বেশী; এবং ত্রিশটাকা দরে সমস্ত উৎপন্ন কয়লার এক শত ভাগের এক ভাগ বিক্রয় হইয়াছে কি না সন্দেহ। এ বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাদের একটু বিশদ ভাবে বুঝাইতে হইবে। অন্যান্য অনেক ব্যবসার দর যেমন উঠা নামা করে, demand এবং slumpএর উপর, কয়লার—তাহা ছাড়াও একটী প্রধান factor আছে,—তাহা বহনের উপায়। সাধারণতঃ দেখা যায়, এই বহনের বা wagon supplyএর উপরই বাজার নামা-উঠা করে। গত কয়েক মাস কয়লার দাম ২।৷ টাকা উঠিয়াছিল, wagon supply কম হওয়ার জন্য। এখন গাড়ী বেশী পাওয়া যাইতেছে, বাজারে কয়লার দামও অসম্ভব রকম পড়িয়া গিয়াছে; কারণ, consumerদের যাহা দরকার ছিল, লইয়াছে; এখন দরকার ফুরাইয়া গিয়াছে। ঐ wagon supply যদি শুধু রেলওয়ের হাতেই থাকিত, তবেও কথা ছিল। সরকার আবার Coal Transportation office নামে একটী দপ্তর রাখিয়াছেন এই wagon supply control করিবার জন্য, যাহাতে "available wagon গুলি in a fair and equitable way" দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। তাহাদিগকে দিয়া যে wagon বাকী থাকিবে, সেগুলি কলিয়ারীর উৎপন্ন ও ষ্টক অনুসারে Public supply নামে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। Coal transportation officeকে এই অব্যাহত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, যে কোন মিল ফ্যাক্টরী প্রভৃতিকে তিনি ইচ্ছামত Preferential supply of wagons দিতে পারিবেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা দিবেন না। ফলে যে consumer তাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভে সমর্থ হন এবং Special wagon supplyএর claim পান, তিনি খনির মালিককে এই লোভ দেখান যে, "Public accountএ গাড়ী কবে পাইবে, ঠিক নাই। আপাততঃ যদি তোমার কয়লার ঝটিতী বিক্রয়ের ইচ্ছা রাখ, তবে ২।৪ টাকা কম দরে আমাকে দাও।" ভারতীয় সমস্ত রেল, গভর্ণমেণ্টের যা কিছু establishment, মিউনিসিপালিটী, প্রভৃতি ইহারা ত পায়ই। অনেক ক্ষেত্রে খনির মালিকদিগকে এমনও করিতে হয় যে, পড়তা অপেক্ষাও কম দরে যাহাদের Special supply of wagons আছে তাহাদিগকে দিয়া, লোকসানটা Public supplyএর গাড়ীর উপর তুলিয়া লইতে হয়। গভর্ণমেণ্ট, রেল, মিউনিসিপালিটী প্রভৃতিকে কয়লার গাড়ী দিয়া তাহার পরও অনেক consumerকে Preferential supply of wagons দিয়া Public accountএ গাড়ী খুব কমই দেওয়া হয়। তাহার উপর তখন wagon scarcity ছিল ভয়ানক, তাই যে সময়ে বাজার দর ত্রিশ টাকা উঠিয়াছিল, তখনও কয়লার খনির মালিকগণ অসম্ভব লাভ কিছুই করেন নাই; কেন না, ত্রিশ টাকা দরে কয়লা বিক্রয় করিবার গাড়ী খুব কমই মিলিয়াছিল।

হইতে পারে, চড়া বাজারের সময় কয়েকজন খনির মালিক এবং কয়েকজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র intermediate company অমন ভাবে ব্যবসা চালাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই কারণে খনির মালিক মাত্রেরই উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করা এবং একটী বহুজনপাঠ্য মাসিকের পাতায় তাঁহাদের এত ছোট করিয়া তোলা লেখকের উচিত হয় নাই। আমার ত অনেক বম্বের খরিদ্দারের সহিত পরিচয় আছে। খনির মালিকদের উপর প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের আছে, এ কথাও কাহারও মুখে শুনি নাই। লেখকের ইহা অনুমান মাত্র।

---

* এই প্রবন্ধটী একজন জমীদারের লিখিত। তাঁহাদের সপক্ষে কি বলিবার আছে, তাহাই কথঞ্চিৎ দেখাইবার জন্য এই প্রবন্ধটী আমরা পত্রস্থ করিলাম; অপর পক্ষের কথাও সাদরে গৃহীত হইবে।

Technical Quality হিসাবে বাঙ্গালার কয়লা হয় ত বিদেশী কয়লা অপেক্ষা খারাপ। জিনিষ ভাল এবং সস্তা বলিয়া ত বিদেশী অনেক জিনিষই কেনা চলে। আমাদের দেশের সমস্ত industryই এখন নূতন এবং প্রতিযোগিতায় বিদেশী industryর কাছে সকলকেই পরাভব স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অর্থনীতির মূল প্রচেষ্টার অনুকূলে যে দেশীয় জিনিষ ব্যবহারের স্থলে বিদেশী জিনিষের ব্যবহার—একথা কোন economistই বলিবে না। আর এক কথা—আফ্রিকার কয়লা যে বম্বেতে দেশের কয়লার সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, ঐ কয়লা bounty-fed। আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট রেল ভাড়া ও জাহাজ ভাড়া যথেষ্ট পরিমাণে কমাইয়াও তাহার উপর ঐ কয়লার বম্বেতে বাজার পাইবার প্রয়াসে bounty দেন। বিদেশে কয়লা রপ্তানি করিয়া স্বদেশের ব্যবসায়ের foreign market পাইবার জন্য আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট কিরূপ সাহায্য করিতেছেন, দেখুন! আর আমাদের গভর্ণমেণ্ট কি করিতেছেন, না[illegible]র উপকরণ যোগাইবার জন্য কয়লার যথেষ্ট যোগাড় রাখিবার জন্য দেশীয় কয়লার foreign market নষ্ট করিয়া দিলেন shipmentএর উপর embargo বসাইয়া; এবং এখন দেশের বাজারও নষ্ট হয় দেখিয়াও গভর্ণমেণ্ট প্রতীকার করিবেন না। ভারতীয় কয়লা সত্য Protectionএর উপযোগী কি না, তাহাও গভমেণ্ট সন্দেহ করেন। আসলে কিন্তু বাংলার কয়লা Protection চায় না, যদি গভর্ণমেণ্ট রেলের মাশুল ন্যায় সঙ্গত ভাবে কমাইয়া দেন এবং রেলে কয়লা বহনে যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দেন। যদি bounty দিতে গভর্ণমেণ্ট অসমর্থ হন এবং যদি countervailing duty বসাইলে Colonial Government চটিয়া লাল হন, তবে রেলে অথবা অন্য উপায়ে কয়লা বহনের সুবিধা করিয়া দিন। ইহা কি সত্যসত্যই আশ্চর্য্যের কথা নয় কি, যুদ্ধের পরেও Natal হইতে কয়লা আসিয়া বম্বের বাজারে বাংলার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে?

Conservative বা Liberal যে কোন দিক দিয়াই লেখক দেখুন না কেন, দেশে অবাধ বাণিজ্যের প্রসারে ভারতের অকল্যাণ ছাড়া কল্যাণ হয় নাই। এই সময় যদি ভারত সরকার Protective Policy ধরিয়া কাজ করিতেন, তবে National Economyর দিকে অনেক লাভ হইত। দেশের industryগুলিকে সাহায্য করিয়া উন্নতি করিতে দিন, তাহার পর যখন সেগুলি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার যোগ্য হইবে, তখন Liberal Policy গ্রহণ করিয়া অবাধ বাণিজ্যের প্রসার করুন। ভারত সরকার যদি আসলে ভারতেরই সরকার হইতেন, তবেই ইহা করা সম্ভব হইত। আইন গড়িবার সময় যাহাকে বিদেশস্থ white colonist এবং ইংল্যাণ্ডের প্রভুদের মন বুঝিয়া কাজ করিতে হয়, তাহাদের কাছে ইহা প্রত্যাশা করাই ভুল। তবে দুঃখ হয়, এ বিষয়ে দেশের দু'একজন লোকেরও মতভেদ আছে। ব্যবস্থাপক সভায় অধিকাংশ সভ্যেরাই যে বিষয়ে ভোট দিয়াছেন, এমন কি বোম্বের সমস্ত দেশীয় মিলের মালিকগণও যাহাতে ভোট দিয়াছেন, সে বিষয়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা লেখকের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের বা দেশপ্রেমিকতার নয়।

স্বপ্নাবস্থার সহিত জাগ্রত অবস্থার সম্বন্ধ

অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

আমাদের প্রাচীনেরা মানুষের জীবনের তিনটী অবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। সুষুপ্তি বা স্বপ্নহীন গাঢ়নিদ্রার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। জাগ্রত হইয়া কোন স্বপ্ন দেখিয়াছি কি না স্মরণ হইল না; সুতরাং কোন স্বপ্ন দর্শন হয় নাই, এমন কোন যুক্তি প্রয়োগ করা চলে না। আমরা জাগ্রত থাকিয়াই কত দেখিতেছি, কত শুনিতেছি। সকল কথা কি স্মরণ থাকে? স্বপ্নাবস্থার সহিত জাগ্রত অবস্থার এত পার্থক্য, এত ব্যবধান যে, স্বপ্নের অনেক ঘটনা জাগরণের পর স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। অতএব স্বপ্নহীন নিদ্রার অস্তিত্ব প্রমাণ করা কঠিন। * পক্ষান্তরে নিদ্রা সর্ব্বদাই স্বপ্নময়, এ কথারও অকাট্য প্রমাণ দেওয়া যায় না। তথাপি এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কয়েকটী কথা বলা যাইতে পারে।

অতএব বোধ হয় নিদ্রিতাবস্থায় অবিরাম স্বপ্ন-দর্শন ঘটিয়া থাকে। শরীরতত্ত্বের অনুশীলনে অবগত হওয় যায় যে, নিদ্রায়ও মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে না। অতএব তাহার অনুষঙ্গী মানসিক ব্যাপারেরও বোধ হয় একান্ত বিরাম হয় না। †

স্বপ্ন ও সুষুপ্তির পার্থক্য যতই হউক, স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে যে একটা পরিষ্কার ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বরং এই ব্যবধান অতিরিক্ত হইয়া থাকে। হওয়াও স্বাভাবিক। স্বপ্ন কত নিরন্ন পর্ণকুটীরবাসীর মস্তকে স্বর্ণমুকুট তুলিয়া দেয়, কত রাজ্যেশ্বরকে পথের ভিখারী করে! মানুষকে কত সাগরে ভাসায়, কত আকাশে উড়ায়! কত দৈত্যদানব পরী রাক্ষসের সহিত সাক্ষাৎ করায়! স্বপ্ন ইন্দ্রজালের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব বিষয়কেও সম্ভব করিয়া তুলে। স্বপ্নের উচ্ছৃঙ্খল দৃশ্য সমূহ তাহাদের উদ্দাম নৃত্য দ্বারা বাস্তব-জগৎকে কতই ব্যঙ্গ করিয়া থাকে। স্বপ্ন ক্ষণকালের জন্য মানুষকে বৃথা হাসাইয়া বৃথা কাঁদাইয়া জাগরণের মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া যায়! বাস্তবজগতের প্রখর আলোকে আর আত্মরক্ষা করিতে পারে না।

---

* "We are conscious in some measure in the deepest sleep." H. R. Marshall's article on "Retentiveness & Dream", Mind, N. S., Vol. XXV, No 98, p 211.

† "Central activity however diminished during sleep, always retains a minimum degree of intensity." Sally's Illusions, p. 134.

বাস্তবের সহিত যাহার এত বিরোধ, তাহাতে অলৌকিকতার আরোপ করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই কেহ কেহ স্বপ্নের মধ্যে সর্ব্বদাই গূঢ় আধ্যাত্মিক ও অতিপ্রাকৃত কোন অর্থ দেখিতে পান। পক্ষান্তরে কেহ কেহ স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তামাত্র—এই মতও পোষণ করিয়া থাকেন।

আমরা এ স্থলে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, সাধারণ স্বপ্ন অতিপ্রাকৃতও নহে, নিতান্ত অমূলকও নহে। জাগরণকালীন দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যেমন একটা মূল আছে, স্বপ্নেরও তেমন একটা ভিত্তি আছে। আর সাধারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য যেমন অলৌকিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না, সাধারণ স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্যও তেমন অলৌকিকতার আশ্রয় লইতে হয় না। অবশ্যই এ কথা অস্বীকার করা যাইতে পারে না যে, বিশেষ বিশেষ দু' একটী স্বপ্নের একটা অলৌকিক অর্থ আছে,—হয় ত তাহাতে মানুষের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি খুলিয়া যায়, দূরস্থিত ঘটনা গোচরে আসে এবং অতীন্দ্রিয় দর্শনের ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু এরূপ স্বপ্ন বিরল। আমরা এই প্রবন্ধে বাহুল্য ভয়ে স্বপ্নের এই দিকটা আলোচনা করিব না। এই সকল স্বপ্ন বাদ দিয়া সাধারণ স্বপ্ন সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, স্বপ্নের মূলে কোন গূঢ় রহস্য নাই। জাগিয়া চক্ষু-কর্ণের সাহায্যে আমরা যে প্রণালীতে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, স্বপ্নেও সেই প্রণালী অনুসারেই আমরা বিবিধ বিষয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকি। *

স্বপ্নলব্ধ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান বটে, কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ। সেই ভ্রম স্বপ্নের একচেটিয়া নহে, জাগরণেও তাহা ঘটিয়া থাকে। জাগ্রত থাকিয়া আমরা অনেক সময় ভুল দেখিয়া থাকি, ভুল শুনিয়া থাকি। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে দ্বিবিধ ভ্রম সংঘটিত হইয়া থাকে :—

(১) প্রথমতঃ ব্যাখ্যায় ভুল থাকিতে পারে ; ইংরাজীতে এইরূপ ভ্রমকে Illusion বলে।

(২) দ্বিতীয়তঃ অনুভূতিতে ভুল থাকিতে পারে। ইহাকে ইংরাজীতে Hallucination বলে।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভ্রম বুঝাইতে হইলে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান কি প্রকারে সংঘটিত হয়, তাহার একটু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। আমরা চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি পঞ্চেন্দ্রিয় সহযোগে কোন বস্তু দর্শন করি, কোন শব্দ শ্রবণ করি, কোন খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করি, কোন ফুলের গন্ধ গ্রহণ করি বা কোন দ্রব্য স্পর্শ করি, তখন আমাদের তত্তৎ বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দুইটী উপাদান (Factor)—একটী বাহ্যবস্তু কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়যোগে মনের উপর একটা ক্রিয়া বা মনের একটা পরিবর্ত্তনসাধন, অপরটী সেই পরিবর্ত্তনের অর্থ নিরূপণ। মনে করুন, আমি কোনও গাছে একটী কোকিল দেখিতেছি। এই কোকিল দর্শনের দুইটী অংশ আছে। প্রথমতঃ কোকিলের দেহ হইতে আলোক-রেখাসমূহ আসিয়া আমার চক্ষুকে উত্তেজিত করিল, স্নায়ু-কর্ত্তৃক সেই উত্তেজনা মস্তিষ্কে নীত হইয়া তথায় মস্তিষ্কের একপ্রকার উত্তেজনা উৎপাদন করিল এবং তন্নিবন্ধন তৎক্ষণাৎ মনের একটা বিকার বা পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। এই বিকারকে ইংরাজীতে sensation নাম দেওয়া হইয়া থাকে। বৌদ্ধগণ ইহাকেই বেদনা বলিতেন। বাহির হইতে একটা ছবি আসিয়া মনের উপর অঙ্কিত হইল ; এই অনুভূতির নাম বেদনা। ইহাতে এখনও বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধে—কোকিলের সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান হইল না। কিন্তু বেদনা জন্মিবামাত্রই বা মনের উপর ছবিটী পড়িবামাত্রই আমার অনুসন্ধিৎসু মন তখনই ইহার একটা ব্যাখ্যা করিয়া ফেলিল,—বলিয়া বসিল, ইহা একটী কোকিল। এই ব্যাখ্যা অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ বা বুদ্ধিসাপেক্ষ। কাজেই সকল ব্যাখ্যা একরূপ হইবে না, সকল সময়েও একরূপ হইবে না। আমার পার্শ্বে যে শিশু বসিয়া ছিল, তাহারও চক্ষুর ভিতর দিয়া মনের উপর আলোক ঠিক তেমনই দাগ ফেলিয়াছিল, ঠিক তেমনি বেদনা জন্মাইয়াছিল। কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা তত পাকা হয় নাই। সে বলিল "ঐ একটী কাক"—যেহেতু তাহার অভিজ্ঞতা তত হয় নাই, তাহার বুদ্ধি তত পাকা হয় নাই। বেদনা বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি, উভয়েই এক ; কিন্তু ব্যাখ্যা দ্বিবিধ ; সে প্রত্যক্ষ করিল কাক, আমি প্রত্যক্ষ করিলাম কোকিল। বেদনা অভ্রান্ত হইলেও যেখানে ব্যাখ্যায় ভুল আছে, সেখানে প্রত্যক্ষেও ভুল আছে। একই ব্যক্তি একই বেদনার দুই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে পারেন—তাহার একটী হয় ত ভ্রমপূর্ণ ও অন্যটী নির্দ্দোষ। যেমন জ্যোৎস্না রাত্রিতে একটী ছোট গাছ দূর হইতে দেখিয়া মনে করিলাম, একটী লোক বসিয়া আছে। তখনই আবার নিকটে যাইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, ইহা একটী গাছ মাত্র। ভ্রম নিরসনের পর আবার আসিয়া পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইয়া দেখিলে, জিনিস ঠিক একই রকম দেখাইলেও, এবার ব্যাখ্যাটি নির্ভুল হইবে। অতএব পূর্ব্বে বেদনাটী যেমন হইবার তেমনি ছিল ; কিন্তু ব্যাখ্যায় দোষ ছিল। আমাদের বৈদান্তিকগণ এই প্রকার ভ্রমের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। রজ্জুতে সর্পভ্রম ও শুক্তিতে রজতভ্রম তাঁহাদের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। এবং 'অধ্যাস' তাঁহাদের প্রদত্ত নাম।

উপরিউক্ত ভ্রমে বেদনাটী খাঁটী। কিন্তু প্রত্যক্ষজ্ঞানে এমন ভ্রম হয়, (sensation) যাহাতে বেদনাও ভিত্তিহীন এবং ব্যাখ্যাও কাজেকাজেই ভ্রান্ত। জাগ্রতাবস্থায় এই প্রকার ভ্রম খুব কমই হইয়া থাকে। আমি শিশুকালে এই প্রকার একটী ভুল করিয়াছিলাম।

দিনের বেলায় ঘরে বসিয়া অন্য ছেলেদের সহিত আলাপ করিতেছি,—হঠাৎ দেখি, সম্মুখে মেজের উপর একটী সাপ। কিন্তু মুহূর্ত্তেই সেই সাপ অদৃশ্য হইল,—আর তাহাকে খুজিয়া কোথাও

* "The birth of a dream is then no mystery. It resembles the birth of all perceptions. The mechanism of the dream is the same in general as that of normal perception."—Bergson's Dreams, p. 37.

পাওয়া গেল না। বলা বাহুল্য, কোন সাপ তথায় ছিল না ; থাকিলে নিমেষের মধ্যে পলাইয়া যাইবার সুযোগ ছিল না। এস্থলে একটী বেদনা জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা কৃত্রিম, তাহার কোন উপযুক্ত বাহ্য কারণ নাই। এই ভ্রম রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইতে পৃথক। সেস্থলে সর্প নাই কিন্তু রজ্জু আছে ; কিন্তু এস্থলে সর্পও নাই, রজ্জুও নাই। সেস্থলে ভ্রম নিরসনের পরও বেদনা পূর্ব্ববৎই আছে, যেহেতু তাহার বাহ্যিক কারণ আছে ; কিন্তু এস্থলে ভ্রম নিরসনের পর সেই বেদনাই নাই, যেহেতু তাহার বাহ্যিক কারণ কোন কালেই ছিল না। এ ভ্রম অবিমিশ্র ভ্রম, আগাগোড়াই ভ্রম, ইহা Hallucination। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, এইরূপ বেদনার কি কোন কারণ নাই ? সে সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণের উত্তর এই—সাধারণতঃ কোন বাহ্যশক্তির দ্বারা মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইলে বেদনা নামক মনের ব্যাপার ঘটিয়া থাকে; কিন্তু কখনও মস্তিষ্কের ঠিক সেই প্রকার উত্তেজনা অন্য কারণে সংঘটিত হইলেও ফল একই দাঁড়াইবে,—সেই প্রকার বেদনাই উৎপন্ন হইবে। চিন্তাস্রোতে মানসিক চিত্র খুব পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে, মস্তিষ্কের ঠিক সেই প্রকার উত্তেজনা উপস্থিত হয় এবং বাহিরের কারণ না থাকিলেও ভিতরের কারণেই বেদনা সৃষ্ট হয়।

স্বপ্নে যে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়, তাহা এই দ্বিবিধ ভ্রমাত্মক। কতকগুলি স্বপ্ন প্রধানতঃ প্রথমোক্ত অধ্যাস বা Illusionমূলক, এবং অপর কতকগুলি মুখ্যতঃ এই শেষোক্ত Hallucinationমূলক। অবশ্যই স্বপ্নের ভুল ও জাগরণের ভুলের মধ্যে পার্থক্য আছে। স্বপ্নে যখন কল্পনা প্রত্যক্ষের ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া আমাদিগকে প্রতারিত করে, তখন ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়, বিচারশক্তিও ক্ষীণ। সুতরাং যেস্থলে খাঁটী প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত তুলনায় সংশোধনের উপায় নাই, এবং বিচারশক্তি দ্বারা সংযত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, সেখানে কল্পনা নিতান্ত অলীক হইলেও তাহা যথার্থ বলিয়া আমরা সহজেই মানিয়া লই। কিন্তু জাগরণে কল্পনা দৈবাৎ আমাদিগের ভ্রম উৎপাদন করিলেও প্রত্যক্ষজ্ঞানের তীব্রালোকে এবং বিচারবুদ্ধির শাসনে ক্ষণকালের জন্যও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। এই পার্থক্যের ফলে স্বপ্নে ভুলের মাত্রাটা অনেক বেশী হইয়া পড়ে। নিম্নে আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই উক্তির সমর্থন করিব।

প্রথমতঃ অধ্যাসজাতীয় স্বপ্নের উদাহরণ দিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের স্বপ্ন বর্ণন করিতেছেন। কৃষ্ণকান্ত অহিফেন সেবন করিয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন যে ষড়ানন......নামে নালিশ করিতে যাইয়া মহাদেবকে ডাকিতেছেন "জ্যেঠামহাশয়!" অমনি তাঁহার হস্তচ্যুত আলবোলার নলাঘাতে পানের বাটা পিকদানীর উপর পড়িয়া ঝনাৎ করিয়া শব্দ হইল। সেই শব্দে তিনি জাগিলেন। চাহিয়া দেখিলেন সত্যসত্যই মূর্ত্তিমান্ কার্ত্তিকেয়-সদৃশ গোবিন্দলাল ডাকিতেছেন "জ্যেঠামশায়।"

এস্থলে কৃষ্ণকান্তের কর্ণকুহরে নিদ্রিতাবস্থায় "জ্যেঠামহাশয়" এই ধ্বনি সত্যসত্যই প্রবেশ করিয়াছিল এবং এই শব্দের অনুভূতিও হইয়াছিল। কিন্তু নিরঙ্কুশ কল্পনা এই অনুভূত শব্দের সহিত একটী অসম্বদ্ধ ব্যাখ্যা জুড়িয়া দিল।

এইপ্রকার স্বপ্ন সকলেরই ঘটিয়া থাকে। একটু অনুধাবন করিলে প্রত্যেকেই বোধ হয় নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে এরূপ কত শত স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারেন। আমি স্বপ্নাবস্থায় একদিন শুনিলাম, অদূরে একটী শিশু খুব চেঁচাইয়া কাঁদিতেছে। কান্না শুনিয়া জাগিলাম। জাগিয়া দেখি, হাতে পুঁথি লইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছি ; তখন আর শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি নাই, আছে শুধু নিশীথকালের অবিশ্রান্ত ঝিল্লীরব। এই স্থলে শব্দের অনুভূতিটা যথার্থই হইয়াছিল ; কিন্তু স্বপ্নাবেশে আমি তাহা ঝিল্লীরব না বুঝিয়া শিশুর ক্রন্দন মনে করিলাম, এইটুকুই ভ্রম।

সার্ণার (Scherner) এই জাতীয় স্বপ্নের একটী কৌতুকজনক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। একদা এক যুবক কোন ভদ্রমহিলার প্রেমভিখারী হইয়া যখন কিছুতেই সফল-মনোরথ হইতে পারিলেন না, তখন উক্ত রমণীর আত্মীয়বর্গের অনুমতিক্রমে একদিন রমণীর সুপ্তাবস্থায় স্বীয় নাম উচ্চারণ করিলেন। রমণী তখনই তাঁহার সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখিলেন ; এইরূপ স্বপ্ন পুনঃপুনঃই দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার কর্কশ হৃদয় দ্রব হইল, যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইল ; এবং যুবকের অভিলাষ চরিতার্থ হইল। এইস্থলে একটী নাম শ্রবণ মাত্র অবলম্বন করিয়া উদ্দাম কল্পনা আত্মবিস্তার করিল।*

উপরিউক্ত তিনটী দৃষ্টান্তই শব্দানুভূতিমূলক। স্পর্শানুভূতি এবং দৈহিক বেদনার (Organic Sensations) অনুভূতির ফলে কিরূপে স্বপ্ন সৃষ্ট হইয়া থাকে তাহারও দু'একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। একদা ফরাসী দেশের দার্শনিক লেখক মরি (Maury) সাহেব একটী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সে স্বপ্নটী দার্শনিক সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, যেন তিনি ফরাসী বিপ্লবের সেই ১৭৯৩ সালের লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে বাস করিতেছেন, এবং গিলোটিন্ (Guillotine) নামক শিরশ্ছেদ যন্ত্রের ছুরিকা তাঁহার গলদেশে পতিত হইতেছে। প্রকৃত ব্যাপারটী হইয়াছিল এই—তাঁহার মশারীর একটী খুঁটি কোন কারণে ঘুমের সময় তাঁহার ঘাড়ের উপর হঠাৎ পড়িয়াছিল। সেই খুঁটীর চাপে অমনি তিনি জাগিয়া উঠিলেন এবং অন্যদিকে ক্ষিপ্রগতি কল্পনা সেই অনুভূতিটীর আশ্রয় লইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে একটি অতি দীর্ঘ স্বপ্ন রচনা করিয়া দিল।

অজীর্ণ দোষ থাকিলে এবং বুকের উপর চাপ পড়িয়া শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে অনেক বিকট স্বপ্ন (Nightmare) দৃষ্ট হইয়া থাকে। দৈহিক অনুভূতিকে (bodily sensations) ভিত্তি করিয়া এই সকল স্বপ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে।

* Cf. Seelly's Illusions, P. 141. Also cf. Dreams as Psychal Explosions by I. C. Gregory. Mind N.S., Vol xxv, No. 98, P. 193.

এক দিন আমি এইরূপ একটি উদ্বেগজনক স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলাম। আমার বোধ হইল, যেন দৈবাৎ একখণ্ড হরিতাল বিষ গিলিয়া ফেলিয়াছি। গলার ভিতর হইতে অঙ্গুলী দ্বারা তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করিলাম। প্রয়াস ব্যর্থ হইল। বমন করিবার উদ্দেশ্যে লবণ বা তৈল মিশ্রিত গরম জল খুঁজিতে লাগিলাম। তাহাও জুটিল না। এমন সময়ে একটি ডাক্তার বন্ধু আসিয়া আমাকে একটী বিষ-প্রতিষেধক ঔষধ সেবন করাইলেন। তখন জাগিয়া দেখি, উদারাধ্মান জন্য আমার একপ্রকার কণ্ঠরোধ বোধ হইতেছে। ইহা অবলম্বন করিয়াই মুহূর্ত্ত মধ্যে এত কাণ্ড হইয়া গেল।

হস্তপদের বিশেষ সংস্থান বশতঃ এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনব্যাপারের তারতম্যে কখনও আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছি বা অতলগহ্বরে পড়িতেছি, এরূপ বোধ স্বপ্নে অনেকেরই হইয়া থাকে। আমার বাল্যকালে বহুদিন পর্য্যন্ত উড়িবার স্বপ্ন একটী সাধারণ স্বপ্ন ছিল। হঠাৎ শরীরটী অতি হাল্কা বোধ হইত এবং পাখীর ন্যায় বাড়ী ঘর, গাছ পালার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়াইতাম। শীতকালে পা ঘুমন্তাবস্থায় কোন কারণে অনাবৃত হইয়া পড়িলে, জলের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছি, এরূপ স্বপ্ন কখনও কখনও দেখা যায়।

এখন আমরা দ্বিতীয়শ্রেণীর স্বপ্ন অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন কল্পনাময় স্বপ্নের (Hallucinations) আলোচনা করিব। এই জাতীয় স্বপ্নে স্নায়ুমণ্ডলীর বাহিরে, দেহের ভিতরে কি বাহিরে কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কল্পনাই ইহার একমাত্র অবলম্বন। বৈচিত্র্যময়ী, লীলাময়ী কল্পনা আপনার ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া বিবিধ বিষয়ের প্রত্যক্ষ করায়। এই স্থলে দুইটী প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক। প্রথমতঃ স্বপ্নে কল্পনা কি করিয়া প্রত্যক্ষের মুখোস্ পরে? প্রথম প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বে আমরা আংশিক ভাবে দিয়াছি। চিত্তবিক্ষেপের বাহ্যিক কারণসমূহ নিরস্ত হওয়াতে, কল্পিত মানসচিত্রে ঐকান্তিক মনোনিবেশ সম্ভবপর হয়। দর্পণ বিশেষের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত আলোকরশ্মি সম্পাতে বাহ্যবস্তুসমূহ যেরূপ দীপ্ত হইয়া থাকে, একাগ্রতালোকে তদ্রূপ মানসচিত্তও সমুজ্জ্বল হইয়া প্রত্যক্ষের আকার ধারণ করে। খাঁটি প্রত্যক্ষের সহিত মুখোমুখী না হওয়াতে এবং বিচার শক্তির ক্ষীণতাপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষবেশী কল্পিত চিত্রের ছলনা আমরা ধরিতে পারি না। কল্পনার এই অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতার অন্যতম কারণ দৈহিক। মোটামুটি বলিতে গেলে, স্বপ্নমাত্রেরই মূলে মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক কোন উত্তেজনা থাকে। হৃৎপিণ্ড হইতে সংশোধিত শোণিত প্রেরিত হইয়া মস্তিষ্কের পোষণ করিয়া থাকে। ঘুমন্ত অবস্থায় হৃৎপিণ্ড নিস্তেজ হইয়া পড়িলে দেহে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া মন্দীভূত হইয়া থাকে। সুতরাং মস্তিষ্ক-কেন্দ্র-সমূহে দূষিত রক্ত সঞ্চিত হইয়া উত্তেজনা উপস্থিত করে। এই কারণেও কল্পনা প্রত্যক্ষেরই মত পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

তার পর স্বপ্নে কল্পনার নূতন নূতন অদ্ভুত সৃষ্টির কথা। অনেকে বলিয়া থাকেন, যখন বর্ত্তমান বা অব্যবহিত পূর্ব্বকালের অভিজ্ঞতা বা চিন্তার বিষয়গুলি স্বপ্নে প্রত্যক্ষীভূত হয়, তখন না হয় কারণটা বেশ বুঝিলাম; কিন্তু যাহার সহিত দশ বৎসর দেখা হয় নাই, অথবা যে বিষয় কখনও জাগিয়া কল্পনাও করা যায় নাই, স্বপ্নে তাহার দর্শন কি প্রকারে হয় ইহাই দুর্ব্বোধ্য। অর্থাৎ যিনি দিবাভাগে খবরের কাগজে যুদ্ধ বিগ্রহের কথা পাঠ করেন, রাত্রিতে স্বপ্নাবেশে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের একটা দৃশ্য দেখিতে পাইবেন, ইহা মোটেই বিচিত্র নহে। কিন্তু যা মোটেই দেখি নাই, শুনি নাই, ভাবি নাই, এ সব আজগুবী বিষয় স্বপ্নে আসে কোথা হইতে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মনোবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মগুলির সাহায্যেই অন্ততঃ পোনে ষোল আনা অদ্ভুত স্বপ্নেরই ব্যাখ্যা করা চলে। জাগরণেই হউক বা স্বপ্নেই হউক কল্পনার সৃষ্টি অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না। বস্তুতঃ কল্পনা নূতন কিছু গড়ে না; আমরা চক্ষু কর্ণের সাহায্যে যাহা কিছু দেখি শুনি, তাহাই স্মৃতিতে অঙ্কিত হয় এবং তাহাই ভাঙ্গিয়া চূরিয়া রূপান্তরিত হইলে কল্পনা নাম ধারণ করে। এমন কি কল্পনার "আকাশকুসুম"ও একটী মৌলিক সৃষ্টি নহে। আকাশ একটা দেখা জিনিষ এবং কুসুমও একটা দেখা জিনিষ। উভয়ের সংযোজনটাই যা নূতন। বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণকান্ত রায় আবার একদিন স্বপ্ন দেখিতেছেন, যে, ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া মহাদেবের নিকট এক কৌটা আফিম কর্জ্জ লইয়া এক দলীল লিখিয়া দিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন। এরূপ স্বপ্ন অনেকেই অদ্ভুত মনে করিবেন; কারণ, কৃষ্ণকান্তের জীবনে কখনও ব্রহ্মাবিষ্ণুর সাক্ষাৎকার লাভ হয় নাই, বলা বাহুল্য। তথাপি এই স্বপ্নচিত্রের কোন অংশ কৃষ্ণকান্তের সাধারণ চিন্তা বা অভিজ্ঞানের বাহিরে ছিল, এ কথা বলা যায় কি? অহিফেন-রসজ্ঞ কৃষ্ণকান্ত পূর্ব্বেই জানিতেন, এক কৌটা আফিমের কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তুচ্ছ; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের রূপ গুণ, প্রতিমা ও ছবি ইত্যাদি সম্বন্ধে হিন্দু কৃষ্ণকান্তের পূর্ব্বে কোন জ্ঞানই ছিল না, এ কথা ভাবিবারও কোন কারণ নাই। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধ বিভ্রাট এবং ঘটনার অসামঞ্জস্য এ সকল স্বপ্ন কল্পনার কাণ্ড,—পূর্ব্ব কথিত বিচার-শক্তির সাময়িক শৈথিল্যই ইহার কারণ।* জার্ম্মাণ দার্শনিকগণ বিজ্ঞানের দিক হইতে স্বপ্ন-তত্ত্বের বহু চর্চ্চা করিয়াছেন। পাউল রাডেষ্টক (Paul Radestock), ষ্ট্রুম্পেল (Strumpell), ভুণ্ড (Wund), প্রভৃতি দার্শনিকগণের নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি জার্ম্মান্ মনোবিজ্ঞানবিদ্ ফ্রয়ড (Freud) সাহেব একটি নূতন স্বপ্ন-বিশ্লেষণ-প্রণালী (method of psyhoanalysis) এবং তৎসাহায্যে মানসিক রোগের চিকিৎসা প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তের একটু আভাস দিয়াই আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

* Cf. "Dreams create nothing" Bergson's Dreams, p. 29.

Also Cf. "The difference between dream life and waking life is due to the fact that the control of the latter is lacking in the former." Mind, N. S., No 98. 218. Retentives and Dreams by H. R. Marshall.

ফ্রয়ড্ বলেন, স্বপ্ন সকল বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, কোন না কোন গূঢ় বাসনা উহাদের মূলে নিহিত আছে। যথা, টাকা স্বপ্নে দেখিলে অর্থগৃধ্নুতাই ইহার মূল কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে সকল অভিলাষ আমরা সাধারণতঃ সমাজের ভয়ে বা অন্য কারণে চাপিয়া রাখি, সেগুলিই স্বপ্নে সুযোগ পাইয়া ঠেলিয়া উঠে এবং কল্পনাকে যথেচ্ছ চালিত করে। তাঁহার মতে এই সকল প্রতিরুদ্ধ বাসনা অধিকাংশই যৌন-সম্বন্ধমূলক। ফ্রয়ডের মত সর্ব্বাংশে বিচারসহ না হইলেও, উহাতে বেশ একটি সত্য নিহিত আছে। নৈতিক রোগের পরিচয় পাইতে হইলে মনের বহির্দ্দেশে—যেস্থান অপরের চোখে, সমাজের চোখে ধূলা দিবার জন্য মাজিয়া ঘষিয়া একটু সুরুচিসম্মত করিয়া রাখা হইয়াছে, সেস্থলে—তাহার লক্ষণ খুঁজিলে হইবে না। পরন্তু মনের নিভৃত প্রদেশে যেখানে নানাবিধ পূতিগন্ধময় বাসনার জীবন্ত বীজ অলক্ষিতে সঞ্চিত রহিয়াছে, সেখানে অনুসন্ধান করিতে হইবে। স্বপ্নযোগে যখন তথাকথিত সুরুচির বহিরাবরণ উন্মোচিত হয়, তখন সেই লুক্কায়িত দশ ভালরূপে দেখিবার সুযোগ হয়। আত্মপরীক্ষা আত্মোন্নতির সোপান এবং সেই পরীক্ষার জন্য স্বপ্নই উত্তম কষ্টি-পাথর। স্বভাবের নিয়মে লুকোচুরি চলে না। কোন যায়গায় খুঁত থাকিলে তাহার ফল ভোগ অনিবার্য্য। বীভৎস ভাব সমূহ যে ব্যক্তি হৃদয়ে চাপিয়া রাখে, সে অপরকে কিয়ৎপরিমাণে ফাঁকি দিতে পারে বটে, কিন্তু স্বপ্নাবেশে নিজেকে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। তখন সেই প্রচ্ছন্ন জীবন্ত ভাবগুলি বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহারই মর্ম্ম দংশন করিতে থাকে। পক্ষান্তরে, যিনি ক্ষুদ্র তুচ্ছ বাসনাসমূহ উন্মূলিত করিয়া হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বীজ গোপনে বপন করেন, এবং অহর্নিশ তাহাতে অনুধ্যান-বারি সেচন করেন, তাঁহার হৃদয় অচিরেই নন্দনে পরিণত হয়। তাঁহার সাধু সঙ্কল্প-তরুতে যে সকল কল্পনা-কুসুম বিকশিত হয়, তাহাদের স্নিগ্ধ সৌরভ দিবসে রজনীতে—জাগরণে স্বপ্নে সমভাবে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে।

পার্ব্বতী

শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়

১

"আমার ছেলেটাকে রক্ষা করতে হবে,—এ কায তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না শান্তি!" অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আসিয়া প্রবীণ রমেন্দ্রসুন্দর বাবু মিনতিপূর্ণ স্বরে শান্তি দেবীকে এই কথা বলিলেন।

"এ কি! দাদা? ঐ আসনটায় বস। কি হয়েছে সতুর? সে ত হাজারিবাগে ডেপুটী হয়েছে,—সেইখানেই আছে ত?"

"হবে আর কি? আমার মাথা হয়েছে! সে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্রাহ্মণের ছেলে,—কি খেয়াল ধরেছে জান? ভীল সর্দ্দার মনুয়ার একটা সুন্দরী মেয়ে আছে—সেইটেকে বিয়ে করবে, ঠিক করেছে।"

"কে তোমায় এ কথা বললে?"

"কাল সেখান থেকে সতুর এক বন্ধু এসেছে—সেই বললে। আমার মত চেয়েছে।"

"এঁ্যা! ভীলের মেয়েকে? বৌদিদি শুনে কি বললেন?"

"তাকে এ কথা বলিনি। তার শরীর কি রকম হয়েছে, জান ত? ছেলের এই কীর্ত্তির কথা শুনলেই হয় ত হঠাৎ মারা যাবে। তুমি ভিন্ন উপায় নেই শান্তি! কোন রকমে,—তাকে বুঝিয়ে পড়িয়েই হোক কি অন্য কোন রকমেই হোক,—এ বিয়ে বন্ধ করতে হবে।"

"তাই ত! কেন তার মাথায় এ খেয়াল চাপল? অত বড় ছেলে—নিজের ভাল-মন্দ বুঝতে পারে না? ব্রাহ্মণের ছেলে, নিজে হাকিমি কায করছে,—নিশ্চয়ই হাজারিবাগে সবাই খুব মান্য করে। এ বিয়ে করলে কি সে মান আর থাকবে? হয় ত চাকরিরও ক্ষতি হ'তে পারে।"

"পারে কি? ক্ষতি হবেই। ভীলের মেয়ে বিয়ে করলে, ডেপুটী বলে যেটুকু খাতির আছে, লোকে যেটুকু মান্য করে, সব যাবে। যে হাকিমের মান নেই, সে কি হাকিম? বিয়ে করলে ওখানে আর কায করা চলবে না। তা ছাড়া, দেশে, সমাজে মুখ দেখাতে পারা যাবে না।

ব্যাটা বলেছে কি জান? বলেছে ব্রাহ্ম হবে, তাহলেই ভীলের মেয়ে বে করলে আর দোষ থাকবে না!"

"তাই ত দাদা, লেখাপড়া শিখে তার এমন কুবুদ্ধি কেন হল? যা হোক, তুমি ভেব না, একটা কিছু উপায় করতে হবে,—কোন মতে এ বিয়ে হতে দেওয়া হবে না।"

"শান্তি, তুমি আমার কত উপকার করেছ, তা গুণে বলা যায় না। কিন্তু দিদি, ছেলেটাকে যদি রক্ষা করতে পার—"রমেন্দ্র আর বলিতে পারিলেন না,—তাঁহার গলার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, কেবল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া শান্তির মুখ পানে সাগ্রহ-করুণ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

২

শান্তি সন্ন্যাসিনী বলিলেও হয়। তাঁহার জীবনে পরোপকার করা ব্যতীত অপর কোন কার্য্যেই সুখ নাই। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে শান্তির স্বামী যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিবার জন্য পুরুলিয়ায় আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া ক্রমে যোগেন্দ্র ঘোর মাতাল ও অত্যন্ত নিষ্ঠুর-প্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছিলেন। কণ্ট্রাক্টরি কার্য্যে বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিয়া প্রত্যহ অতিরিক্ত মদ্য পান করিতেন ও রাত্রে স্ত্রীর সহিত—কারণে ও অকারণে,—বিবাদ ও অবশেষে তাঁহাকে প্রহার করিতেন। দেশে কেহ না থাকায়, পুরুলিয়ায় আসিয়া দুই বৎসরের মধ্যেই একখানি দ্বিতল বাটী প্রস্তুত করিয়া এইখানেই বাস করিতেছিলেন।

রমেন্দ্রসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের বাটী হুগলী জেলার একখানি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামে—শান্তির পিত্রালয়ের পার্শ্বেই। রমেন্দ্র প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে সরকারী চাকরি উপলক্ষে পুরুলিয়ায় আসিয়া এইখানেই ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র সতীন্দ্রকুমার বি-এ পাস করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছে, ও এক্ষণে হাজারিবাগে কার্য্য করিতেছে। পুরুলিয়ার জল বায়ু ভাল। এই জন্য রমেন্দ্রসুন্দর দেশের বাটী ও জমি প্রায় সমস্তই জ্ঞাতিগণকে দান-বিক্রয়াদি করিয়া দিয়াছেন। সামান্য যাহা কিছু আছে, জ্ঞাতিগণ তাহার তত্ত্বাবধারণ করেন। রমেন্দ্রসুন্দর বা তাঁহার পুত্র কালে-ভদ্রে দেশে যান। শান্তিদেবীর স্বামী যোগেন্দ্র রমেন্দ্রসুন্দরের নিকট সংবাদাদি পাইয়া কণ্ট্রাকটরি করিতে পুরুলিয়ায় আসিয়াছিলেন।

প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন রাত্রে যোগেন্দ্রনাথ অত্যন্ত মাতাল হইয়া পড়েন ও শান্তির সহিত অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বচসা করেন। শেষে তাঁহাকে এমন প্রহার করেন যে, শান্তি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান। তখন রাত্রি ১টা। প্রায় ১ ঘণ্টা পরে চৈতন্য হইলে শান্তি দেখিলেন, যোগেন্দ্র তাঁহাদের ২ বৎসর বয়স্কা একমাত্র কন্যা লীলাকে লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। শান্তির উঠিবার সামর্থ্য নাই বলিলেই হয়। গোলমালে বাটীর চাকর ও দাসীর নিদ্রার ব্যাঘাত হয় নাই; কারণ, এরূপ গোলমাল এ বাটীর স্বাভাবিক ও নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। স্বামী ও দুই বৎসরের কন্যা ঘরে নাই দেখিয়া শান্তির বড়ই ভয় হইল। ঘোর মাতাল অবস্থায় স্বামী মেয়েটাকে লইয়া এত রাত্রে কোথায় গেলেন? ক্ষীণ কণ্ঠে বারবার দাসীর নাম করিয়া ডাকিতে ডাকিতে ক্ষণকাল পরে পার্শ্বের কক্ষ হইতে দাসী আসিল। শান্তি নিম্নতল হইতে ভৃত্যকে ডাকিতে বলিলেন ও স্বয়ং ধরাসন ত্যাগ করিয়া অতি কষ্টে উপরে উঠিয়া বসিলেন। দাসী ও ভৃত্য বলিল, গোলমাল তাহারা শুনিয়াছিল; কিন্তু এরূপ ব্যাপার প্রায়ই হয় বলিয়া তাহারা উঠে নাই; তাহার পর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বহির্দ্বার খোলা, সুতরাং যোগেন্দ্র লীলাকে লইয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। নানা প্রকার দুর্ভাবনা মনে উদয় হওয়ায়, শান্তি কাঁদিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ভৃত্য সেই রাত্রেই নিকটস্থ রমেন্দ্রবাবুর বাটী গিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নীকে ডাকিয়া আনিল। রাত্রে বাটীর নিকটস্থ স্থান সকল লণ্ঠন লইয়া অন্বেষণ করা হইল, কিন্তু কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। পর দিন প্রাতে পুরুলিয়া সহরের চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা হইল, ও পুলিসে সংবাদ দেওয়া হইল। পুলিস সংবাদ পাইল যে, অনেক রাত্রে একটী বাবু একটী ছোট কন্যা সঙ্গে লইয়া পুশপুশের আড্ডায় গিয়াছিলেন। বাবুটী অত্যন্ত মাতাল। পুশ-পুশ ভাড়া করিয়া কোথায় যাইবেন জিজ্ঞাসা করায়, জড়িত স্বরে কি বলিলেন সব বোঝা গেল না। কেবল হাজারিবাগ কথাটী শুনিয়া, সেই দিকে পুশ-পুশ চালান হয়। কন্যাসহ বাবুটী হাজারিবাগ গিয়াছেন। ছোট মেয়েটী মধ্যে মধ্যে কাঁদিতেছিল।

তদনুসারে পুলিস হাজারিবাগের দিকে অন্বেষণ করিতে গেল। যোগেন্দ্র নিরুদ্দেশ হইবার চারি দিন পরে হাজারিবাগের সন্নিকটস্থ এক পার্ব্বত্য নদীর তীরে যোগেন্দ্রের মৃতদেহ পাওয়া যায়। লাস পরীক্ষা করিয়া স্থানীয় সিবিল সার্জ্জন সাহেব বলিয়াছিলেন—অতিরিক্ত মত্ততার জন্য ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় উচ্চ পাড়ের উপর হইতে পদস্খলন হইয়া নীচে প্রস্তরের উপর পড়িয়া মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া মৃত্যু হইয়াছে। কন্যা লীলার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। হাজারিবাগে খোঁজ করিয়া পুলিস জানিল, যে দিন মৃত-দেহ পাওয়া যায়, তাহার পূর্ব্ব দিন যোগেন্দ্র কন্যাসহ পুশ-পুশ হইতে নামিয়াছিলেন। সে দিন লোকে তাঁহাকে কন্যাসহ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও পথে দেখিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত লীলার আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

স্বামী ও কন্যা-হারা হইয়া অভাগিনী শান্তি প্রায় মাসাবধি কাল শয্যাগত ছিলেন। দেশে আপনার বলিতে আপন কেহ নাই। যাহারা আছে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। তাহারা বিধবা শান্তির অর্থ নানা প্রকারে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে। দেশে যাইলে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন সুফল সম্ভবে না। অর্থের অভাব নাই। যোগেন্দ্র মদে অপব্যয় করিয়াও ৫০।৬০ সহস্র টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া গিয়াছিলেন। অনাথা শান্তি বাল্যসখা ও জ্যেষ্ঠ সহোদরাধিক রমেন দাদার তত্ত্বাবধানে পুরুলিয়াতেই রহিয়া গেলেন। পরোপকার ব্যতীত অপর কোন কার্য্য শান্তির নাই। রোগীর সেবা, দরিদ্রকে সাহায্য দান ও অন্য নানা প্রকারে লোকের উপকার করাই শান্তিদেবীর জীবনের ব্রত হইল, এবং এই জন্য সবাই তাঁহাকে "দেবী" আখ্যা দিল।

৩

রমেন্দ্রসুন্দরের সনির্ব্বন্ধ ও সানুনয় অনুরোধে শান্তিদেবীর কোমল প্রাণ গলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া তিনি উত্তর দিলেন, "ভেব না দাদা, আমি যতদূর সাধ্য চেষ্টা করব,—যেমন করে হোক এ বিয়ে বন্ধ করতেই হবে। সতু যদি কথা না শোনে, তা'হলে মনুয়া সর্দ্দারের বৌকেও আমি জানি, তাকে বুঝিয়ে বলে কোন রকম কৌশলে এ বিয়ে বন্ধ করতে হবে। আজকালের ছেলে,—একটা অসভ্য ভীলের মেয়েকে দেখে এমন মাথা বেগড়াল যে, বাপ-মায়ের অমতে ব্রাহ্ম মতে তাকে বিয়ে করবার ঝোঁক ধরলে? এ যে বড়ই আশ্চর্য্য বলে মনে হচ্ছে।"

"ভীলের মেয়ে হলে কি হয়? পার্ব্বতী পরমা সুন্দরী,—হাজারিবাগে মিশনারী মেয়ে-স্কুলে পড়ে সে না কি খুব লেখাপড়া, গানবাজনা, বোনা এই সব শিখে সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মেয়েদের চেয়েও সভ্য হয়েছে। মনুয়া সর্দ্দারের বেশ পয়সা আছে। ঐ একটা মেয়ে, তাকে পোষাক, জুতো, মোজা সমস্ত আজকালকার সভ্য বাঙ্গালী ভদ্র-লোকের মেয়েদের মত দিয়েছে। দেখলে বোঝা যায় না যে সে ভীলের মেয়ে।"

"আমি কালই হাজারিবাগ যাচ্ছি। সতু বাসায় তার পিসিকে দু পাঁচ দিনের জন্য একটু জায়গা দিতে পারবে বোধ হয়। তার পর দেখি কি করতে পারি।"

সানুনয় গদ্‌গদ্ স্বরে রমেন্দ্রসুন্দর বলিলেন, "শান্তি, তুমি আমার বিস্তর উপকার করেছ; কিন্তু ছেলেটাকে যদি কোন রকমে তার এই অসম্ভব বেয়াড়া খেয়াল থেকে ফেরাতে পার—তাহলে কি আর বলব শান্তি, তুমি আমার আপনার ভগ্নীর বাড়া, আমি চিরদিনের জন্য—"

বাধা দিয়া শান্তি বলিলেন, "আর কিছু বলতে হবে না দাদা! আমার মার পেটের ভাই নেই তুমি আমার ভাই। কপালই যেন পুড়েছে; কিন্তু আমি মেয়েমানুষ, বাঙ্গালী মেয়ের বুদ্ধি এখনও হারাই নি। তুমি ভেব না দাদা, যা হয় কিছু করবই। আমার কাযই ত এই।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শান্তি চক্ষের এক ফোঁটা জল অঞ্চলে মুছিলেন।

রমেন্দ্রও পূর্ব্ব-কথা স্মরণ করিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তবে আমি এখন আসি শান্তি!"

"এস দাদা, ৩।৪ দিনের মধ্যেই, কি করতে পারি না পারি, তোমায় খবর দেব।"

রমেন্দ্রসুন্দর চলিয়া গেলেন। শান্তিও অন্যমনে কক্ষান্তরে উঠিয়া গেলেন। কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও, বাল্যকালে একত্র খেলা-ধূলা প্রভৃতি করায়, ইঁহারা এক মাতৃ-গর্ভজাত ভ্রাতা-ভগ্নীর মত পরস্পরকে স্নেহ করেন, এবং কেহ কাহাকেও পর বলিয়া মনে করেন না।

৪

একজন দাসী সমভিব্যাহারে শান্তি দেবী হাজারিবাগে পৌছিয়াছেন। সতীন্দ্রনাথ যদিও আধুনিক নিয়মানুসারে একটু সাহেবী চালে থাকেন, তথাপি বিধবা শান্তির জন্য নিজের বাঙ্গলায় হিঁদুয়ানী-সম্মত ব্রহ্মচর্য্যের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

সন্ধ্যাকালে কাছারী হইতে ফিরিয়া জলযোগ করিয়া সতীন্দ্র বাহিরের ঘরে একখানি কৌচে বসিয়া একখানি বিলাতী মাসিক পত্র পড়িতেছেন, সেই সময় শান্তি দেবী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে সতু, যা শুনছি তা কি সত্যি ?"

"কি শুনেছ পিসিমা ?"

"তুই না কি মনুয়া সর্দ্দারের মেয়ে পার্ব্বতীকে বিয়ে করবি বলে ক্ষেপেছিস ?"

"তাতে দোষ কি পিসিমা ?"

"দোষ কি ? বলিস কি সতু ! তুই এ কথা বললি !"

"কি দোষ আমায় বুঝিয়ে দাও ; তার পর আমি তোমার কথার উত্তর দিচ্ছি।"

"কি দোষ তাও বুঝিয়ে দিতে হবে ? লেখাপড়া শিখে তোর এতদূর মাথা খারাপ হয়ে গেল কেমন করে সতু ? দোষ প্রথম—তুই ব্রাহ্মণের ছেলে, বড় বংশের ছেলে, আর সে একটা সাধারণ ভীলের মেয়ে,—তোর সঙ্গে তার কখন বিয়ে হয় ? একটা জাত-বিচার নেই ? এ বিয়ে করলে সমাজে মুখ দেখাবি কেমন করে ? আর দাদাই বা এই বয়সে সমাজে মুখ দেখাবেন কেমন করে ?"

"আমি যদি সমাজে না থাকি ! হিন্দু-সমাজের এই সমস্ত অন্যায় বাঁধাবাঁধি, এই সব অত্যাচার যদি না সহ্য করি !"

"বলিস কি সতু ! তাহলে বাপ-মাকে ছেড়ে আলাদা হবি ? তাঁরা ত আর হিন্দু-সমাজ ত্যাগ করে ব্রাহ্ম হতে পারবেন না।"

"না-না, তাহলে তাঁরাই আমাকে ত্যাগ করবেন। তাঁরা যদি আমাকে চান, তাহলে সমাজ ছাড়ুন—ব্রাহ্ম হোন। আর যদি সমাজ চান, তাহলে আমাকে পাবেন না। এইতে বাপ-মায়ের স্নেহ জানা যাবে। আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান—আমার চেয়ে যদি তাঁদের সমাজ বড় হয় তাহলে তাঁরা সমাজ রাখুন—আমাকে পাবেন না।"

"তোর মুখে এই রকম কথা শুনে আমি যে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি সতু ! পৈতে হয়ে অবধি বরাবর তুই সন্ধ্যা আহ্নিক করতিস, ঠাকুর-দেবতা দেখলে প্রণাম করতিস, আর সেই তুই আজ একটা ভীলের মেয়ের জন্য হিন্দু-সমাজ ছেড়ে ব্রাহ্ম হবি বলছিস ?"

"সে সব ত এখনও করি পিসিমা, তাতে কি হল ? মনে মনে আমি যেমন আছি তেমনি থাকব, এখন যা করি সবই করব ; কিন্তু পার্ব্বতীকে ফেলে দিতে পারব না।"

"কেন পারবি না ? সে ভীলের মেয়ে, তোর কাছে এমনি হল যে, তার জন্য তুই তোর বাপ-মাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করবি ? নে নে—ওসব পাগলামি রাখ, যা বলি শোন। দিন কতক ছুটি নিয়ে পুরুলিয়ায় চল, তার পর সবাই দেশে গিয়ে তোর মনের মত বিয়ে দিয়ে আনি।" বলিয়া শান্তি উঠিলেন।

সতীন্দ্র বলিলেন "সে আর হয় না পিসিমা।"

আর কোন কথা না বলিয়া শান্তি সে কক্ষ হইতে চলিয়া গেলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, পার্ব্বতীর মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, একবার সেদিক হইতে চেষ্টা করিয়া, পরে আবশ্যক হয় ত আবার সতীন্দ্রের সহিত কথা কহিবেন।

৫

মনুয়া সর্দ্দারের পত্নী ভুলনী এক্ষণে সাধারণ ভীল-নারী অপেক্ষা অনেকটা সভ্য। তাহার ঘর-দ্বারও সুসজ্জিত। ভুলনী বৈকালে রন্ধন করিতেছে, এমন সময় শান্তি দেবী আসিয়া ডাকিলেন, "কি রে ভুলনী, চিনতে পারিস ?"

চমকিত হইয়া ভুলনী ফিরিয়া দেখিল, ও তৎক্ষণাৎ সহাস্য বদনে বলিল, "পারবনি কেনে মাই ? আসলি কেখন ?" বলিয়া তাড়াতাড়ি একখানি পিঁড়ি পাতিয়া শান্তিকে বসিতে দিল।

বসিয়া শান্তি বলিলেন, "এসেছি আজ দুদিন। তা হ্যাঁরে ভুলনী, তুই সব জেনে শুনে এইটে হতে দিচ্ছিস ?"

ভুলনী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি মাই ?"

"সতুর সঙ্গে তোর মেয়ের বিয়ে !"

"সে হামি কি করবে মাই ? হামি বুঢ়া হইয়েছে, পার্ব্বতী লিখা পঢ়া শিখিয়ে এখন হামার বাত শুনে না, বিবি হইয়েছে।"

"তা বললে হবে না ভুলনী, এ বিয়ে বন্ধ করতেই হবে। সতু বামনের ছেলে, তোর মেয়ে বিয়ে করলে তার বাপ, তুই জানিস ত তার বাপকে—রমেন দাদাকে ? তোরা যখন পুরুলিয়ায় ছিলি, রোজ তাঁর বাড়ী যেতিস, মনে পড়ে না ?"

"সে পড়বেক নি কেনে মাই ?"

"সেই রমেন-দা,—ছেলে যদি ভীলের মেয়ে বিয়ে করে, তাহলে কি দেশে মুখ দেখাতে পারবে ? তার পর সতু হাকিমী কায পেয়েছে,—তোর মেয়েকে বিয়ে করলে, তার যে মান ইজ্জত আছে, তা কি আর থাকবে ? লোকে কি তাকে হাকিম বলে মানবে ?"

"সে হামি সব জানে মাই। তা কি করবে ? হামার বাত শুনবেক নি।" বলিয়া ভুলনী হাস্য করিল।

ভুলনীর হাস্য দেখিয়া শান্তি রুষ্ট ভাবে বলিলেন, "তুই হাসছিস ? বুঝতে পারছিস নে যে, একটা সংসার নষ্ট করতে বসেছিস ?"

"কেনে মাই, সতুবাবু বলিয়েছে, বামনাই ছাড়িয়ে দিয়ে ব্রাহ্ম দলে নাম লিখাবেক,—ভীলের বিটী সাদি করলে দোষ হবেক নি, ইজ্জত ভি যাবেক নি।"

"সে সব আমি জানি। দোষ হবেক নি—তোর মাথা হবেক নি ! তুই বুড় হয়েছিস, বুঝতে পাচ্ছিস নে যে, তাহলেই তাকে বাপ-মা ছাড়তে হবে ? তার বাপ-মা ত আর এ বয়সে নিজের পূর্ব্ব-পুরুষের ধর্ম্ম ছেড়ে ছেলের জন্য এখন ব্রাহ্ম হতে পারবে না।"

"সে মাই হামি কি করবে ? এ বুঢ়ির বাত শুনছেক নি। রঘুয়া সর্দ্দারের বিটা—রঘুয়াকে জানিস মাই ?"

"জানি না—তবে নাম শুনেছি বোধ হয়।"

"গাঁয়ের সর্দ্দার। ই রঘুয়ার বিটা ধনিয়া পার্ব্বতীকে সাদি করবার লেগে কেতো বললো—কেতো সাধলো, পার্ব্বতী বিটী লিখা পঢ়া শিখিয়ে এমন হইয়েছে—ধনিয়াকে খাদায়ে দিল। ভীলের বিটা কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে চলিয়ে গেল।"

"ধনিয়া কোথায় থাকে ?"

"উ ইখানে জগুয়ার ঘরে রহিয়েছে। কালভি পার্ব্বতীর পাস আসলো, বিটী দিমাগ করিয়ে বাতভি করলো না।"

"ভুলনী, যেমন করে হোক এ বিয়ে বন্ধ করে ঐ ধনিয়ার সঙ্গে পার্ব্বতীর বিয়ে দিতে হবে। এ তোকে করতেই হবে ভুলনী। ব্রাহ্মণের সংসারটা ছারখার হলে তোর কত দূর মহাপাতক, বুঝতে পারছিস নে ?"

"তু ভাবিস্ না মাই, ছারখার হবেক নি।"

"আর হবেক নি কি করে বলছিস ? সতুর সঙ্গে বিয়ে হলেই ত ছারখার হবে।"

"না মাই, তু ভাবিস নি। কুচ্ছু হবেক নি।"

৬

এই সময় মোজা জুতা শাড়ি ও জ্যাকেট পরা পার্ব্বতী সেইখানে উপস্থিত হইল ; সুতরাং আর অধিক কথা হইবে না ভাবিয়া, কেবলমাত্র "তবে দেখিস ভুলনী, ব্রাহ্মণের সংসার নষ্ট হলে আমি আর তোর মুখ দেখব না।" বলিয়া শান্তি উঠিলেন,—পার্ব্বতীর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিলেন না।

শান্তির কথা শুনিয়া পার্ব্বতী মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে মা ? কোন্ বামনের কথা ?"

এইবার পার্ব্বতীর মুখের উপর শান্তির দৃষ্টি পতিত হইল। তাহার রূপ দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কি যেন এক অজানা প্রাণের আকর্ষণে তাঁহার প্রাণ এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ভীলবালার প্রতি আকৃষ্ট হইল। একদৃষ্টে শান্তি পার্ব্বতীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

পার্ব্বতীর রং খুব সুন্দর। চক্ষু দুটী বড় বড়, নাক মুখ কাণ সবই সুগঠিত—সহজে দোষ ধরা যায় না। নাতি-দীর্ঘ নাতি-খর্ব্ব কিশোরীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই মানান-সই ; রোগাও নহে, মোটাও নহে—বেশ গোলগাল। এক কথায়, পার্ব্বতী খুব সুন্দরী। ভীলের কথা দূরে থাক, বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গৃহেও এমন সুন্দরী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

পার্ব্বতীর প্রশ্ন শুনিয়া ভুলনী বলিল, "তুঁ সতুবাবুর সাথে সাদি করবি, ই বাত শুনিয়ে মাই কি বলছে শুন। তু বল মাই।" বলিয়া সেস্থান হইতে ভুলনী চলিয়া গেল।

শান্তি উঠিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার বসিলেন। মনে মনে

ভাবিতেছেন—"সতুর দোষ নাই। এ রূপ দেখিয়া কোন্ যুবা স্থির থাকিতে পারে ?"

৩

সন্ন্যাসিনীর বেশধারিণী দেখিয়া পার্ব্বতী শান্তিকে প্রণাম করিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পার্ব্বতীকে দেখিয়া কি এক অজ্ঞাত কারণে শান্তি বিচলিত হইয়াছিলেন ; এক্ষণে আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিলেন, "তুই লেখা-পড়া শিখেছিস মা, তোর বুদ্ধি আছে, তুই বোঝ। সতু বড় ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে, তার ওপর হাকিমী চাকরি করছে। ভীলের মেয়েকে বিয়ে করলে, তার বাপ কি আর দেশে মুখ দেখাতে পারবে ? না, হাকিম বলে তার যে মান-ইজ্জত এখানে আছে, তা আর থাকবে ? বুঝতে পাচ্ছিস—তাহলেই তোর জন্যে সতুকে বাপ-মা ছাড়তে হবে, এতে তাদের সংসারটা ছারখার হবে না ?"

অবনত আরক্ত বদনে পার্ব্বতী ধীর ভাবে উত্তর দিল, "এ সব জানি মা, কিন্তু বাবু কোন কথা শুনতে চান না। তিনি বলেন, বাপ-মা যদি অমত করেন, তাহলে ব্রাহ্ম হবেন।"

"সে আমি জানি। তাই হলেই ত সতুকে বাপ-মা ছেড়ে তোকে নিয়ে থাকতে হবে! আর কখন দেশে যেতে পারবে না। এই হাজারিবাগে, যেখানে ব্রাহ্মণের ছেলে বলে, হাকিম বলে, সতুকে সবাই মান্য করে, সবাই খাতির করে, এখানেও আর লোকে তেমন মান্য করবে না, মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে,—আর তা হলেই সে অপমান মাথায় করে এখানে সে থাকতে পারবে না। বোঝ পার্ব্বতি, সতুকে বিয়ে করে তার কতদূর ক্ষতি করবি।"

"এ সব কথাই হয়েছে মা, কিন্তু তবু তিনি শোনেন না। অনেক কথা বলেন—আমাকে বিয়ে না করলে তিনি বাঁচবেন না, আমার জন্য সব ছাড়তে পারেন, এই রকম কত কথা—আমি আর তার উত্তর দিতে পারিনি।"

"সতুর মঙ্গলের জন্য আমি যা বলব, তা করতে পারবি ?"

"কি করব বল মা ?"

"তুই একদিনের মধ্যে চুপি চুপি ধনিয়ার সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দিই, তুই স্বামীর সঙ্গে তার ঘরে চলে যা।"

এ কি! এ কথা কয়টী বলিতে শান্তির প্রাণ অমন অস্থির হয় কেন ?

আরক্ত ও অবনত বদনে পার্ব্বতী দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না। ক্ষণকাল পরে শান্তি পুনর্ব্বার বলিলেন, "কি বলিস ? চুপ করে রইলি যে!"

সজল নেত্রে শান্তির মুখ পানে চাহিয়া পার্ব্বতী বলিল, "বিয়ে না করেই আমি হাজারিবাগ ছেড়ে চলে যাচ্ছি মা! আর কখন বাবু আমায় দেখতে পাবেন না।" পুনর্ব্বার মস্তক অবনত করিয়া ধীরে ধীরে পার্ব্বতী বলিল, "আমি আজই সন্ধ্যার পর হাজারিবাগ ছেড়ে চলে যাব মা, আমার বাবুর ক্ষতি হতে দেব না।"

"কোথায় যাবি ?"

"তা জানি না মা! কোথাও চলে যাব, বাবু আর কখন আমাকে দেখতে পাবেন না।"

পার্ব্বতীর সজল নেত্র ও বেদনা-ব্যথিত আরক্ত বদন দেখিয়া শান্তিও প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিলেন। এ ভীল বালিকাকে দেখিয়া প্রাণ এমন করে কেন ? তাহার ব্যথায় এত ব্যথা লাগে কেন ? শান্তি বলিলেন—"না পার্ব্বতি, অমন করে চলে যাওয়া হবে না। আমি টাকা দিচ্ছি, তুই গাড়ি ভাড়া করে তোদের কোন আপনার জনের বাড়ী চলে যা। তুই এক বছর সেখানে থাক। তার মধ্যে আমরা সতুকে দেশে নিয়ে গিয়ে বিয়ে-থা দিয়ে আনি। তার পর আবার বাপ-মার কাছে ফিরে আসিস।"

পার্ব্বতী অবনত বদনে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। শান্তি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিস? রাঁচিতে তোর পিসি, সেই ঝুমনী আছে না ?"

"হ্যাঁ।"

"তুই ঝুমনীর কাছে যা। সেখানে যা খরচপত্র হবে, সব আমি দেব। এখন তোর যাবার আর পথের অন্য খরচের জন্য এই ৫০৲ টাকা নে।" বলিয়া অঞ্চল হইতে একখানি ৫০৲ টাকার নোট বাহির করিয়া পার্ব্বতীকে দিতে গেলেন।

নোট না লইয়া পার্ব্বতী বলিল—"থাক মা, যাবার গাড়ি ভাড়ার টাকা আমার আছে, এর পরে যদি দরকার হয় ত চেয়ে নেব। সব যখন ছাড়তে পারব, তখন টাকার

জন্য—" আর বলিতে পারিল না ; পার্ব্বতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল,—দুই চক্ষু হইতে প্রবল বেগে রুদ্ধ অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

পার্ব্বতীর ভাব দেখিয়া ঈষৎ শঙ্কিত ও সন্দিগ্ধ ভাবে শান্তি বলিলেন, "না পার্ব্বতি, তোর অন্য কিছু মতলব আছে, আমি ভাল বুঝছি না। তুই লেখাপড়া শিখেছিস, বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে, তাই তোরে এত কথা বলছি। তা না হলে কি ত আর কোন ব্যবস্থা করতাম। দেখ—বোঝ, বাপ-মায়ের এক ছেলে, তোর জন্যে বাপ-মায়ের পর হয়ে যাবে ; ব্রাহ্মণের সংসারটা নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা কি ভাল ?"

"না মা, তা হবে না। তাঁর যাতে মন্দ হবে, তা আমি করব না। আমি আজই রাত্রে হাজারিবাগ ছেড়ে যাব।"

"তা-ত যাবি, কিন্তু কোথায় যাবি, সে কথা ত বলছিস না। বল তুই, রাঁচিতে তোর পিসির কাছে যাবি, আর কিছু করবি নে ?"

ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "তাই যাব মা, পিসির কাছেই যাব, আর কিছু করব না।"

"তবে টাকা নে, না নিলে আমি জানব যে, তোর আর কোন মতলব আছে।"

আর কোন কথা না বলিয়া পার্ব্বতী হাত পাতিল। শান্তি নোটখানি তাহার হস্তে দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, ও অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "দেখিস মা পার্ব্বতী, যেন একটা ভয়ঙ্কর কিছু করে বসিসনে—তাহলে আর আমি মুখ দেখাতে পারব না।"

"না মা, কিছু করব না।" বলিয়া অন্যমনে পার্ব্বতী গৃহ হইতে বহির্গত হইল। শান্তিও বিষণ্ণ বদনে, রাস্তায় গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল, গিয়া তাহাতে উঠিলেন।

৭

সন্ধ্যার পর সতীন্দ্র কাছারী হইতে ফিরিয়া বাহিরের ঘরে একখানি কৌচে বসিয়া আছে ; নীচে মনুয়া সর্দ্দার বসিয়া কি বলিতেছিল। এই সময় শান্তি আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। সতীন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়াই উত্তেজিত ও স্মিত বদনে বলিয়া উঠিল, "পিসিমা, পার্ব্বতী ভীলের মেয়ে নয়। সর্দ্দার কি বলছে শোন। সর্দ্দার ছ' মাস এখানে ছিল না, রাঁচিতে ভগ্নীর বাড়ী কি কাযে গিয়েছিল,—আজ এই একটু আগে এখানে ফিরেছে। আমি দেখতে পেয়ে সঙ্গে করে বাড়ী এনেছি, এখনও নিজের বাড়ী যায়নি। শোন, সর্দ্দার কি বলে।"

"পার্ব্বতী ভীলের মেয়ে নয় ? তবে কার মেয়ে ?" শান্তির শরীর ঝিম ঝিম্ করিতে লাগিল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল, কি এক অজানা আতঙ্কে শান্তির প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। ব্যস্তভাবে ও ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে শান্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পার্ব্বতী তোমার মেয়ে নয় ত কার মেয়ে ? বল সর্দ্দার, পার্ব্বতী কার মেয়ে ?"

মনুয়া সর্দ্দার যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই,—প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে একদিন প্রাতঃকালে হাজারিবাগের নিকটস্থ পার্ব্বত্য নদীর তীর দিয়া সে ফিরিতেছিল ; এমন সময় একটা পতনের শব্দ ও শিশু-কণ্ঠ বিনিঃসৃত ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া সেইদিকে ছুটিয়া যায়। অনতিদূরে দেখিতে পাইল, একটী বাঙ্গালী বাবু নদীতীরস্থ বালুকার উপর পড়িয়া রহিয়াছেন, তাঁহার মাথা ফাটিয়া প্রবলবেগে রক্তধারা বহিতেছে। নিকটে একটী ছোট বালিকা পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছে। সর্দ্দার বাবুটীকে পূর্ব্বে কখন দেখে নাই। মুখে চোখে জল দিতে দিতে বাবুটির জ্ঞান হইল ; অতি কষ্টে বলিলেন "পকেটে টাকা আছে নাও ;—মেয়েটাকে দেখো।" অস্পষ্টভাবে আরও কি বলিলেন, সর্দ্দার তাহা বুঝিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে বাবুটীর প্রাণ বহির্গত হইল।

শিশু কন্যাটীর কোনরূপ আঘাত লাগে নাই, কিন্তু তথাপি তাহাকে কাহারও হস্তে না দিয়া, সে একা মৃতদেহ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতে পারিবে ? এতদ্ব্যতীত সেই নদীতীর দিয়াই পথ,—প্রাতঃকালে বহু লোক সেই পথে যাতায়াত করে,—কেহ না কেহ দেখিয়া পুলিসে সংবাদ দিবে,—এখানে পড়িয়া থাকিয়া শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইবে না। সর্দ্দারের সন্তানাদি হয় নাই, সুতরাং শিশু কন্যাটীর ভার সে স্বয়ংই লইতে পারিবে ; কিন্তু এই মৃতদেহ সম্বন্ধে পুলিসের হাঙ্গামায় যাইতে সে বড় সম্মত নহে। আবার পুলিসে সংবাদ না দিয়াই, এরূপ মৃতদেহ সৎকার করিতে যাওয়াও বিপজ্জনক,—কেহ জানিতে পারিলে, হাতে হাত-কড়ি পড়িবে। তবে যদি মেয়েটীকে ঘরে রাখিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে, দেহটী পড়িয়াই আছে কোন ব্যবস্থা হয় নাই, তখন অগত্যা পুলিসে সংবাদ দিতে ও পুলিসের

হাঙ্গামায় যাইতে হইবে। এই সকল ভাবিয়া, মনুয়া বাবুটীর পকেট হইতে নোটের তাড়া ও মনিব্যাগ বাহির করিল; কিন্তু ৪খানি মাত্র ১০৲ টাকার নোট লইয়া বাকি নোট ও ব্যাগটী পুনর্ব্বার পকেটে রাখিয়া দিল। তৎপরে মেয়েটীকে কোলে লইয়া দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করিয়া আপনার বাটী অভিমুখে চলিল। সর্দ্দার তখন সহরের মধ্যে থাকে না, তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী একখানি গ্রামে বাস করে।

সে সর্দ্দারণী ভুলনীর হস্তে ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটীকে অর্পণ করিল, এবং সত্বর তাহাকে দুগ্ধ খাওয়াইতে বলিয়া পুনর্ব্বার নদীর দিকে ফিরিল। কেহ যদি না দেখিতে পায়,—বাবুটীর দেহ যদি শৃগাল কুক্কুরে খাইতে আরম্ভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে পাপ তাহারই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে নদী অভিমুখে চলিল। নদীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাইল, দুইজন পুলিসের কনষ্টেবল ও একজন মোটাসোটা জমাদার পাড়ের উপর এক বৃক্ষতলে রহিয়াছে। তাহাদের নিকটেই ৪।৫ জন নিম্নশ্রেণীর লোক ছিল। তাহারা একখানা কাষ্ঠের আগড়ের মত কোন বস্তুর উপর মৃতদেহটী তুলিয়া লইল ও জমাদারের আদেশানুসারে সহরের দিকে অগ্রসর হইল। সর্দ্দার আর কোন কথা কহিবার আবশ্যকতা নাই বুঝিয়া, পথিকের মত দাঁড়াইয়া দেখিল, এবং তাহারা চলিয়া গেলে, পুনর্ব্বার নিজ বাটীর দিকে ফিরিল।

৮

সকল কথা শুনিয়া শান্তির আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, পার্ব্বতী তাঁহারই কন্যা লীলা। উত্তেজিত কণ্ঠে শান্তি বলিয়া উঠিলেন "সর্দ্দার—সর্দ্দার! সে মেয়ের গায়ে কোন গয়না ছিল? তার—তার গায়ের জামা, কি আর কোন চিহ্ন আছে?

সতীন্দ্র পূর্ব্বে ব্যাপার সমস্ত অবগত ছিল না, সে সময় সে দেশে ছিল। বৎসরাধিক কাল পরে স্কুলের ছুটী হইলে হাজারিবাগে আসিয়া লোকের মুখে মোটামুটি রকম শুনিয়াছিল যে, যোগেন্দ্র মেয়ে লইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন—মেয়ের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শান্তির উত্তেজিত ভাব দেখিয়া ও প্রশ্ন শুনিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি পিসিমা?"

"সব বলছি বাবা, সব বলছি। সর্দ্দার, কোন চিহ্ন আছে?"

"বিটীর কুর্ত্তা ছিলেক, জুতা ছিলেক, সোনার বালা ছিলেক, আর দুটা গহনা ছিলেক, ই সবই হামি রাখিয়ে দিয়েছে মাই, ই সকলই সর্দ্দারণীর পাস রাখিয়েছে।"

"যাও সর্দ্দার, শীঘ্র বাড়ী যাও, যা যা আছে সব নিয়ে এস। আর সঙ্গে করে—সঙ্গে করে—লীলা—এই তোমার পার্ব্বতীকেও এন। সতু, গাড়ি?"

"গাড়ি যোতাই আছে পিসিমা! যাও সর্দ্দার, গেটের সামনে গাড়ি আছে, শীঘ্র বাড়ী যাও; আর পিসিমা যা বললেন—সব, আর পার্ব্বতীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এস। কিন্তু ব্যাপার কি পিসিমা?"

"সব বলছি বাবা, আগে ও যাক। দেরি হলে মন্দ হতে পারে।"

শান্তির ভাব দেখিয়া মনুয়া সর্দ্দারও আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু কোন কথা না বলিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। সতীন্দ্র ভৃত্যের দ্বারা কোচম্যানকে বলিয়া পাঠাইল, সে যেন সর্দ্দারকে লইয়া যায়; এবং সেখানে অপেক্ষা করিয়া, সে ও আর যে যে তাহার সঙ্গে আসে, সবাইকে গাড়ি করিয়া লইয়া আসে।

ইহার পরই সতীন্দ্র পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি পিসিমা? তুমি ত বড় অল্পে এত ব্যস্ত হও না।"

শান্তি দেবী পূর্ব্ব-ঘটনা সমস্ত বিস্তৃত ভাবে বলিয়া গেলেন; এবং তৎপরে অন্য সর্দ্দারণী ও পার্ব্বতীর সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, কিছুমাত্র গোপন না করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিলেন। সমস্ত শ্রবণ করিয়া সতীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, রাত প্রায় ৮টা বাজল;—পার্ব্বতী যদি—যদি—যেমন বলেছে—যদি চলে গিয়ে থাকে পিসিমা?"

"তাই ত ভাবছি রে বাবা! সেইজন্যই ত মনুয়াকে অত তাড়াতাড়ি গাড়ি করে পাঠিয়ে দিতে বললুম।"

৯

ক্ষণকাল পরেই সতীন্দ্রের বাঙ্গলার গেটে গাড়ি ফিরিয়া আসিল। মনুয়া সর্দ্দার গাড়ি হইতে নামিয়া দ্রুতপদে সতীন্দ্র ও শান্তিদেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া, শান্তির সম্মুখে একটা ছোট পুঁটলী রাখিয়া বলিল, "ই লে মাই, ইয়ার ভিতর সব আছেন। লেকিন পার্ব্বতীকে মিললো না, সে চলিয়ে গিয়েছে।"

শান্তি বজ্রাহতের ন্যায় ক্ষণকাল সর্দ্দারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে সর্দ্দারের আনীত পুঁটলী খুলিলেন। তন্মধ্য হইতে নিরুদ্দিষ্টা কন্যা লীলার ছোট জামা, জুতা ও গহনা প্রভৃতির প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই আর সন্দেহের লেশ মাত্র রহিল না। শান্তির মাথা ঘুরিতে লাগিল, তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কি হবে বাবা সতু? আমি নিজে এই সর্ব্বনাশটী করলুম; হায় হায়, পেয়ে হারালুম! বাছাকে পেয়ে হারালুম!"

"ভয় নেই পিসিমা, সে কখনই বেশী দূর যেতে পারে নি, এখনই ধরে ফিরিয়ে আনা যাবে। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। সর্দ্দার, পার্ব্বতীকে এখনই খুঁজে আনতে হবে।"

সর্দ্দার বলিল যে ফিরিবার পূর্ব্বেই সে ৩।৪ জন অনুগত ভীলকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে পার্ব্বতীর অন্বেষণে পাঠাইয়া সংবাদ ও পুটলীটী দিতে আসিয়াছে। সে স্বয়ং আর ২।৩ জন লোক সঙ্গে লইয়া এখনই যাইবে। পার্ব্বতী তাহার আপন সন্তান না হইলেও সন্তানের অধিক।

"চল সর্দ্দার, তোমার সঙ্গে আমিও যাই।" বলিয়া সতীন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল।

শান্তিদেবী করুণ ও ব্যগ্রভাবে বলিলেন "গাড়ি নে যাবি ত? তাহলে আমাকেও নিয়ে চল বাবা! আমি এখানে বসে—"

সতীন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "তুমি এই রাত্রে কোথায় যাবে পিসিমা? গাড়ি সঙ্গে থাকবে বটে, কিন্তু কোথায় কোন দিকে গেছে খোঁজ করতে হবে, তুমি—তুমি পারবে না! ঘরে থাক, ব্যস্ত হয়ো না—দেখ, রাত ১০টা ১১টার মধ্যে তোমার লীলাকে ফিরিয়ে আনছি। আমাদের আর বাধা দিয়ো না, দেরি হচ্ছে, আমরা বেরিয়ে পড়ি।"

শান্তি আর কথা কহিলেন না, অধীর ও উৎকণ্ঠিত-ভাবে সেইখানে বসিয়া রহিলেন। মনুয়া সর্দ্দার ও সতীন্দ্র বাহির হইয়া গেল।

প্রথমে পুশ পুশ গাড়ির অফিসে অনুসন্ধান করিয়া কোন ফল হইল না। পার্ব্বতী (বা লীলা) সেখানে যায় নাই বা গাড়ি ভাড়াও করে নাই। তার পর মনুয়া সর্দ্দার ও আরও তিন জন ভীলকে সঙ্গে লইয়া সতীন্দ্র সহরের মধ্যে সম্ভবমত স্থান সকল দেখিয়া কোন সন্ধান না পাইয়া; শেষে ২।৩টী মশাল জ্বালিয়া সহরের বাহিরে অন্বেষণার্থ অগ্রসর হইলেন। সতীন্দ্রের গাড়ি পশ্চাতে আসিতেছে; মনুয়ার পরামর্শ মত সকলে পদব্রজেই চলিয়াছেন।

সহর হইতে বহির্গত হইয়া প্রায় ১॥০ মাইল যাইবার পর, মনুয়া সর্দ্দার হঠাৎ এক স্থানে থমকিয়া দাঁড়াইল এবং দক্ষিণ কর্ণের পশ্চাতে হস্ত দিয়া ক্ষণকাল মাত্র কি শুনিল। তৎপরে একজন ভীলের হস্ত হইতে মশাল কাড়িয়া লইল, ও মশাল সহ আর একজন ভীলকে বলিল "তু হামার সাথে আ।" তৎপরে সতীন্দ্রকে "বাবু, তু ইথা র, কুথাও যাস না।" বলিয়া পথ ছাড়িয়া দুইজনে পার্শ্বস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

সতীন্দ্র কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি সর্দ্দার?" সর্দ্দার ততক্ষণে কোন উত্তর না দিয়া উন্মাদের মত বনমধ্যে ছুটিয়াছে। ভীলগণের শ্রুতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর, নিশ্চয়ই সর্দ্দার কোন না কোন সন্ধান পাইয়া ছুটিয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া সতীন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিল। তদ্ভিন্ন আর উপায়ই বা কি?

পাঁচ সাত মিনিট পরেই বনমধ্য হইতে একটা গোলমাল শোনা গেল। মনুয়া সর্দ্দার কাহাকে কঠোর স্বরে তিরস্কার করিতেছে, তৎপরে অন্য কেহ যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সতীন্দ্রের ইচ্ছা হইতেছে যে, বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যাপার কি দেখে; কিন্তু বন অত্যন্ত দুর্গম ও অন্ধকার, আর একটী মাত্র মশাল সঙ্গে আছে, তাহার আলোকে এরূপ কণ্টকাকীর্ণ বনমধ্যে প্রবেশ করা ভীল ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। সে এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় অদূরে মশালের আলোকে দেখা গেল যে, সর্দ্দার কাহাকে স্কন্ধে লইয়া আসিতেছে এবং তৎপশ্চাতে একজন ভীল আর একজন ভীলকে হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতেছে।

রাস্তায় আসিয়াই সর্দ্দার স্কন্ধ হইতে অচৈতন্য লীলাকে নামাইয়া বলিল "ই লে বাবু, পার্ব্বতী বিটীরে আনিয়েছে। ই বদমাস ধনিয়া বিটা পাছু পাছু যাইয়ে জবরদস্তি করিয়ে জঙ্গলে ধরিয়ে লিয়ে গেল।"

একজন ভীল সত্বর নিকটস্থ ঝরণা হইতে শীতল জল আনিল। মুখে চোখে জল সেচন করিতে করিতে লীলার জ্ঞান সঞ্চার হইল। তাহাকে সযত্নে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া সতীন্দ্র বলিল, "ভয় নেই পার্ব্বতি, এখানে কোন কথায় কায নেই, বাড়ী গিয়ে সব শুনো। খুব ভাল খবর আছে।"

মন্নুয়া জিজ্ঞাসা করিল, ধনিয়াকে কি করিবে? সতীন্দ্র ছাড়িয়া দিতে বলিল। নিতান্ত অনিচ্ছায় সর্দ্দার একটা ধাক্কা দিয়া তাহাকে বলিল, "তু আর হামার সামনে আসিস না,—জানসে মারিয়ে দিবে।"

তৎপরে সতীন্দ্রের আদেশ মত সবাই গাড়িতে উঠিয়া সহরের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল ও রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় বাসায় ফিরিয়া, শান্তিদেবীর নিরুদ্দিষ্টা কন্যাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল।

১০

পর দিন শান্তিদেবী রমেন্দ্র বাবুকে পত্র লিখিতে বসিলেন—

শ্রীচরণ কমলেষু—

প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। দাদা, পার্ব্বতী ভিন্ন অন্য কাহাকেও সতু বিবাহ করিবে না। আমিও সকল দিক ভাবিয়া এ বিবাহে মত দিয়াছি। সতু এক মাসের ছুটির আবেদন করিয়াছে। ছুটি মঞ্জুর হইলেই ৪।৫ দিনের মধ্যে পার্ব্বতী, সতু, মন্নুয়া সর্দ্দার ও সর্দ্দারনী—সকলকে সঙ্গে লইয়া আমি পুরুলিয়ায় ফিরিতেছি। ব্যাপার সমস্ত শুনিলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি এবং বৌদিদি উভয়ে সানন্দে এ বিবাহে মত দিবেন ও এই মাসের মধ্যে সকলে দেশে গিয়া মহা-সমারোহে সতুর বিবাহ দিয়া সুখী হইবেন। ইতি

আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী ভগ্নী—শান্তি।

উকীল ও ব্যারিষ্টার

উকিল। মশায়, কেস্‌টা এরি মধ্যে শেষ কর্‌লেন? বার কয়েক মুলতুবি করালেন না?
বারিষ্টার। কি কর্‌বো বলুন আমার কি অসাধ? কিন্তু ঘটে উঠ্‌লো কই?

হাতী-ধরা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ আচার্য্য চৌধুরী

ভারতীয় বনচারী পশুদের মধ্যে হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহারা অতি প্রাচীন কাল হইতে ধৃত ও পালিত হইয়া, মানবের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট আছে।

আমাদের হিন্দু শাস্ত্রেও মহর্ষি পালকাপ্য প্রণীত গজায়ুর্ব্বেদ-সংহিতায় দেখিতে পাই, সর্ব্বপ্রথমে বিভিন্ন নাম

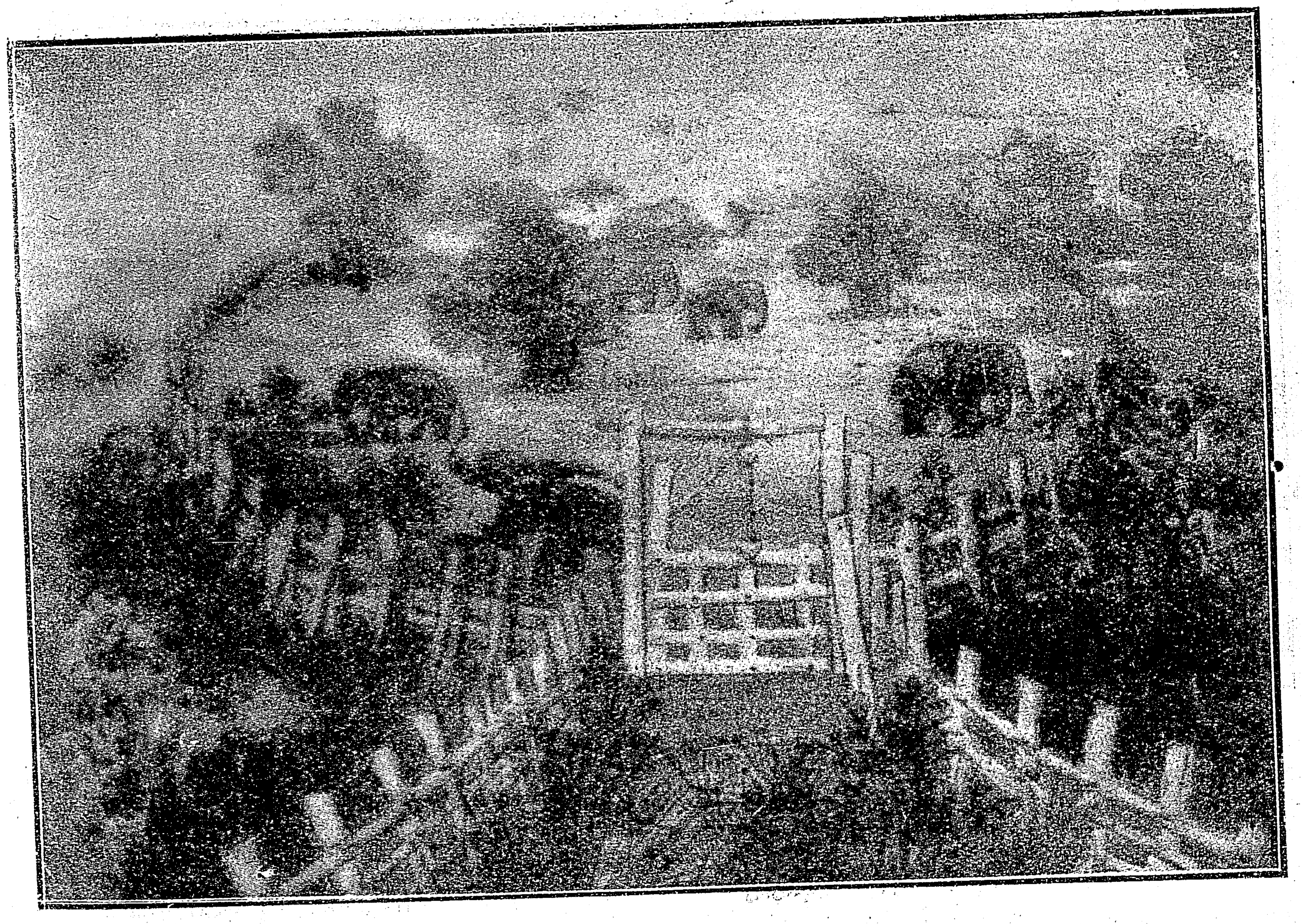

হাতীর কোট—হাতী কোটে পড়িয়াছে

ও গুণযুক্ত সস্ত্রীক আটটি হস্তী, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া, স্রষ্টার আদেশে অষ্ট দিকপাল রূপে ধরণীর রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হয়। তখন ইহারা পক্ষযুক্ত ও ত্রিভুবনে যদৃচ্ছ বিচরণক্ষম ছিল। কালক্রমে ইহাদের বংশধরগণ ব্রহ্মশাপে পক্ষচ্যুত ও মনুষ্যের বশীভূত হইয়া পড়ে।

অঙ্গরাজ রোমপাদ দেবাদিষ্ট হইয়া, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদের উপত্যকার বিশাল অরণ্যে ইহাদিগকে বন্ধন উপযোগী পাশ অর্থাৎ রজ্জু দ্বারা ধৃত করিয়া, স্বদেশে আনয়ন করেন। করিণী-গর্ভসম্ভূত মহর্ষি 'পালকাপ্য' ইহাতে ব্যথিত হইয়া, হস্তীযূথের পদচিহ্ন অনুসরণ করতঃ অঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। অঙ্গরাজের সাদর অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া, মুনিবর হস্তীদিগের শ্রেণী বিভাগ, ইহাদিগকে ধৃত করিবার প্রণালী এবং ইহাদের দ্বারা রাষ্ট্রের ও মনুষ্য-সমাজের কি উপকার সাধিত হইতে পারে, তদ্বিবরণ যথাযথভাবে বর্ণনা করেন।

বর্ত্তমান যুগে যে সব প্রণালীতে হাতী ধরা হয়, তখনও তাহাই প্রচলিত ছিল ; এবং উহাদিগকে 'বারি-বন্ধ', 'বশাবন্ধ', 'অনুগত-বন্ধ', 'আপাত-বন্ধ' ও 'অবপাত-বন্ধ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইত।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে, ইহা পৌরাণিক গল্প বলিয়া সাব্যস্ত হইলেও, হস্তিগণকে ধরিবার কোন অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রণালী এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই। কাজেই গল্পাংশ বাদ দিলেও, হস্তী জাতি যে স্মরণাতীতকাল হইতেই মানবের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ও তাহাদের কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এবং ইহাদের ধরিবার প্রণালীও যে প্রায় অভিন্ন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে ইহারা রাজভোগ্য উপকরণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া, রাষ্ট্র-রক্ষা কার্য্যে নিয়োজিত থাকিত ও রাজ্যের গৌরব বর্দ্ধন করিত। সম্প্রতি রাষ্ট্র-রক্ষার জন্য তত প্রয়োজন না থাকিলেও, অন্যান্য কার্য্যে ইহাদের সমাদরের সম্পূর্ণ লাঘব হয় নাই।

হস্তী পালিত অবস্থায় যেমন সাহসী ও বুদ্ধিমান হয়, বনে ঠিক্ আবার তেমনি ভীরু ও আহাম্মক থাকে। সচরাচর হাতী এত ভীরু ও বোকা বলিয়াই, ইহাদিগকে এত সহজে ধরা যায়। এই জন্যই বোধ হয়, 'হস্তী-মূর্খ' বলিয়া একটা কথা চলিত হইয়া আসিতেছে। তবে কোন কোন হাতী বনেও অত্যন্ত ধূর্ত্ত ও দুর্দ্দান্ত থাকে।

আজকালকার দিনের যাবতীয় sportsএর মধ্যে, হাতী-ধরাও একটী শ্রেষ্ঠ sport বলিয়া আমার বিশ্বাস। সাধারণতঃ চারি উপায়ে হাতী ধরা হইয়া থাকে। কোট বা খেদা, ফাঁসি, পরতালা ও ফাঁদ। মহিশূর প্রভৃতি স্থানে আর এক প্রণালীতে হাতী ধরিয়া থাকে, তাহা গর্ত্তে ফেলিয়া। হাতী যেমন বৃহৎ জানোয়ার, ইহাদের ধরিবার আয়োজনও তেমনি বিরাট।

সাধারণতঃ কার্ত্তিক মাস হইতে পৌষ মাঘ পর্য্যন্ত হাতী ধরিবার প্রশস্ত সময়। তবে ফাল্গুন চৈত্র মাস পর্য্যন্তও যে ধরা না যায়, তাহা নহে। কার্ত্তিক মাসে ধান পাকিতে আরম্ভ করিলে, ইহারা দূর পাহাড় হইতে ধানের লোভে দলে দলে নামিয়া আইসে; এবং স্থূলচর্ম্মা জানোয়ার বলিয়া শীতকালে বেশ শান্ত ভাবে লোকালয়ের আশে পাশে বিচরণ করিয়া, গ্রীষ্মের প্রারম্ভে নিজ বাসস্থানাভিমুখে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। সাধারণতঃ হেমন্ত ও শীত ঋতুতেই নর হাতীগুলির 'মস্তি' (মদক্ষরণ—হস্তীর গণ্ড স্থলের উপরিভাগ হইতে উগ্র গন্ধযুক্ত রস নিঃসরণ) হইয়া থাকে। পুং-হস্তীদের মত মাদী হস্তীগুলির অত অধিক পরিমাণে মদ নিঃসৃত হয় না।

নূতন ধরা হাতীকে তিনটি পোষা হাতী দিয়া বাঁধিয়া লইতেছে

আজকাল কেহ কেহ হাতী খেদা সম্বন্ধে সময়ে সময়ে নানা কথা লেখেন বটে, কিন্তু তাহা কতক জানিয়া, কতক বা লোক মুখে শুনিয়া। সেই সব প্রবন্ধে ভাষার

পারিপাট্য থাকিতে পারে বটে, কিন্তু ঘটনার সত্যতা, অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন, অন্ধকারেই থাকিয়া যায়।

আমি নিজে দুইবার খেদায়, স্বাধীন ত্রিপুরার ও চেলার দুর্গম পাহাড়ের নানা স্থানে কুলিদের সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া, এমন কি জঙ্গলী হাতী যে সব স্থানে বিচরণ করে, তাহাদের গতি বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য, সেই সব স্থানে গিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই যতদূর সম্ভব লিখিতে প্রয়াস পাইব।

সচরাচর হাতী পাহাড়ে দলবদ্ধাবস্থায় থাকে। ৫।৭টা হইতে আরম্ভ করিয়া ১০০।১৫০ পর্য্যন্তও এক এক দলে দেখা যায়। প্রত্যেক দলেই এক একটী করিয়া যূথপতি অর্থাৎ দলাধিপতি থাকে। ইহারা দাঁতাল বা মাক্‌না হয়। [দাঁতলা (Tusker) নর এবং দন্তবিহীন পুং হস্তীকে (male without tusk) মাক্‌না বলে।] দলের মধ্যে প্রধান হওয়া সত্ত্বেও ইহারা ও দলস্থ সকলে, সর্ব্বদাই দলপতির প্রধানা বেগমের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু কখনও অন্য কোন দলের সহিত বিগ্রহ উপস্থিত হইলে, যূথপতিদের তখন প্রাধান্য দেখাইবার সময় উপস্থিত হয়। আরও মজা এই যে, ইহারা পাহাড়ে চরিবার সময় বা তাড়া পাইয়া পলাইবার সময়, দলবদ্ধাবস্থায় গড্ডলিকা প্রবাহের মত, একের পশ্চাতে অন্যগুলি চলিতে থাকে ; কিন্তু চলিতে চলিতে দৈবাধীন কোন হস্তী-শাবক (calf) হঠাৎ পশ্চাতে পড়িয়া গিয়া চীৎকার করিলে, উক্ত শাবকের মাতা তো দূরের কথা, দলস্থ সকল হাতীই যে কোন বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া, সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইবেই। ইহা উহাদের জাতিগত বিশেষত্ব ; এবং অত্যধিক স্বজাতি ও সন্তান-বাৎসল্যের জন্যই তাহারা এইরূপ করিয়া থাকে।

আমার পালিতা হস্তিনীর মধ্যে অনেকে অনেকবার প্রসব করিয়াছে ; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, মাতা ব্যতীত অন্যান্য হাতীও বাচ্চাগুলিকে অত্যন্ত ভালবাসিত। আরও আশ্চর্য্য এই যে, যে সব হস্তিনীর সন্তান হয় নাই, তাহাদের মধ্যেও কোন কোনটী বাচ্চাকে মাতার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া, নিজেই মাতৃস্থান অধিকার করিত। এমনও দেখিয়াছি যে, শাবকগুলি উহাদের এই শ্রেণীর ধাতৃ-মাতার শুষ্ক স্তন্য চুষিতে চুষিতে, তাহাদের বক্ষ হইতে জলবৎ দুগ্ধধারা নিঃসরণ করিত।

ধরা পড়িবার পাঁচ ছয়দিন পরে দুইটি হাতীকে একটি পোষা হাতী দ্বারা টানিয়া লওয়া হইতেছে। তখন দড়ির টানে গলায় ঘা হওয়াতে একটু ঠাণ্ডা হইয়াছে

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চারি উপায়ে হাতী ধরা হয়। তন্মধ্যে দলবদ্ধ হাতীকে কোট (Stocket) করিয়া ধরা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ইহাকেই খেদা বলে। বোধ হয় লোক দিয়া খেদাইয়া (Drive) আনিয়া হাতীগুলিকে কোটে ফেলা হয় বলিয়া, ইহা খেদা নামে অভিহিত হইয়াছে। এই উপায়ে হাতী-ধরা ও তদানুষঙ্গিক যাবতীয় কার্য্যকে খেদা Operation বলে।

অল্পবয়স্ক সাত ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হাতীকে, স্ত্রী-পুরুষ-

নির্ব্বিশেষে ম্যানী ও ম্যানা বলে। ফাঁসি দিয়া ওই জাতীয় হাতীকে সাধারণতঃ ধরা হয়। ইহা অপেক্ষা বড় হাতীকে, ফাঁসি দিয়া ধরা অপেক্ষাকৃত কঠিন। পালিত হাতী দ্বারা দৌড়াইয়া (chase), বড় বড় মোটা দড়ির ফাঁস (ইহাকে দোমা বলে) গলায় ফেলিয়া, ইহাদিগকে ধরা হয়।

বড় বড় নর গুণ্ডার 'মস্তি' হইলে উহাদের মত্ততা জন্মে, ও উহারা হস্তিনীর উপর আসক্ত হইয়া পড়ে। তখন উহাদের প্রকৃতিও ভীষণ হইয়া উঠে। পালিত অবস্থায় সর্ব্বদাই এরূপ দেখা যায়। মস্তি হইলে অনেক সময়, কোন কোন পালিতা হস্তিনীর উপর আসক্ত হইয়া এত উন্মত্ত হইয়া উঠে যে, তখন ইহারা বন ছাড়িয়া, লোকালয় বা পিলখানায়ও আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সময় ঐ হস্তিনীর সাহায্যে ইহাদের পায়ে কাছি বাঁধিয়া, গাছের সঙ্গে আটকাইতে হয়। ইহাকে 'পরতালা' বলে।

যে সব নর গুণ্ডা হাতী অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হয়, তাহাদিগকে মোটা মোটা দড়ির ফাঁদ তৈয়ার করিয়া, পায়ে আট্‌কাইতে হয়। ফাঁসি, পরতালা ও ফাঁদের বিস্তৃত বিবরণ খেদার পরে লিখিত হইবে।

গারো হিলের নানাস্থানে, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, এবং চট্টগ্রামের ও স্বাধীন ত্রিপুরার বিভিন্ন পাহাড়ে, হাতী খেদা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মহিশূর রাজ্যে, ব্রহ্মদেশে এবং উড়িষ্যার কোন কোন করদ রাজ্যেও, প্রায় একই প্রণালীতে খেদা করিয়া হাতী ধরা হয়। বৃটিশ শাসনাধীন স্থান বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া খেদা করিলে, হাতী প্রতি ছোট বড় নির্ব্বিশেষে ১০০৲ টাকা হিসাবে Royalty দিতে হয়। মাতার সহিত শিশু শাবক থাকিলে, ঐ শাবকের জন্য কোন কর দিতে হয় না; বাচ্চা একটু বড় হইলেই কর দিতে হয়। কোন হস্তিনী ধৃত হওয়ার পর প্রসব করিলে, সেই শাবকের জন্যও কর দিতে হয় না। এই সব বন্দোবস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সহিত করিতে হয়।

স্বাধীন ত্রিপুরায় ধৃত হস্তীর বিক্রয়-মূল্যের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ করস্বরূপ ধার্য্য হয়। খেদা বন্দোবস্ত উপলক্ষে বিভিন্ন লোকে ডাক করিয়া সর্ব্বোচ্চ ডাকে (highest bid) ঐ royalty স্থির করিয়া লয়। দোয়ালের তারতম্যানুসারে ডাকেরও তারতম্য হইয়া থাকে; যথা, কোন দোয়াল বিক্রয়-মূল্যের উপর চারি আনা, কোনটা পাঁচ আনা, কোনটা বা ছয় আনা ইত্যাদি। ইহার উপর আবার একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক টাকা deposit রাখিতে হয়; খেদা হইয়া গেলে ঐ টাকা ফেরত পাওয়া যায়। ইহা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, কেহ বন্দোবস্ত লইয়া খেদা না করিলে বা স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটিতে খেদা fail করিলে, ঐ টাকা জব্দ হয়।

গারো পাহাড় পূর্ব্বে সুসঙ্গের রাজাদের অধিকারে, তাঁহাদেরই সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত ছিল। তাঁহারা ঐ পাহাড়ে যদৃচ্ছাক্রমে কোট ফাসি প্রভৃতি দ্বারা হাতী ধরিতেন। কিন্তু কিছু কাল হইল, গবর্ণমেণ্ট দয়াপরবশ হইয়া, এই অযথা কষ্টকর ব্যাপার হইতে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিবার জন্য, নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়া পাহাড়টী খাস করিয়া, তাঁহাদিগকে সেই ঝঞ্চাট হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।

বহুদিন হইতেই খেদা করিয়া হাতী ধরিবার সখ আমার ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় ও আমি একযোগে, স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য হইতে মনু ও দেওগাং নামক দুইটী হাতীর দোয়াল বন্দোবস্ত করিয়া লই। তৎপূর্ব্বেও আর একবার, স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী একত্র, চেলা পাহাড়ে খেদা করিয়াছিলেন। উভয় বারই আমি উপস্থিত থাকিয়া, খেদার যাবতীয় কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করার সুবিধা পাইয়াছিলাম। আমাদের নিজের খেদার সময় কুলিদের সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া, নিজে খেদার কার্য্য তত্ত্বাবধান করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহা কখনও অন্য কোন শিকারে পাই নাই।

পাহাড়ে হাতী দলবদ্ধ হইয়া যেসব স্থানে বিচরণ করে ও যে যে স্থান দিয়া সমভূমিতে নামিয়া আইসে, তাহাকে 'দোয়াল' বলে। স্থানের বা নদীর নামানুসারে এই সকল দোয়ালের নামকরণ হয়; যথা, অমর সাগর, বিলনিয়া, দেওগাং ও মনু ইত্যাদি। এই সব দোয়ালের পূর্ব্ব হইতেই সীমা নির্দ্দিষ্ট করা আছে ও তাহাই বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।

খেদা সাধারণতঃ দুই উপায়ে করা যায়। কেহ কেহ নিজেদের তত্ত্বাবধানে কুলি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াও করিতে পারেন। যাঁহারা ঐ সব হাঙ্গামায় যাইতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা contract দিয়াও করাইতে পারেন। এই সব কাজের জন্য এই জাতীয় contractorএর অভাবও হয় না। Contractorগণ আবার, subcontract দিয়াও খেদার কোন কোন বিভাগের কাজ করাইয়া থাকেন।

গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে, ভূতপূর্ব্ব খেদা-Superintendent Sanderson সাহেবের প্রণালীতে খেদা করিতে হইলে, অন্ততঃ ৩।৪ শত লোকের কমে কুলান হয় না। কিন্তু আর এক প্রণালীতে কম লোক দিয়াও খেদা করা যায়, তাহাকে 'বাংরি খেদা' বলে।

খেদা করণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে প্রথমে 'দোয়াল' বন্দোবস্ত

নূতন হাতীকে বাঁধ খোল করা হইতেছে

লইয়া কুলি ঠিক্ করিতে হয়। ৩।৪ শত কুলি দ্বারা খেদা করিতে হইলে, প্রত্যেক দশজন কুলির উপর একজন করিয়া 'সর্দ্দার' থাকে, তাহাদিগকে 'মাঝি' বলে। খেদা কার্য্যের জন্য চট্টগ্রামের হাট্‌হাজারী, পাটিয়া, সাতকানিয়া প্রভৃতি অনেক স্থানে মাঝি ও কুলি পাওয়া যায়। মাঝিদিগকে সংবাদ দিলেই, তাহারা নিজ নিজ অধীনস্থ কুলি ঠিক করিয়া লয়। Contractor দ্বারাই হউক অথবা নিজেরাই হউক, মাঝিদিগের নিকট হইতে কুলির জন্য agreement লইতে হয়। তাহারাই নিজ নিজ কুলির জন্য দায়ী থাকে।

কুলি সংগ্রহের সময় সর্ব্বাগ্রে আর এক শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন হয়, তাহাদিগকে পাঙ্গালী বলে। প্রথমেই অবস্থানুসারে, ইহাদের ১৫।২০ জনকে নিযুক্ত করিয়া দোয়ালে পাঠাইয়া দিতে হয়। ইহারা ৩।৪ দলে বিভক্ত হইয়া দোয়ালের বিভিন্ন স্থানে হাতীর অনুসন্ধানে চলিয়া যায়। সাধারণ কুলি হইতেই এই শ্রেণীর লোক তৈয়ার হয়। যে সব কুলি বা মাঝি খেদার কার্য্য করিতে করিতে ক্রমে দক্ষতা লাভ করে, তাহারাই পরে এই কার্য্যে উন্নীত হয়। ইহারা দোয়ালের নানা স্থান খুঁজিয়া হাতীর সন্ধান করে। একবার যদি ইহারা হাতীর খোঁজ পায়, তাহা হইলে হাতী আর কিছুতেই ইহাদের চক্ষু এড়াইতে পারে না। ইহারা এমন কৌশলী ও সুদক্ষ যে, হাতীর পায়ের দাগ ও 'লাদি' দৃষ্টে হাতীর উচ্চতা অনুমান করিতে পারে। এমন কি, ইহারা জঙ্গলে হাতীর ডাক শুনিয়াও, দলে কিরূপ উচ্চতার ও কি পরিমাণ হাতী আছে, তাহা আন্দাজ করিয়া লয়। কখনও বা ইহারা হাতীর অতি নিকটে যাইয়া কোন গাছে চড়িয়া দলের হাতীর সংখ্যা নিরূপণ ও গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করে।

অনেক সময় বন্দোবস্ত কৃত স্থানের মধ্যে হাতীর দল না থাকিলে, পাঙ্গালীরা নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে বহুদূর হইতে ইহাদিগকে কৌশলে তাড়াইয়া, নিজেদের বাঞ্ছিত স্থানে লইয়া আইসে। বলা বাহুল্য, ইহা গোপনেই সংঘটিত হয়। এরূপ কার্য্য ধরা পড়িলে ইহাদের শাস্তি হয়। কোন কোন সময় ইহাতে বিপরীত ফলও হইয়া থাকে। কারণ, কখনও কখনও হাতী বন্দোবস্তের সীমার বাহিরে

থাকিয়া নিকটেই ঘুরা ফেরা করে, কিন্তু সীমার মধ্যে আসে না ; হয় তো তাড়া না পাইলে ১০।১৫ দিনের মধ্যেই আসিয়া পড়িতেও পারে, কিন্তু তাড়া পাইয়া আরও দূরে সরিয়া যায়। কাজেই এই সব কার্য্য খুব সুচতুর পাঞ্জালী ছাড়া করিতে পারে না। তাহারা এরূপ কৌশলে 'টোকা' (ধীরে তাড়া দেওয়াকে 'টোকা' দেওয়া বলে) দেয় যে, তাহাতে হাতী দলশুদ্ধ নিজেদের অভীষ্ট স্থানে আসিয়া পড়ে। হাতী ভীত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিলে, অল্প-সময়ের মধ্যেই বহুদূর চলিয়া যায়। ইহাকেই চলিত কথায় বলে, হাতী একবার মুখ বন্ধ করিলে, অনেকদূর না গিয় আর মুখ খোলে না। অর্থাৎ খাওয়া বন্ধ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে, অনেকদূর না গিয়া পুনঃ খাওয়া সুরু করে না। একবার খাইতে সুরু করিলেও আবার তাড়িতাড়ি চলে না।

পাঞ্জালীদিগকে পাঠাইয়া দিয়াই কুলি, মাঝি ও তাহাদের রসদ বা রেসান সহ জমাদার, পাহাড়ের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। পাঞ্জালীদের বিভিন্ন দলের মধ্যেও, পরস্পরের সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদান চলে।

কুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিলেই পাঞ্জালীগণ হাতীর অবস্থান ও গতিবিধি সম্বন্ধে যে সমস্ত সন্ধান পায়, তৎক্ষণাৎ আসিয়া জমাদারকে জানায়। এইখানেই জমাদারের গুণপনা দেখাইবার সময় উপস্থিত হয়। জঙ্গলের যে স্থানে হাতী আছে, সেই স্থানের দুর্গমতা, হাতীর আহার্য্য ও পানীয়ের অবস্থা প্রভৃতি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া, সুবিধা ও সঙ্গত মনে করিলে, ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে ১ কি ১৷৷০ মাইল, কখনও বা ২ মাইল ব্যাস করিয়া, কুলি দ্বারা ঘিরিয়া ফেলে। এইসব কুলিরা এমন দক্ষ যে, সমস্ত বনটী ঘিরিয়া ফেলিতে ইহাদের এক দিনের বেশী সময় লাগে না। ১৫০।২০০ গজ কি আরও দূরে দূরে দুই জন করিয়া কুলি, এক একটী ছোট্ট ছাপরা অর্থাৎ একচালা বাঁধিয়া বসিয়া পড়ে। এইরূপে ঘিরিয়া ফেলা বা বেড় দেওয়াকে 'পাত বেড়' বলে। পাত বেড়ে কুলিরা বসিয়া গিয়াই, প্রত্যেকের সম্মুখে এক একটা আগুনের কুণ্ড করে। রাত্রে প্রতি চালার দুইজন করিয়া জাগিয়া পাহারা দেয়। রাত্রে কোন সময় হাতী বেড়ের নিকটে আসিলে উহাদিগকে তাড়াইবার জন্য বাঁশের ঠক্‌ঠকি বাজাইতে হয়। এক পাব বাঁশ দুই দিকের গিরা সমেত কাটিয়া, তাহার একদিক চিরিয়া ইহা তৈয়ার করে। কোন কোন সময় ঠক্‌ঠকির শব্দে হাতী ভীত না হইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিলে, সকলে মিলিয়া হো হা করিয়া সোরগোল করে, বা আবশ্যক হইলে আগুন জ্বালাইয়া ভয় দেখায় এবং নেহাৎ ঠেকা হইলে বন্দুকের ফাকা আওয়াজও করে।

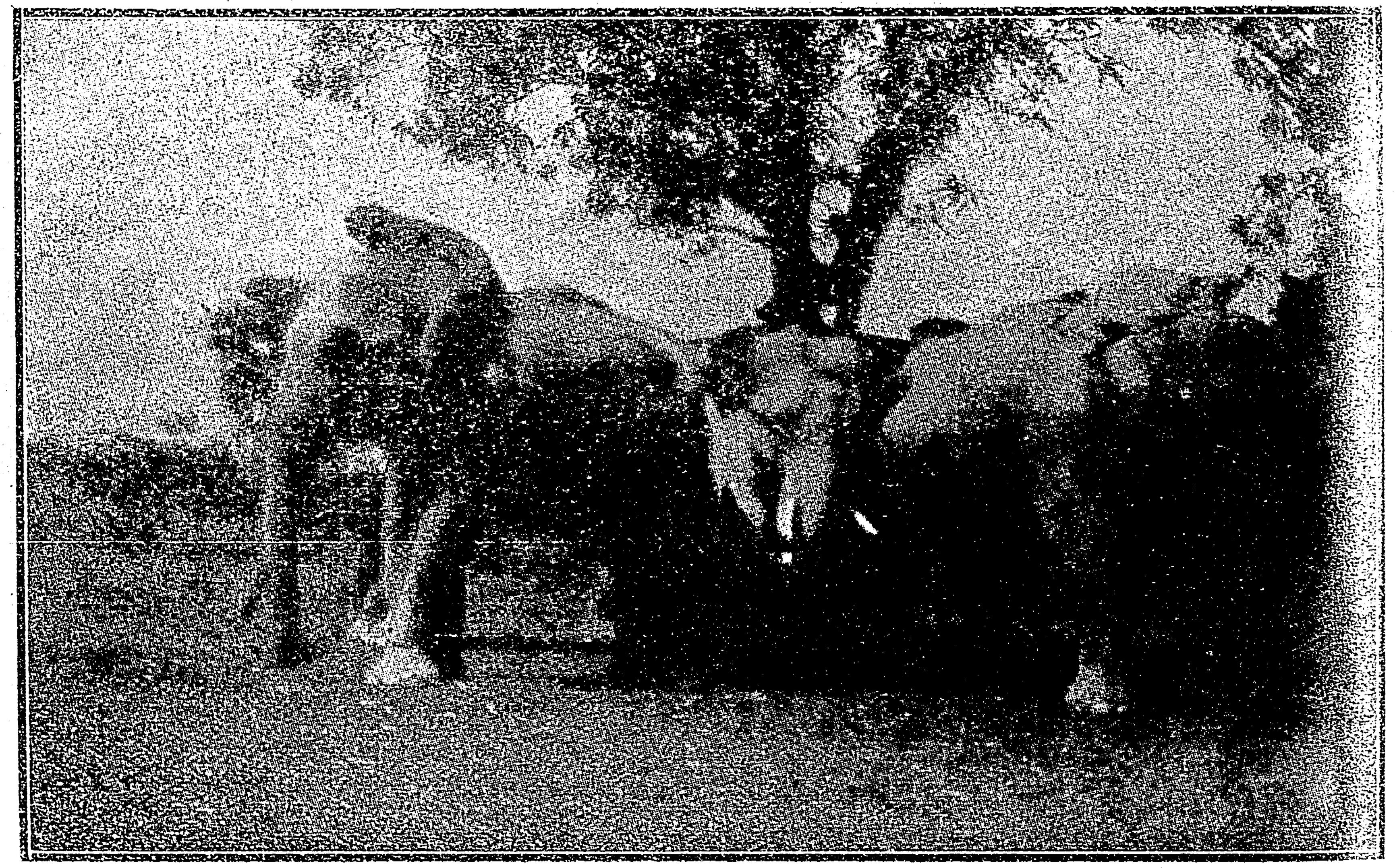

হাতি পরতালা করিয়া বাঁধা হইতেছে। পশ্চাৎ দিক হইতে দাইদার নূতন হাতী বাঁধিতেছে

অনেক সময় হাতী ৮।১০ দিন পরেও, এই সব গোলযোগ ও বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া পাতবেড় ভাঙ্গিয়া চলিয়া যায়। তখন পুনঃ পাঞ্জালী দ্বারা অনুসন্ধান

করাইয়া, ঐ দলের খোঁজ পাওয়া গেলে উহাদের, নচেৎ অপর কোন দলকে বেড় দিতে হয়। প্রধানতঃ ৪টী কারণে হাতী বেড় ভাঙ্গিয়া যায় ;—(১) যদি কুলিরা অসতর্ক থাকে। (২) কোন দলে পূর্ব্বের বেড়-ভাঙ্গা ধূর্ত্ত হাতী থাকিলে, উহাদের সাহায্যেও এইরূপ হয়। (৩) বেড় যদি অনুপযুক্ত স্থানে দেওয়া হয়, যেমন যেস্থানে আহার্য্য আছে অথচ জলাভাব, অথবা আহার্য্য ও পানীয় উভয়েরই অভাব। ২।৪ দিন কষ্ট সহ্য করিয়া শেষে এক দিন বাধা বিঘ্ন না মানিয়া হাতীরা চলিয়া যায়। (৪) বেড় দিয়া যদি কোন কারণে কোট বাঁধিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেড়ের মধ্যের আহার্য্য ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলেও হাতী বেড় ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

কোন কোন সময় এরূপ স্থানে বেড় পড়ে যে, তাহার নিকটবর্ত্তী কোথাও কোট (stocket) তৈয়ার করিবার উপযোগী বৃক্ষাদি পাওয়া যায় না। এমন কি এক মাইল দূর হইতেও বহিয়া আনিতে হয়। ইহাতে কোট প্রস্তুত করিতে ১০।১২ দিন সময় লাগিয়া যায়। পাতবেড়ের নিকটে গাছ পাওয়া গেলে, সচরাচর ৭।৮ দিনের মধ্যেই কোট তৈয়ার হইতে পারে।

বর-বরণের নূতন ছড়া

শ্রীকামিনী রায় বি-এ

ওগো আমার তিনটে পাশ, ওগো আমার বি-এ,
ওগো আমার রক্তচঞ্চু, হরিৎ বরণ টিয়ে,
বিয়ের দাঁড়ে দাঁড়াও, মাথায় সোলার মুকুট দিয়ে।
তোমার তরে স্বর্ণ-শস্য, দেখ না এগিয়ে,
ওগো সাধের টিয়ে!
তোমায় ওরা সাধছে হাজার দশেক টাকা দিয়ে,
ওদের কন্যা উদ্ধার করবে খালি হাতে গিয়ে,
ওদের দেওয়া গোরা-বাজনা আলোর মিছিল নিয়ে,
ওগো বিশ্ব-বিদ্যাজয়ী, বীর-সিংহ বি-এ,
থাক বেঁচে জীয়ে।
ধরায় জন্ম পুরুষ হয়ে, লিখ্‌তে পড়্‌তে শিখে
বিনা পয়সায় পুষ্‌বে কেন নিজের নারীটিকে?
নারী বোঝা—সোজা কথা—তারে ঘাড়ে নিয়ে
কেন যাবে বেগার বইতে?—ছিয়ে, ছিয়ে ছিয়ে!!
আদায় কর সোণা রূপা বস্ত্র অলঙ্কার,
ধাড়্‌লে পাওনা হাল্‌কা হবে নূতন বধূর ভার।
বাপটি তোমার তীক্ষ্ণ চঞ্চু আনুন সানিয়ে
খুঁটে নিতে তাল, তিল, ওগো সোণার টিয়ে,
তাঁর যে ছেলের বিয়ে।

সে কালেতে কিন্‌ত লোকে দাসী ও গোলাম,
তোমরা চতুর বসে হাঁক্‌বে পুরুষত্বের দাম।
এ নয় কেনা, এ নয় বেচা, এ যে, আহা, বিয়ে,
তাজা মাছ ভাজা এ যে মাছের তেল দিয়ে!
এস আমার ননীগোপাল, থালখানি নিয়ে,
এস বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তিলকধারী বি-এ—
হবে তোমার বিয়ে।

এম্‌-এ যদি পড়তে চাও, কিম্বা পি-আর-এস,
সে কয় বছর যত খরচ শ্বশুর দেবে বেশ!
তার মেয়েটির সুখের তরে বাধ্য সে তা দিতে,
এতটুকু লজ্জা যেন কোরো না তা নিতে।
তুমি যেটা পাবে খেটে রেখো তা জমিয়ে,
তোমারও তো ভবিষ্যতে আছে মেয়ের বিয়ে!
কন্যাদায় হতে তুমি মুক্তি দেবে যারে
ঋণের বোঝা একটু না হয় পড়ুক তারই ঘাড়ে;
মরুক না হয় সর্ব্বস্বান্ত; তুমি বউ নিয়ে
সুখে থাক ধনে পুত্রে পুরুষ-রতন বি-এ,—
থাক, থাক, জীয়ে।

গোয়ালিয়র মান-মন্দির

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোয়ালিয়র দুর্গে দেখিবার মত যতগুলি সৌধ আছে, তন্মধ্যে মান-মন্দিরই শ্রেষ্ঠ। শিল্প-বৈভবে, রচনা-নৈপুণ্যে, ইহা সমগ্র সৌধের শীর্ষস্থানীয়। শিল্পকলার শ্রেষ্ঠতা আজও ইহার গায়ে গায়ে ফুটিয়া আছে;—সেই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সবুজ রংয়ের চকচকে পাথরগুলি তেমনি উজ্জ্বল, কৃত্রিম পত্রপুষ্প, বৃক্ষলতা তেমনি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। এক দিন যেখানে কত সুন্দরীর রক্তরাগরঞ্জিত কোমল চরণের ছাপ পড়িত, যে জায়গা এক দিন সাঁঝে সকালে, ধূপ, ধূনা, অগুরু-গন্ধে ভরপুর থাকিত, সেই জায়গা দেখিতে যাইতে হইলে, এখন নাকে রুমাল গুঁজিয়া যাইতে হয়। যেখানে এক দিন কত শত উজ্জ্বল আলোকে চতুর্দ্দিক দিনের ন্যায় আলোকিত থাকিত, সেই জায়গায় এখন ভয়াবহ অন্ধকার নিজের আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছে,—দেখিতে যাইলে ভয়ে গা শিহরিয়া উঠে। সময়ের বিচিত্র গতিতে অসম্ভবও সম্ভবে পরিণত হয়।

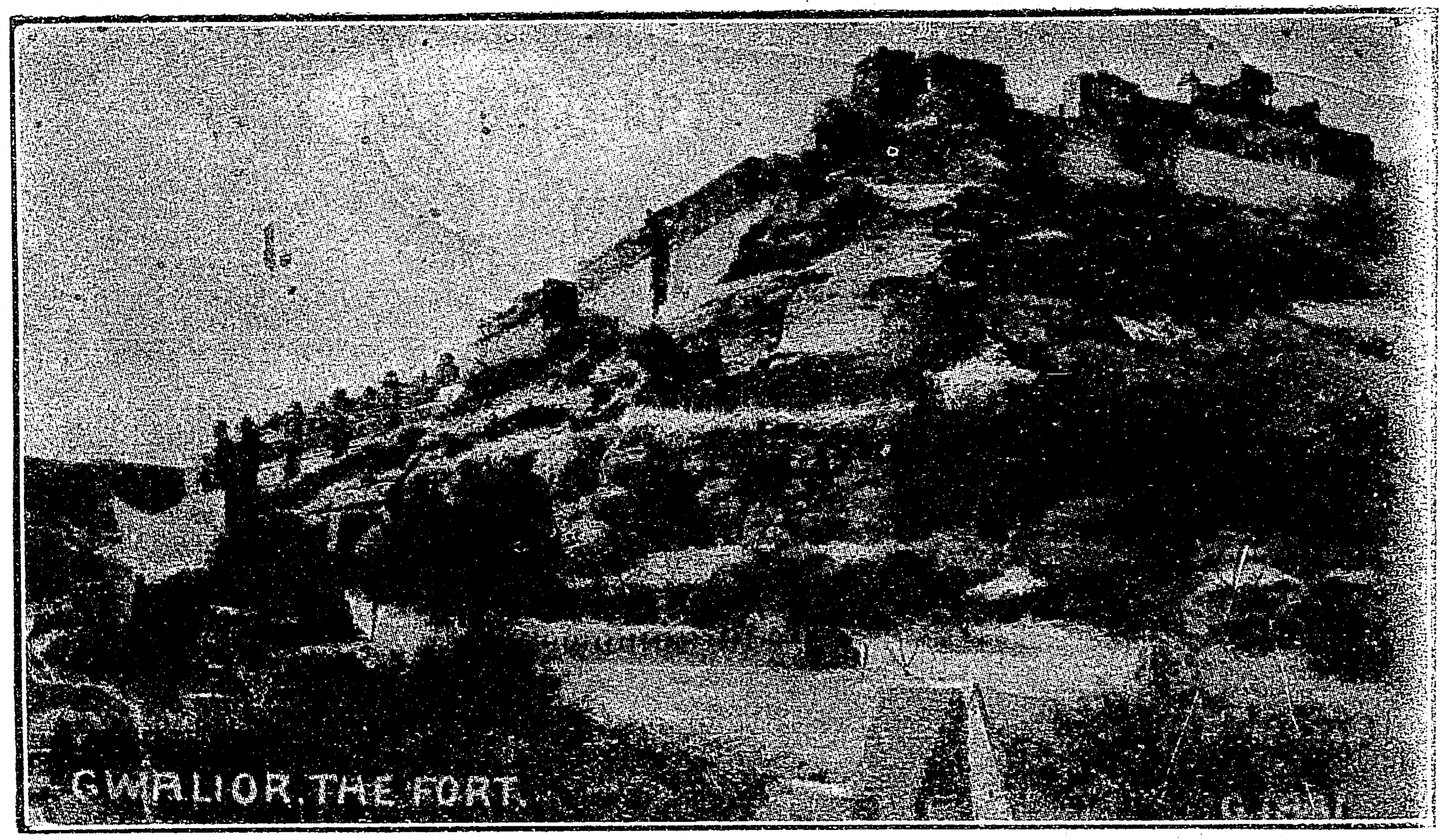

গোয়ালিয়র দুর্গ

গোয়ালিয়র দুর্গের উপর দাঁড়াইলে, অতীতের কত স্মৃতিই না চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। চারিদিকেই ছোট বড় মন্দির, ভগ্নস্তূপ ও সৌধাদি মাথা উঁচু করিয়া, অতীতের ধ্বংসোন্মুখ অস্তিত্বকে বাঁচাইয়া রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। ইহার মধ্যে অতি দূরে, পার্ব্বত্য দুর্গের পশ্চিম প্রান্তে শত ঝড় ঝাপটা সহ্য করিয়া, ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় মান-মন্দিরটি দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালিয়ররাধিপতি রাজা মানসিংহ (আকবরের সেনাপতি মানসিংহ নহেন) ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বিশাল ভবন নির্ম্মাণ করান। ইহার নির্ম্মাণ-প্রণালী ও কারুকার্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মান-মন্দির দেখিতে যাইতে হইলে, গোয়ালিয়র গেট দিয়াই দুর্গে উঠা সুবিধাজনক; কিন্তু যাঁহারা সমগ্র দুর্গ দেখিবেন, তাঁহারা যে পথ দিয়া সুবিধা বিবেচনা করেন, সেই পথে যাইতে পারেন। গোয়ালিয়র গেট দিয়া ক্রমান্বয়ে পাঁচটী ফটক পার হইলে মান-মন্দিরের ঠিক নীচে আসিয়া দাঁড়ান যায়। এখান হইতে চতুর্ভুজ মন্দির দেখিয়া, মাত্র একটি মোড় ঘুরিয়া উপরে উঠিলেই, মান-মন্দিরের ভিতর দিয়া দুর্গে প্রবেশ করা যায়।

দুর্গে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে এই বিশাল সৌধ। ভিতরে যাইবার পথে এক বিরাট প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শে অসংখ্য ধ্বংসোন্মুখ গৃহ সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে। মান-মন্দিরের প্রবেশ-পথের গৃহটী নিতান্ত সাধারণ। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়াই মনে হয়, যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে উপনীত হইলাম। চক-মিলান উঠানের চারিদিকে বিস্তৃত ও নানাপ্রকার কারুকার্য্যখচিত নয়নরঞ্জন কক্ষাবলি।

গোয়ালিয়র হইয়া দুর্গে উঠিলে দূর হইতে মান-মন্দির কোন শিল্পীর দ্বারা চিত্রপটে অঙ্কিত সুদৃশ্য ও পরিষ্কার ছবির মত বোধ হয়; মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে পথিক তাহার প্রতি চাহিয়া থাকে। এই মান-মন্দির দেখিলে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের লহর হৃদয় তোলপাড় করিয়া দেয়। চমকিত হইতে হয় পূর্ব্বকালের আমাদের দেশের শিল্প-চাতুর্য্য দেখিয়া! এই স্থাপত্য-শিল্পের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না; তথাপি বিদেশী ঐতিহাসিক বলিতে কুণ্ঠিত হ'ন না যে,—'পূর্ব্বকালে আমাদের নিজস্ব আর্ট কিছুমাত্র ছিল না,—যা ছিল সব ধার করা'। যেমন একজন ঐতিহাসিক বলেন, "...Their foreign origin is apparent"। এই জনবিরল অরণ্যমধ্যস্থিত দুর্গে যে কোন বিদেশী আসিয়া এই রাজবাটী নির্ম্মাণ-কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন,—তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

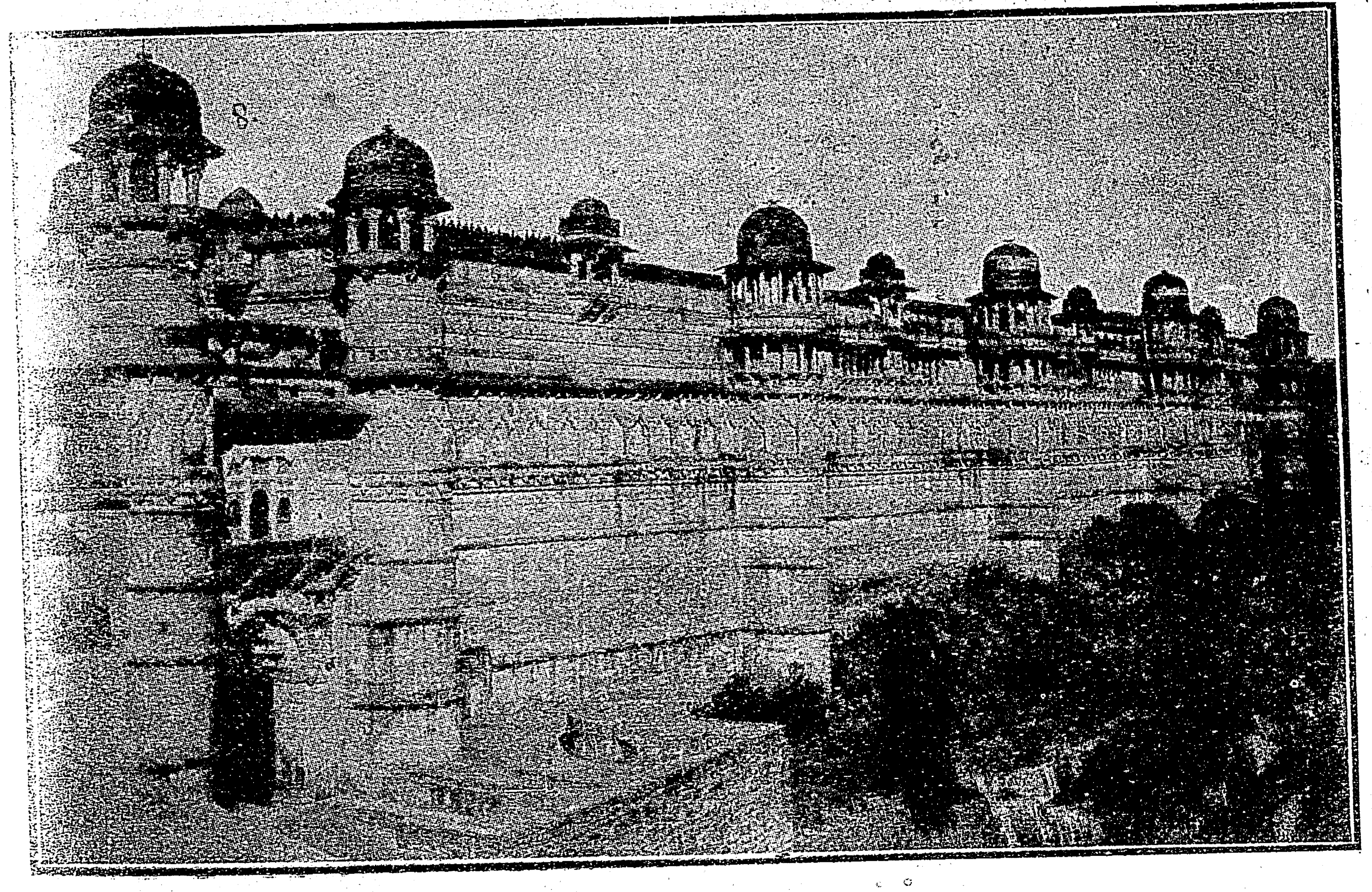

মান মন্দিরের বাহিরের দৃশ্য

মান-মন্দিরের বাহিরের দৃশ্য উপভোগ করিবার সামগ্রী। সবুজ, স্বর্ণ, নীল রংয়ের পাথরে প্রায় সমস্ত প্রাচীর ভরিয়া গিয়াছে,—তাহার উপরেই নানা প্রকারের চিত্র রাজবাটীর সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিয়াছে।—I. Furgusson ইহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—"an unsurpassed charm and elegance"। কত শত বর্ষের ছয় ঋতু ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রাচীরের উজ্জ্বলতা কিংবা সৌন্দর্য্য এখনও হ্রাস হয় নাই, এখনও তাহা সকলের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে। এই সব রং-বেরংয়ের পাথর দেখিয়া রজ্‌লেট (Rouselet) বলিয়া গিয়াছেন, "Nowhere do I remember any architectural design capable of imparting similar lightness to a simple massive wall. The secret of these enamelled tiles have not yet been discovered." বাস্তবিক শিল্পে, সাহিত্যে, সৌন্দর্য্যে, দৃশ্যে, মনুষ্যসমাজে এরূপ বৈচিত্র্য বিশিষ্ট মহলের সহিত একমাত্র আগ্রা প্রাসাদ-দুর্গের তুলনা হইতে পারে। কত সুদূর অতীতের করুণ স্মৃতি ইহার বক্ষে গাঁথা আছে, তার কিছু ঠিক নাই;—এখন অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া

ইহা কালের বিচিত্র লীলা সন্দর্শন করিতেছে, কিন্তু এক-কালে যে ইহার গৌরব ও গরিমার দিন গিয়াছে সেটা ঠিক।

মান-মন্দির দুইভাগে বিভক্ত; একটি বহির্ভাগ ভৃত্যদিগের জন্য; অপরটি ভিতরভাগ—রাজার নিজের থাকিবার স্থান। সোপান সাহায্যে উপরে উঠিয়া প্রথমেই ভিতরে প্রবেশ করিবার দ্বার। ভিতরেও আবার দুইটি অংশ আছে—বহির্বাটীতে রাজার দরবার-গৃহ, পাঠাগার ইত্যাদি, এবং অন্দর মহলে রাণীদিগের থাকিবার স্থান। ইহা এমনি সুন্দর ও সুবিন্যস্ত যে, দেখিয়া শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ফার্গুসন বলিয়াছেন, “Small but with singularly beautiful decorations.”

মান-মন্দিরের বহির্ভাগের পরিসর লম্বায় ৩০০ ফিট ও প্রস্থে ১৬০ ফিট। রাজ-পরিবারের বাসের স্থান ইহার এক-তৃতীয়াংশ। ইহাতে চারিটি তলা আছে—তন্মধ্যে দুইতলা কারুকার্য্যখচিত শিল্প-সৌন্দর্য্যে পূর্ণ ও রাজ-পরিবারবর্গের বাস করিবার উপযুক্ত। কিন্তু নিম্নতল দুইটি পাহাড়ের গা কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। সেইজন্য তাহা অন্ধকারে পরিপূর্ণ। হাওয়া যাইবার পথ আছে বটে, কিন্তু তত্রত্য বায়ু দূষিত। সামান্য আলোকরশ্মি দ্বারা অতি অল্প অন্ধকার বিদূরিত হয়। জানি না পূর্ব্বকালে কিরূপ ছিল; এখন শুধু দেখিতে পাই, মান-মন্দিরে অন্ধকার ও চামচিকে নিজেদের একছত্র সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়াছে।

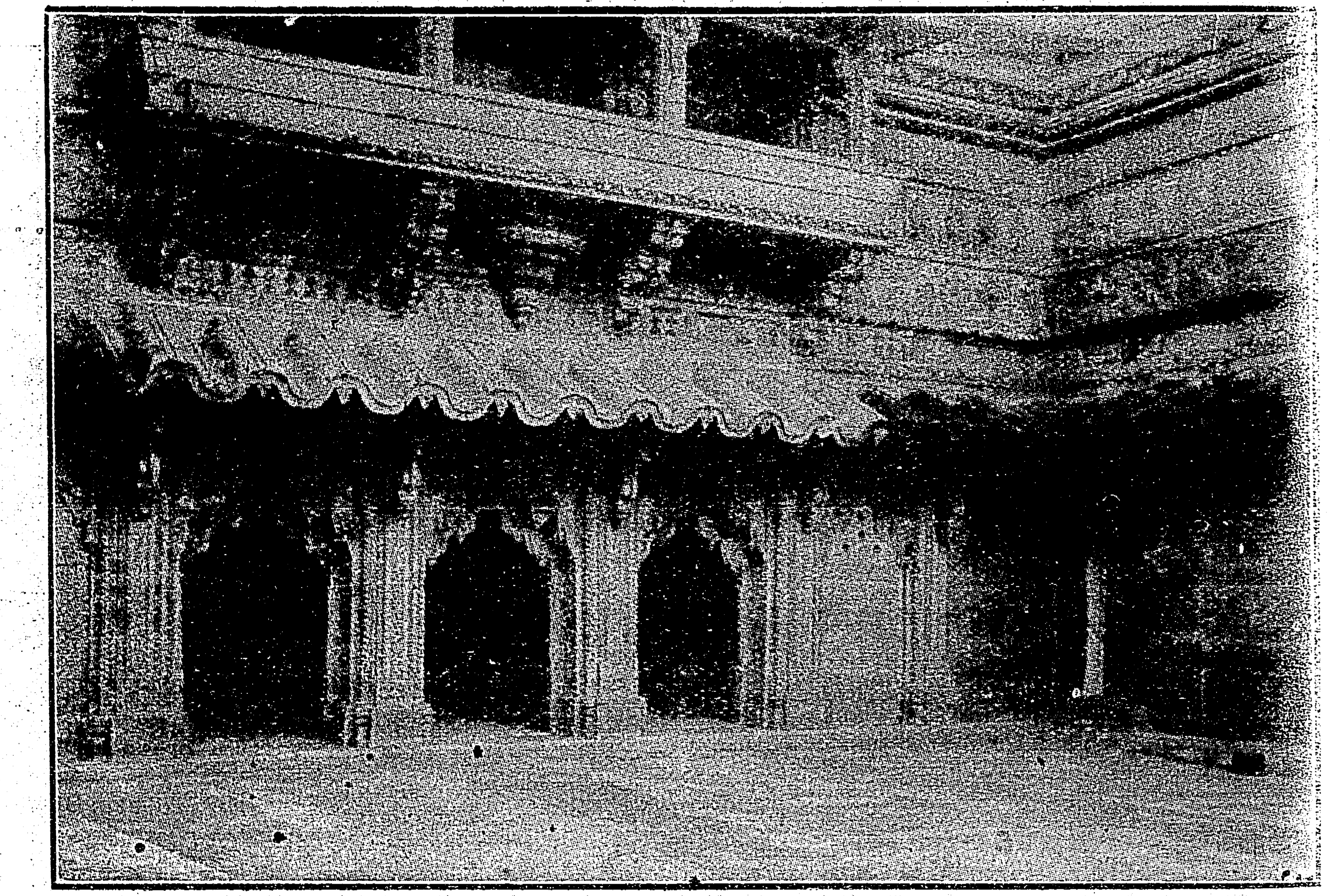

মান-মন্দিরের চক

মান-মন্দিরের পশ্চিমদিকের প্রাচীর দেখিতে অতি চমৎকার। ইহা সমতল ভূমি হইতে প্রায় ১০০ ফিট উচ্চ ও বহুদূর অবধি বিস্তৃত। সর্ব্বশুদ্ধ লম্বে প্রায় ৩০০ ফিট। প্রাচীর গাত্রে শত্রুদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য অতি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত জালতির ঝিলমিলি আছে;—ক্যানিংহামের মতে এই সব শিল্প “...of a singularly beautiful and novel design.” ঝরোখার মাঝে মাঝে এক আকৃতির অনেকগুলি তাঁবার পাতে মোড়া ছাতে ঢাকা গুম্বজ। দক্ষিণদিকের প্রাচীর ১৬০ ফিট লম্বা ও ৬০ ফিট উচ্চ। এই অংশে মাত্র তিনটি গুম্বজ আছে; কিন্তু পশ্চিমাংশের ন্যায় প্রাচীরে জালতির ঝরোখা আছে। প্রত্যেক দুটি গুম্বজের মধ্যস্থলে একটি করিয়া মন্দিরের চূড়ার মত চতুষ্কোণ বিশ্রামের স্থান। পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের প্রাচীর পূর্ব্বকালে নিশ্চয়ই একই ধরণের নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনাদৃত অবস্থায় ছিল বলিয়া, কালের প্রভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। সেই জন্য বাহির হইতে মান-মন্দির দেখিতে যত সুন্দর—ইহার অন্তঃসৌন্দর্য্য আর ততটা নাই।

এই সৌধটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমে প্রবেশ করিয়া একটি সমচতুষ্কোণ উঠান এবং তাহার চতুর্দ্দিকে ঘর। এই উঠানটি ৩৩ বর্গফিট। ইহার পূর্ব্বদিকের ঘরটি সব চেয়ে বড় এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকের ঘরগুলি সামান্য ছোট। যিনি মান-মন্দিরের রক্ষী, তাঁহার মুখে শুনিতে পাই—বড় ঘরটি পূজার স্থান এবং অপর দুইটির একটি দরবার-গৃহ। দ্বিতীয় ভাগ—ভিতরের উঠান—৩৭ বর্গফিট। ইহার পশ্চিমদিকের ঘরটি শুধু ২০ বর্গফিট এবং অপরগুলি সব ছোট। পূর্ব্বদিকের ঘরে যে ঝিলমিলি আছে তাহা হইতে রাজ পরিবারের স্ত্রীলোকগণ বহির্দৃশ্য দেখিতেন। উঠান দুইটি যতই ক্ষুদ্র হোক—দেখিতে অতি সুন্দর ও সুদৃশ্য। এখানে আমরা উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন দেখিতে পাই। দরবার গৃহটীর নির্ম্মাণ প্রণালী অত্যন্ত সুন্দর। তিন কোণা বৃহৎ পাথরের টালি দিয়া ছাদটি এমনি সুন্দরভাবে নির্ম্মিত যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। আগ্রার প্রাসাদ দুর্গে ঠিক এইরূপ শিল্প সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমে প্রবেশ করিয়াই যে কক্ষটী পাওয়া যায়, তাহার সম্বন্ধে মান-মন্দিরের গাইড বা প্রদর্শক বলেন যে, এই কক্ষটী রাজা মানসিংহের পূজার ঘর ছিল। কিন্তু এ কথা বিশ্বাস হয় না,—কক্ষটীর বুকে তাহার কোন চিহ্ন নাই। গাইড প্রভু অনর্গল বক্তৃতা দিয়া মান-মন্দিরের সম্বন্ধে যাহা কিছু বুঝাইবার চেষ্টা করেন, তাহার আগাগোড়াই ভুল। “এই কক্ষে যোধাবাই ঝুলন ঝুলিতেন”—ইত্যাদি পাগলের প্রলাপ। বেচারীর ধারণা—গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ ও অম্বরাধিপ ভগবান দাসের পুত্র, আকবর-সেনাপতি মানসিংহ একই ব্যক্তি। উভয়ের স্থিতিকাল সম্বন্ধেও বেচারী এক বিষম ভুল করিয়া বসিয়া আছে;—কোথায় খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী, কোথায় সপ্তদশ শতাব্দী—এটুকু স্মরণ রাখা, সে কিছুমাত্র আবশ্যক বোধ করে নাই। উক্ত কক্ষটি সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, উহা কাছারী কক্ষ অর্থাৎ খাজাঞ্চী, আমলা গোমস্তা ইত্যাদি ব্যক্তিগণের জন্য ছিল। এই কক্ষের ভিত্তিগাত্র নানা প্রকার লতাপাতা ও কারুকার্য্যখচিত,—দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই লতাপাতার মধ্যে মধ্যে রং বেরংয়ের পাথর পূর্ব্বকালে বসান ছিল, এখন সেগুলি নাই। গাইড বলেন, ইহার মধ্যে হীরা-মতি ইত্যাদি ছিল, ঔরংজেব লইয়া গিয়াছেন। বাজে কথা!

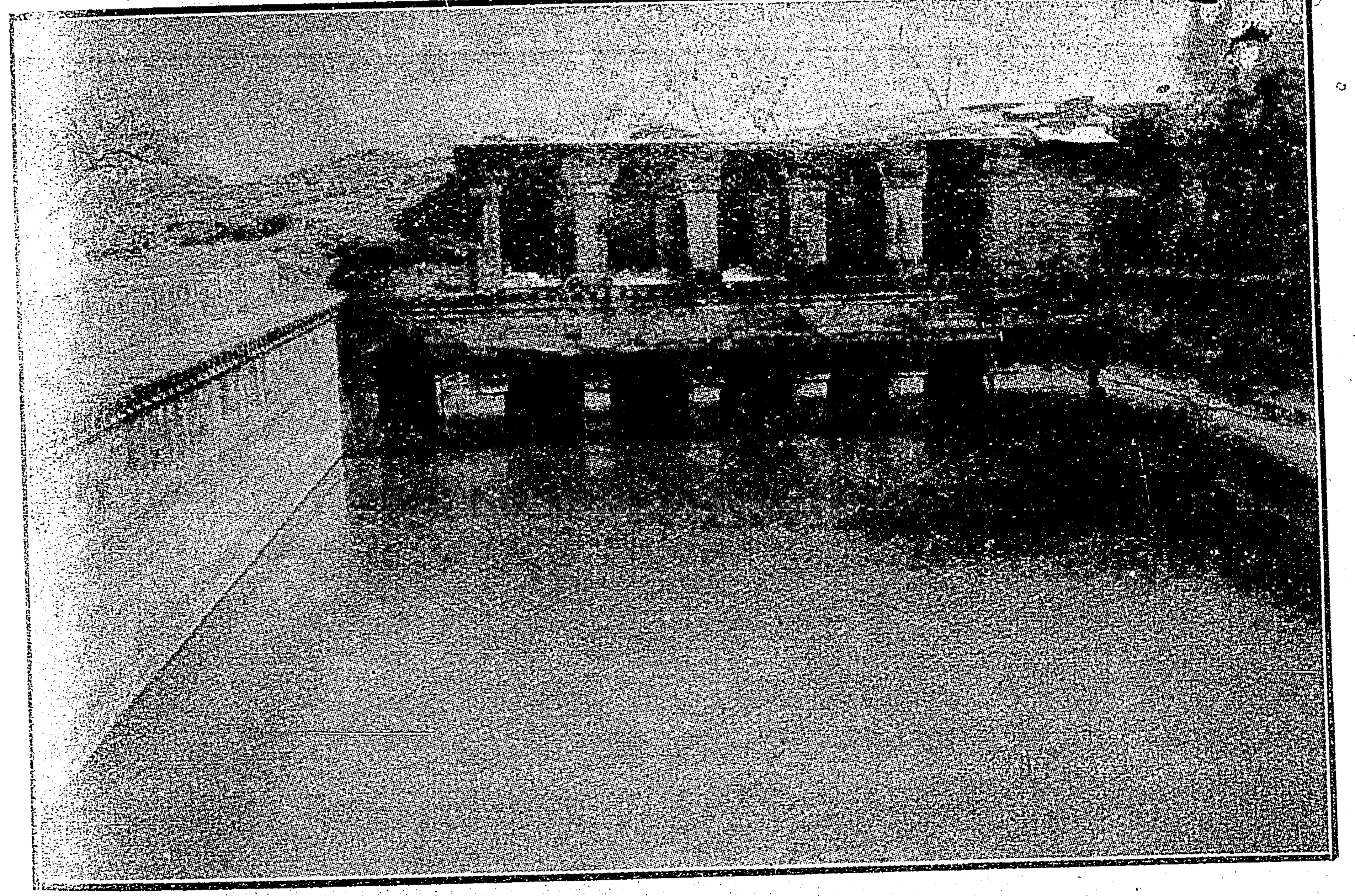

রাণীতাল

দুইটী উঠানেরই শিল্প দেখিবার যোগ্য! কার্নিসের

প্রান্তগুলিতে অনেক প্রকারের খোদাই চিত্র রহিয়াছে। স্তম্ভে সিংহ, মনুষ্য, হস্তী, প্রভৃতির নানারূপ খোদিত মূর্ত্তি আছে। সব মূর্ত্তিগুলিই নানারূপ লতাপাতার মধ্যে আঁকা। এই সব কারুকার্য্যময় স্তম্ভ ও কার্নিস শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় দিতেছে।

নিম্নতলায় যাইতে হইলে সঙ্গে একজন পথ-প্রদর্শক ও একটী উজ্জ্বল হাত-লণ্ঠনের অত্যন্ত প্রয়োজন। ক্ষুদ্র সোপান অবলম্বন পূর্ব্বক নিম্নে অবতরণ করিলে প্রথমে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না—এরূপ ভয়াবহ অন্ধকার। এই গর্ভগৃহের মধ্যস্থলে একটী চতুষ্কোণ কুণ্ড আছে—কিংবদন্তি আছে রাজা মানের সময় প্রতিদিন ইহাতে কেশর গোলা হইত। এই নিম্নতলার জন্য মান-মন্দিরকে অনেকেই "ভুলভুলৈয়াঁ" নামে অভিহিত করেন।

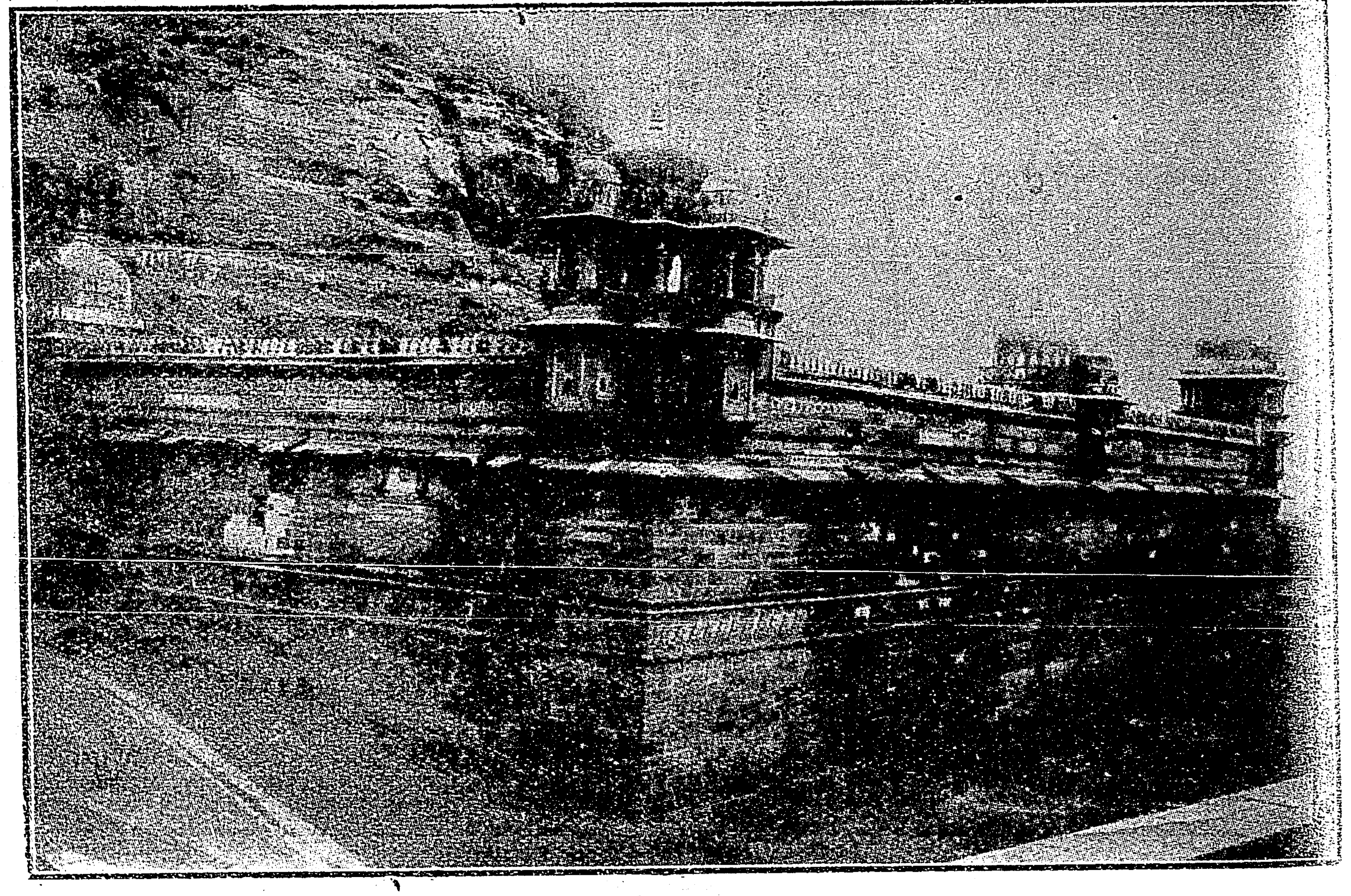

গুর্জ্জরী-মহল

১৫২৭ খ্রীঃ মান-মন্দিরে বাদশাহ বাবর (Baber) পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি সে সময় অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন; কিন্তু তিনি দুর্গের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া মান-মন্দিরের যে বর্ণনা নিজের ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন—সেই অমূল্য আলেখ্য এখনও বর্ত্তমান। তাঁহার বিবৃত অনেক শিল্প কালচক্রের পেষণে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। আছে শুধু মান-মন্দির; 'যেনতেন-প্রকারেন' রাজা মান-সিংহের স্মৃতি সজাগ রাখিয়াছে। এক স্থানে তিনি এই সব 'মন্দিরের' প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন ""They are singularly beautiful palaces......The palace of Mansing is more lofty and splendid," বাদশাহ আকবরও এই দুর্গে নিজের পদধুলি দিয়াছিলেন।

এই মান-মন্দিরের সহিত চিরদিনের জন্য যাঁহার নাম গোয়ালিয়র দুর্গে গাঁথা রহিল, সেই রাজা মানসিংহ কল্যাণ-মলের পুত্র ছিলেন। কল্যাণমলের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজা মান দুর্গের রাজ-সিংহাসন ঊষার তরুণ কিরণের ন্যায় সমুজ্জ্বল করেন। তিনি মাত্র ত্রিশ বৎসর কাল এই বসুন্ধরায় রাজ্যসুখ উপভোগ করিয়াছিলেন—কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যে যে সব গৌরববর্দ্ধক শিল্প-নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন—তাহা তাঁহার নাম চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার আর একটী কীর্ত্তি স্তম্ভ গুর্জ্জরী-মহল অথবা গুজরাণী-মহল। ইহার সহিত একটী কৌতুক পূর্ণ কাহিনী প্রচলিত আছে। রাজা মানসিংহ মৃগয়া অতি ভালবাসিতেন। এক দিন তিনি মৃগয়া করিতে করিতে বহুদূর একটা পল্লীতে পৌঁছেন। সেখানে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে—অকস্মাৎ এক যুবতীকে জলের কলস কক্ষে দেখিতে পান। তাহার রূপ-যৌবন শ্রাবণের

ধারার মত উছলিয়া পড়িতেছিল—তিনি মুগ্ধ হইয়া তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করেন;—গুর্জ্জরী যুবতী—বলিলেন, "যদি এই পুকুরটী খনন করিয়া তোমার রাজধানী অবধি ইহার জল লইয়া যাইতে পার—তা হইলে আমি বিদায় করিতে প্রস্তুত।" রাজা মান সম্মত হইলেন—সেই নদী খনন করিয়া দুর্গের পদতল অবধি লইয়া আসিলেন। বর্ত্তমান মতি ঝিলই পুরাকালের সেই নদী। এই প্রিয়তমা রাজ্ঞীর জন্য এই ভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল—সেজন্য তাহার নাম গুর্জ্জরী-মহল। সম্প্রতি উহা 'Archeological Museum'এ পরিণত হইয়াছে।

রাজা মানের সিংহাসনে আসীন হইবার অনতিকাল পরেই বহলোল লোদী দুর্গের নিকট আসিয়া নিজের শিবির স্থাপিত করেন এবং রাজা মানকে উপঢৌকন সহ শিবিরে উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। আত্মাভিমানী রাজা মান স্বয়ং না গিয়া নানারূপ রত্নালঙ্কার পাঠাইয়া দেন। এই অপমানের রেখা বহলোল লোদীর পুত্র সিকন্দরের মনে গাঢ়রূপে অঙ্কিত রহিল। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সৈন্য সহ আসিয়া দুর্গ আক্রমণ করেন। সেই বিপুল সেনার গতি রোধ করা অসম্ভব দেখিয়া রাজা আবার উপঢৌকন পাঠাইয়া দুর্গটি লোদীর কবল হইতে মুক্ত করেন।

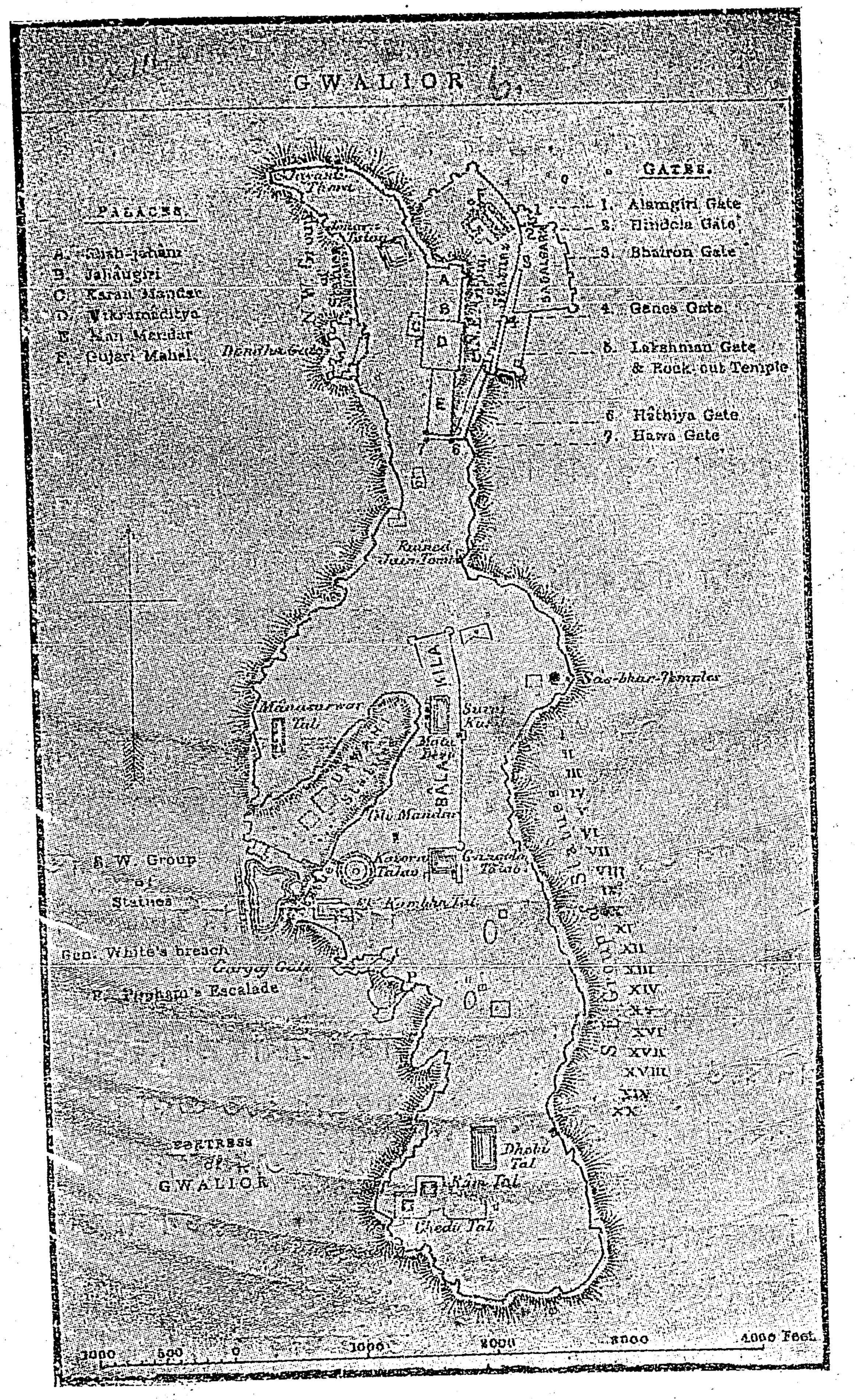

গোয়ালিয়র দুর্গের মানচিত্র

রাজা মানসিংহ সুন্দর কারুকার্য্যখচিত মন্দির ও অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য চির প্রসিদ্ধ। ভাস্কর্য্যও তাঁহার সময়ে অতীব উচ্চস্থানারূঢ় ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার নির্ম্মিত মূর্ত্তি সকল কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে—অতি অল্প নিদর্শনই আমরা আজকাল দেখিতে পাই। বাবর নিজের বর্ণনায় মান-সিংহের খোদাই মূর্ত্তির প্রশংসা করিয়াছেন। রাজা মান স্বয়ং একজন কবি ছিলেন এবং অন্যান্য বিদ্বানদিগকে উপযুক্ত পুরস্কার দিতেন। তিনি অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ছিলেন। গরীবকে দান করিবার জন্য তাঁহার ভাণ্ডার সর্ব্বদা মুক্ত থাকিত। তিনি অতি নিপুণভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন,—প্রজাদের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজা অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হন। ফজলআলির মতে রাজা মান,—"was an excellent ruler." সেরেস্তা বলেন, "A Prince of great valour and capacity."

অপূর্ব্ব সৌভ্রাত্র

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

'প্রাণাধিক ভাই, চাও চোখ মেলে,   বারেক কলম ধরি,
আমি দাদা তোর এনেছি কাগজ,   দাও নাম সই করি।'
দারুণ বিকারে ঘুমায় বিঘোরে   যুবা এক সুকুমার,
পাশেতে বসিয়া কাঁদিছে তরুণী   প্রিয়তম প্রিয়া তার।

ডাক্তার, হায়, দিয়াছে জবাব, কোনো আশা আর নাই,—
অবকাশ লয়ে এসেছে দেখিতে   স্নেহশীল বড় ভাই।
দুটী সহোদর—একটী বোঁটায়   দুটী ফুল ছিল ফুটি,
একটী তাহার ঝলসিয়া গেছে,   এখনি পড়িবে টুটি।

গ্রামে ঘরে ঘরে চড়ে নাক হাঁড়ি, সব চোখে আঁখি নীর ;
বড় ভাই শুধু দারুণ বিপদে   সাধুর মতন থির।
কোনো আশা নাই বলেছে সকলে—কাঁদিয়া কি ফল আছে?
কাগজ কিনিয়া অতি তাড়াতাড়ি   গেল উকীলের কাছে।

জীবন মরণ নিয়তির গতি—পুরানো কাপড় ছাড়া,
অবুঝ মানব পারে না বুঝিতে,   হয় রে আত্মহারা!
গলেতে ধরিয়া তুলসীর মালা,   শিরেতে ধরিয়া টিকি,
নশ্বের লাগি শোক করা, হায়,   মহাপাপ নয় এ কি?

বাঁচিবে য'দিন, রাখিতে হইবে   বিষয়-আশয় বুঝি—
নয়ন মুদিলে সকলি আঁধার,   হরিনাম শুধু পুঁজি।
পরম ভক্ত বড় ভাই, আহা,   একাকী বুঝায় সবে,—
মুখের বেদনা কত যে গভীর,   ক'জন বুঝিবে ভবে।

ঘরের লক্ষ্মী আদরের ধন   দুখিনী ভ্রাতৃজায়া,
বাপের বাড়ীতে যাইতে দিব না   কাটায়ে মোদের মায়া।
পিতা যে তাঁহার বিষম বিষয়ী,—ভ্রাতা যদি যায় মরে,
ক্ষুদ্র বিষয় ছাড়িয়া দিবে না,   আগে লবে ভাগ করে।

কাজেই অগ্রে সাবধান হওয়া   বিজ্ঞ জনের কাজ,—
ভ্রাতার সহিটা করাইয়া রাখি,   উহাতে নাহিক লাজ।
প্রাণের সোদর—তাহার রমণী,   থাকিতে বিষয় মোর,
যাবে কি উপস—তাহারি যে সব,—ঝরে পড়ে আঁখি লোর।

মুমূর্ষু ভাই সহি করে দিল,   সাক্ষী হইল কেহ ;
বাক্সে রাখিয়া নূতন দলিল   উথলে ভ্রাতার স্নেহ।
কাঁদিয়া লুটায়—ভাইরে, ভাইরে, আমি দাদা আগে মরি,—
তোমা-হারা হয়ে শূন্য জগতে   রহিব কেমন করি।

ভবনের কোণে পাষাণ-প্রতিমা   এখনো বোঝেনি কিছু,
স্বামীর জীবন ভিক্ষা মাগিছে   মাথাটী করিয়া নীচু।
হরির শ্রবণে তাহার মিনতি   পশিতে হল না দেরী ;
বিকারের ঘোর দুদিনে কাটিল,   চেতনা আসিল ফিরি।

সতীর সেবায় ভাল হলো স্বামী,   আবার উঠিল বসি,—
রাহুগ্রাস হতে প্রকাশ পাইল   যেন নবোদিত শশী।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দলিলের কথা   শুনিল যখন ভ্রাতা,
একবার মুখে ফুটল না তার   একটীও কোন কথা।

ত্যজি ঘরবাড়ী গেল সে বিদেশে—ব্যবসায়ে হল ধনী ;
সেদিন হইতে হইল প্রবাসী   গ্রামের নয়নমণি।
লেখে বড় ভাই—গ্রামের বিষয়   এসো লবে ভাগ করি,
কহিল অনুজ—'দিনু আপনাকে   নিজেই কলম ধরি।

একই জীবনে নূতন জনম   লভিয়াছি আমি দাদা,
ও পোড়া জমির পূরা লও তুমি—চাহি না ক' আমি আধা।'

মহীশূর-ভ্রমণ

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি-ই

পূর্ব্বকার এক প্রস্তাবে দিগম্বর জৈনদিগের মহাতীর্থ শ্রবণ-বেলগোলা গমনের কথা বলিয়াছি। তথা হইতে আমি বেলুড় যাইবার জন্য যাত্রা করি। বেলুড়ের নাম শুনিলেই বঙ্গবাসীর মনে হাওড়া জেলাস্থিত বেলুড় গ্রাম ও তৎস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত মঠের কথা স্বতই স্মরণ-পথে উদিত হয় ; আমারও হইত। বেলুড় নামটির ব্যুৎপত্তি হৈসল-নরপতিদিগের রাজধানী বেলুহুর হইতে। খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভে মহারাজ বল্লালের রাজধানী ছিল বেলুহুর বা বেলুড়ে। এ সব কথা ক্রমশঃ বলিতেছি।

শ্রবণবেলগোলায় জৈনদিগের যেরূপ আতিথেয়তা দেখিয়াছিলাম, সেরূপ এ যুগে বিরল ; এত দিন পরেও তাহার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। এখনও যখন আমাদের হিন্দু, তথা বঙ্গসমাজের আমূল পরিবর্ত্তনের কথা মনে মনে ভাবি, তখন শ্রবণবেলগোলার জৈনদিগের সদাশয়তার বিষয় চিন্তা করিয়া মন আবার আশাপূর্ণ হইয়া উঠে। ইঁহাদের সমাজ ক্ষুদ্র হইলেও, ইঁহারা প্রাচীন ভারতীয় আচার, ব্যবহার, সভ্যতা ও মহানুভবতা যেরূপ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে ইঁহাদের আদর্শ যদি আবার সংক্রামিত হইয়া অনুসৃত হয়, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় অভ্যুত্থানের অনেক সুবিধা হইতে পারে। এ কথা-গুলি বলিলাম এইজন্য যে, আমরা সকলেই জাতীয় উন্নতির জন্য অল্প-বিস্তর চেষ্টা করিতেছি ; কিন্তু যাহার উন্নতি বিধান করিব, তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গণিতের সীমা-বিন্দুতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এইজন্য প্রথমে সেইটির অর্থাৎ জাতীয় প্রাণটির সংরক্ষণের প্রয়োজন।

শ্রবণবেলগোলা হইতে যাত্রা করিবার সময় আমার মন বিশেষ ভাবে অভিভূত ও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, সে কথা বলিয়াছি। এখানে অনেক কষ্টে একখানি গোযান ভাড়া করিয়াছিলাম ; কথা ছিল যে একেবারে বনভর রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবে। গোযান সহজে না মিলিবার কারণ এই যে, পথে হাসান নগরে প্লেগ হইতেছিল। এখানকার ডাক বাঙ্গলোতে বিশ্রাম করিয়া বেলুড় যাইতে হইবে। হাসানের শকটে আরোহণ করিয়া বনভর যাইলে, প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা বলিয়া, শ্রবণবেলগোলার শকট বরাবর গন্তব্য স্থানে যাইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইল। আমি যাঁহার অতিথি ছিলাম, শকট-চালক তাঁহার প্রজা বলিয়া অতদূর যাইতে স্বীকৃত হইল ; নচেৎ কিছুতেই যাইতে চাহিত না ; এবং প্লেগের ভয়েও হাসানে কোন শকটচালক যাইতে স্বীকৃত হয় নাই।

এবার হাসানের কথা বলিব। ইহা মহীশূর রাজ্যের জেলা বিশেষ ; এই জেলার প্রধান সহরের নামও হাসান। মহীশূর জেলা সমূহের মধ্যে হাসান ও কাদুর তামাক ও কফি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ; এবং যে "বাড়াপা" (Talc) প্রস্তরের স্তম্ভোৎকীর্ণ কারুকার্য্য প্রাচীন মহীশূর স্থাপত্য-শিল্পে উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে, তাহা এই হাসানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

হাসান সহরে পৌঁছিতে প্রাতে প্রায় ৮টা বাজিয়া গেল। পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যায় গোযানে আরোহণ করিয়াছিলাম। শকট সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। ডাক্ বাঙ্গলোর কাছে দেখিলাম যে, একদল ব্যাণ্ড সমর-সঙ্গীত বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া গেল। এ সময় (১৯১৫) য়ুরোপে মহাসমর চলিতেছিল বলিয়া সর্ব্ব স্থানেই সৈন্য সংগ্রহের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। এ আয়োজন অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। মনে আছে, ইহার তিন বৎসর পরে, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর পরিভ্রমণ কালে, সৈন্য সংগ্রহের যে বিরাট আয়োজন ও ব্যবস্থা দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হয় ভারতের সাহায্য না পাইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিষম বিপদে পড়িতে হইত, এবং ভাগ্য-বিধাতা যুদ্ধের ফল অন্য ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেন। মহীশূর-রাজও এ বিষয়ে ব্রিটিশ-রাজকে বিশেষ সাহায্য করিয়া-ছিলেন। আমার যতদূর স্মরণ আছে, পূর্ব্বোক্ত সমর-সঙ্গীত সৈন্য সংগ্রহের আয়োজন বিশেষ। বাঙ্গলোর অদূরেই

জেলার ডেপুটি কমিশনার বা প্রধান হাকিম মহাশয়ের বাসস্থান। বেশ সুন্দর উদ্যানের মধ্যে তাঁহার আবাসটি অবস্থিত।

বাঙ্গ্‌লোটি বেশ প্রশস্ত হইলেও, আমার কাছে একেবারেই মনোজ্ঞ বোধ হইতেছিল না; বাটীটি পুরাতন; অনেক দিন সংস্কার করা নাই। চতুঃপার্শ্বের দৃশ্যটিও তেমন হৃদয়গ্রাহী নহে। এই সব নানা কারণে আমার একটু অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। বাটীর পুরাতনত্বে তেমন কিছু আসিয়া যায় না; বিশেষতঃ আমার অস্থি-মজ্জায় প্রাচীনত্ব ওতঃপ্রোত ভাবে বিদ্যমান,—পুরাতনের মন্ত্র-কুহকে আমি চিরকালই মুগ্ধ। কিন্তু অবস্থা বিশেষে পুরাতন মনে বিদ্রোহের সঞ্চার করে; আমারও ঠিক সেইরূপ হইতেছিল। ভাঙ্গা জানালা, অগোছালো বাথরুম্, রন্ধন করিবার বেবন্দোবস্ত, জলের কষ্ট প্রভৃতি বিশেষ বাঞ্ছনীয় নহে—বিশেষতঃ, অনেক দিন হইতে মুসাফের রূপে বেড়াইবার অবস্থায়। আমার দেহযষ্টি একটু ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল; এ অবস্থায় একটু বিশ্রাম বা স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজিতেছিলাম। এক একটি বাঙ্গ্‌লো এত সুন্দর দেখিয়াছি যে, সেখানে সারাজীবন কাটাইলেও বোধ হয় পরিতৃপ্তির সীমায় পঁহুছিতে পারা যায় না। যাক্ সে কথা। এখানে আসিয়া ভৃত্য মহাশয়ও একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কয়েক দিন জৈনদিগের আশ্রয়ে অপর্য্যাপ্ত সিধার উপর নির্ভর করিয়া বেশ সুখে দিন কাটিতেছিল। এখানে আসিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হইল। স্নানাহার করিয়া একটু সামান্য অধ্যয়ন ও বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণেই বেলুড়ের পথে যাত্রা করিলাম। এখানে আসিয়া শুনা গেল যে, প্লেগের তত প্রকোপ নাই। সেই জন্য শ্রবণবেলগোলার শকট-চালককে বিদায় দিয়া বেলুড়, হানেবিড হইয়া বনভর ষ্টেশনে পঁহুছিয়া দিবার জন্য আর একখানি শকট ভাড়া করিলাম।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া চলিয়া শকট যখন বেলুড়ে পঁহুছিল, (১২-৯-১৫) তখনও ভাল করিয়া প্রভাত হয় নাই। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই বলিলেও চলে। আমি ও আমার ভৃত্যটি একখানি শকটে জিনিষপত্র সহ ২৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। ভৃত্য বেচারী অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে মাঝে মাঝে কাঁদিতেছিল ও বলিতেছিল যে, এরূপ কষ্ট জানিলে সে কখনই আসিত না; এবং এত দূরে আমার সহিত প্রাণ দিতে আসিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল যে, আমাকে একটু বক্তৃতা-বাণে বিদ্ধ করে, কিন্তু সাহসে কুলাইতেছিল না। সে জানিত যে, তাহার বাবুর মস্তিষ্কে কোন কীট প্রবেশ করিলে, সহজে তাহা পরিত্যাগ করিয়া যায় না; সুতরাং বলিয়া কোন লাভও নাই।

যখন পঁহুছিলাম, তখনও আকাশ পরিষ্কার হয় নাই, গাছের মধ্যে জমাট-বাঁধা অন্ধকার ছিল। ডাকাডাকির পর অনেক কষ্টে বাঙ্গলোর চৌকিদার আসিয়া প্রকোষ্ঠ খুলিয়া দিল। বিদেশী বেশ, বিদেশী ভাষা ও অসময়ে আগমন প্রভৃতি চিন্তা করিয়া সে একটু বিস্মিত হইল; অবশেষে মৃদু তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া ঘরগুলি খুলিয়া দিল। আমার ভৃত্যটি এই অবস্থায় বাঙ্গলোর ঘরের কোণে শুইয়া পড়িল এবং নিদ্রিত হইয়া পড়িল। আমার চোখে নিদ্রা নাই; আমি হাত, মুখ ধুইয়া সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া লইলাম। এ দিকে রাত্রিও প্রভাত হইল। আমি অতি প্রত্যূষে ব্যাগ ও খাতাপত্র লইয়া বেলুড় গ্রামস্থ কেশব মন্দিরের দিকে ধাবিত হইলাম। "ধাবিত হইলাম" শুনিয়া অনেকে হয় ত বিস্মিত হইবেন। কিন্তু আমার মন যে ভাবের বন্যায় আপ্লুত হইয়াছিল, তাহাতে আমি যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। পথ চিনি না; পথে যে ২।৩টি লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাদের নিকট মন্দির কোথায় জানিয়া লইয়া চলিলাম। আসিয়া দেখিলাম, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। আমার মত সকলেই ত উন্মত্ত নহে; অত প্রত্যূষে মন্দিরের দ্বার খোলা হয় না। তখনই দ্বারের চাবি আনিবার বন্দোবস্ত করিলাম। মন্দিরের বহিঃদ্বারের সম্মুখে দেবতার শোভাযাত্রার জন্য রথ রহিয়াছে দেখিলাম। মন্দিরের বহিরঙ্গনের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রাচীরে সংলগ্ন বহিঃদ্বারটি খোলা হইলে অঙ্গনে পঁহুছিলাম। মন্দিরের কথা বলিবার পূর্ব্বে এই স্থানের বিষয় যৎসামান্য বলিয়া রাখি।

স্থানটির নাম বেলুড় বলিয়াছি; পুণা হইতে বাঙ্গালোর যাইবার রেলপথে বনভর নামে এক ষ্টেশন পড়ে; এই ষ্টেশনের ২৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বেলুড় অবস্থিত।

বেলুড় হইতে হানেবিড যাইয়া যখন বাঙ্গালোরে প্রত্যাবর্ত্তন করি, তখন এই বনভর ষ্টেসন হইয়া যাই। সে কথা ক্রমশঃ বলিব।

বেলুড় যে শুদ্ধ হৈসল রাজ্যের রাজধানী বলিয়া বিখ্যাত তাহা নহে; ইহা কানাড়া প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ বিশেষ; ইহাকে এই জন্য দক্ষিণ বারাণসী বলিয়া থাকে। বল্লাল ও বিষ্ণুবর্দ্ধন নরপতি এই স্থান হইতে রাজ্যশাসন করিয়া ইহাকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণুবর্দ্ধনের সহিত চালুক্য শিল্পের প্রবর্ত্তয়িতা হিসাবে জক্কনাচার্য্য অমর হইয়া গিয়াছেন। এই শিল্পের প্রচলন ও পরিপুষ্টির মূলে নরপতি বিষ্ণুবর্দ্ধন ও রাজ্ঞী সন্তানা। বেলুড় মন্দিরে ইহাদের মূর্ত্তি দেখিয়াছি। হৈসল শিল্পের কথা মনে হইলে য়ুরোপের রেণাসাঁসের কথা মনে পড়ে। জক্কনাচার্য্য বিধি নিষেধ নিয়ন্ত্রিত চালুক্য তথা ভারতীয় শিল্পে নূতন ধারা আনিয়া দিয়া যে অভিনব সৌন্দর্য্যের বিকাশ সম্ভবপর করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ত অমর হইয়া গিয়াছেনই,—ভারত-শিল্পকেও অমর করিয়াছেন।

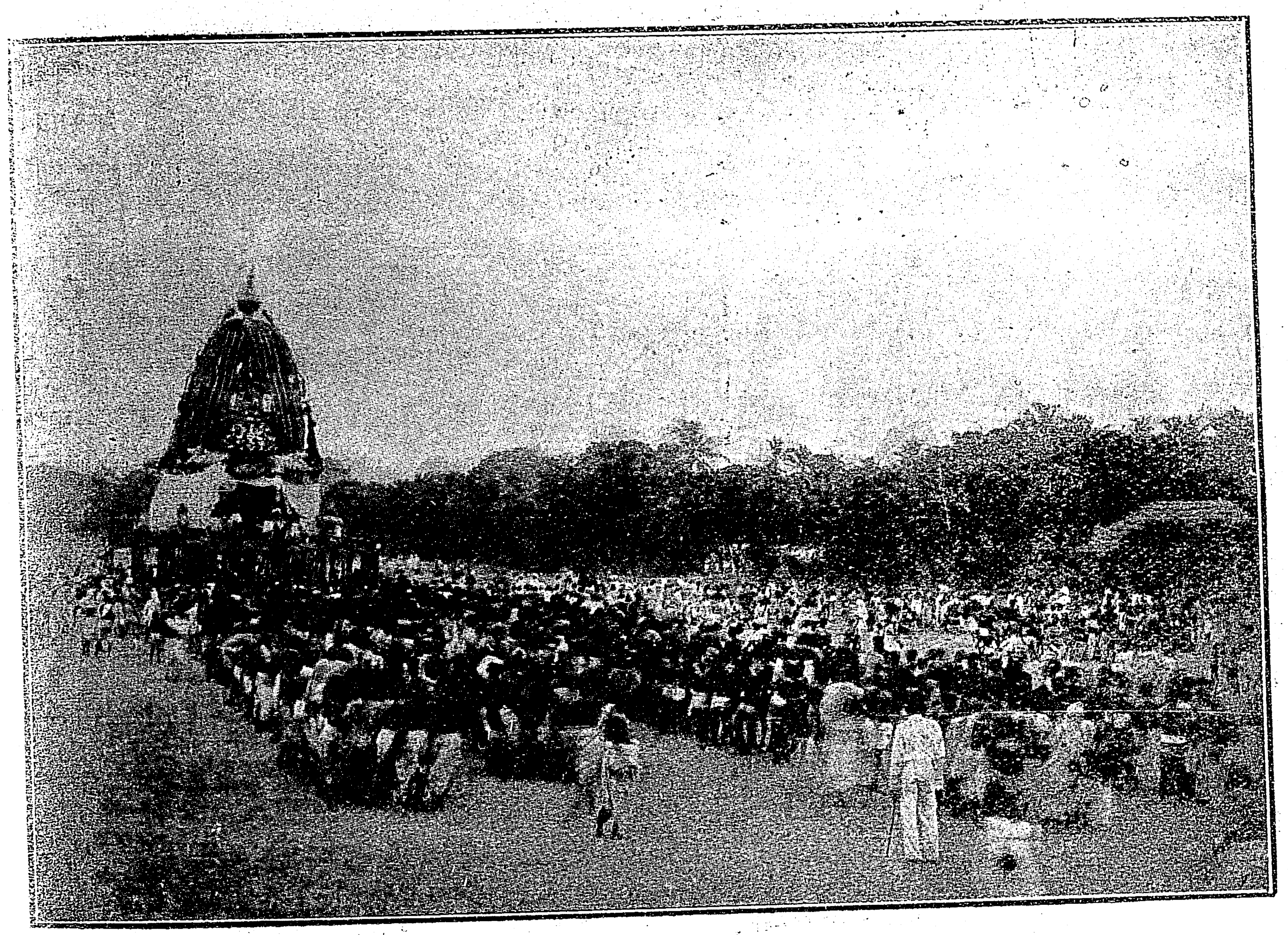

দেবতার শোভাযাত্রার রথ

বেলুড়ের মন্দিরটির নাম কেশব-মন্দির; এই মন্দিরে বিষ্ণুর যে বিগ্রহ স্থাপিত, তাহার নাম বিজয়-নারায়ণ। ১১১৭ অব্দে বিষ্ণুবর্দ্ধনের আদেশে এই মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং বিজয়-নারায়ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হন। বিষ্ণুর এক নাম যে বিজয়-নারায়ণ তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না, এবং কোন গ্রন্থেও পাঠ করি নাই। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত পঞ্চরাত্রাগমে বিষ্ণুর যে চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তির উল্লেখ আছে, তাহাতে বিজয়-নারায়ণের উল্লেখ নাই। কেশবের বর্ণনার সহিত এ মূর্ত্তির সাদৃশ্য আছে। এ স্থলে একটি কথা বলিয়া রাখি। আমি স্থানীয় পণ্ডিতের নিকট পঞ্চরাত্রাগম হইতে বিষ্ণুর যে চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তির আয়ুধ-ধারণের ক্রম লিখিয়া লই, তাহার সহিত অগ্নিপুরাণ * ধৃত বর্ণনার সাদৃশ্য আছে। আমাদের

* অগ্নিপুরাণ ৪৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বঙ্গদেশের বিষ্ণু-মূর্ত্তির সহিত পদ্মপুরাণ-ধৃত বর্ণনার সাদৃশ্য আছে। উদাহরণ স্বরূপ বিষ্ণু-মূর্ত্তির অন্যতম হৃষীকেশ-মূর্ত্তির কথা বলিতে পারি। অগ্নিপুরাণের হৃষীকেশ আর পঞ্চরাত্রাগম-বর্ণিত হৃষীকেশ একই প্রকারের; কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত এবং বর্দ্ধমান জিলা হইতে প্রাপ্ত হৃষীকেশ-মূর্ত্তির সহিত পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তির মিল নাই; ইহা পদ্মপুরাণের বর্ণনানুযায়ী মূর্ত্তি।*

এস্থলে কেশব-মূর্ত্তির সামান্য বর্ণনা দেওয়া উচিত মনে করি। মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর, উচ্চ উপপীঠে অধিষ্ঠিত এবং বেশ উচ্চ। ইঁহার প্রভামণ্ডলে দশ অবতারের মূর্ত্তি ক্ষোদিত; ইহার দুইপার্শ্বে ভূদেবী ও শ্রীদেবী রহিয়াছেন। আমাদের আর্য্যাবর্ত্তীয় বিষ্ণু-মূর্ত্তির পার্শ্বে যেমন লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, দাক্ষিণাত্যে সেইরূপ ভূদেবী ও শ্রীদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। ইঁহার দক্ষিণাধঃ হস্তে পদ্ম, দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ, বামোর্দ্ধ হস্তে চক্র, বামাধঃ হস্তে গদা রহিয়াছে।

বেলুড়স্থ কেশব-মন্দির হৈসল স্থাপত্যের ললামভূত। বিষ্ণুবর্দ্ধন নরপতির আদেশে ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহার নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এক কিম্বদন্তী প্রচলিত। প্রবাদ এই যে বিষ্ণুবর্দ্ধন জৈন ছিলেন, এবং শ্রীমৎরামানুজাচার্য্য তাঁহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন; ইহার নিদর্শনস্বরূপ রামানুজাচার্য্য বিষ্ণুবর্দ্ধন দ্বারা বেলুড়, মেলকোট প্রভৃতি ৫টি স্থানে ৫টি শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করান।

মন্দিরটি উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত অঙ্গনের (৪৪৩´×৩৯৬´) মধ্যে অবস্থিত। এই অঙ্গনে আরও কয়েকটি মন্দির, মণ্ডপ প্রভৃতি বর্ত্তমান। কেশব-মন্দির পূর্ব্বদ্বারী; এবং পূর্ব্ব দিকের প্রাচীরে দুইটি দ্বার আছে। একটি দ্বার দ্রাবিড় রীতিতে নির্ম্মিত গোপুরম্‌শোভিত; অন্য দ্বারটি হস্তিদ্বার নামে কথিত। এটী তেমন প্রশস্ত নহে। গোপুরম্‌টি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিজয়নগর নরপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার দক্ষিণপার্শ্বে ভাণ্ডার-গৃহ ও পাকশালা। মন্দিরটি ৩ ফিট উচ্চ পোতার উপর নির্ম্মিত, এবং পোতা লইয়া ইহার পরিমাণ ১৭৮´×১৫৬´। ইহার তিনটি অংশ—(১) গর্ভগৃহ অর্থাৎ যেখানে বিগ্রহ স্থাপিত, (২) অন্তরাল বা সুখনাশী অর্থাৎ গর্ভগৃহ ও মণ্ডপ সংযোজক বারাণ্ডা, (৩) নবরঙ্গ বা মহামণ্ডপ। দ্রাবিড় স্থাপত্যের তৃতীয় অঙ্গ যে অর্দ্ধমণ্ডপ তাহা এখানে দৃষ্ট হয় না। নবরঙ্গের পূর্ব্বে আর একটি মণ্ডপ দৃষ্ট হয়, ইহার নাম সুখ-মণ্ডপ বা বলি-মণ্ডপ এবং শেষোক্তের দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটি মণ্ডপ অবস্থিত; ইহার নাম কল্যাণ-মণ্ডপ। অঙ্গনের মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন মন্দির ও মণ্ডপের কথা বলিয়াছি। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রসিদ্ধ—বীরনারায়ণসন্নিধি, অণ্ডালসন্নিধি, কাপ্পে চেন্নগরায়সন্নিধি, আঞ্জনেয়সন্নিধি আলোয়ারসন্নিধি। সন্নিধি অর্থ যেস্থানে তৎপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সন্নিধি বা নৈকট্য মিলে অর্থাৎ মন্দির। শ্রবণ-বেলগোলায় জৈনমন্দিরগুলি বস্তি বা বসতি শব্দে অভিহিত, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

নবরঙ্গের বহিঃদ্বার ৩টি, ইহারা পূর্ব্বে, উত্তরে, ও দক্ষিণে অবস্থিত। উত্তর দিকের দ্বারের নাম "স্বর্গদ দ্বার" বা স্বর্গদ-বাগিলু। দক্ষিণ দিকের দ্বারের নাম শুক্রবার দ্বার বা শুক্রবার-বাগিলু; প্রত্যেক শুক্রবার বিজয়-নারায়ণের উৎসব-মূর্ত্তিকে এই দক্ষিণদ্বার দিয়া দেবী-মন্দিরে লইয়া যাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম শুক্রবার-দ্বার; কাঞ্চীর বরদরাজ-মন্দিরেও এইরূপ দেখিয়াছি। কানাড়ী ভাষায় "বাগিলু" শব্দের অর্থ দ্বারদেশ। এই দ্বারগুলির পার্শ্ব ও শীর্ষ অতিশয় সুন্দর কারুকার্য্য-যুক্ত। পূর্ব্বদ্বারের পার্শ্বে মদন ও রতির চিত্র খোদিত রহিয়াছে। ইহাদের শীর্ষদেশে অঞ্জলিবদ্ধ গরুড়-মূর্ত্তি রহিয়াছে, এবং খগরাজের দুইপার্শ্বে বিচিত্র লতাপুষ্পশোভিত পুচ্ছযুক্ত মকর-মূর্ত্তি; পুচ্ছদ্বয় অনেক দূর নামিয়া পড়িয়াছে। গরুড়ের মূর্ত্তির উপর তিন দ্বারে বিষ্ণুর তিন প্রকারের মূর্ত্তি বিদ্যমান। পূর্ব্বদ্বারে নরসিংহ হিরণ্যকশিপু বধ করিতেছেন, দক্ষিণদ্বারে বরাহাবতার বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষ দমন করিতেছেন এবং উত্তরদ্বারে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বিষ্ণু-মন্দিরের মুখ্য বিগ্রহ কেশব রূপে বিরাজ করিতেছেন। দ্বারের দুই পার্শ্বে "বাড়াপা" প্রস্তরের অতি সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত দুইটি স্তম্ভ রহিয়াছে। স্তম্ভগুলি যেন "লেদ্" বা শান্‌যন্ত্রে কুঁদিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে।

এখানে এ মন্দিরের আর একটি বৈচিত্র্যের কথা বলিয়া রাখি। ইহা এ মন্দিরের কেন, প্রায় সমস্ত চালুক্য রীতি-

* মৎপ্রণীত Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangia Sahitya Parishat ৫৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

জলবালা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

নির্ম্মিত মন্দিরেই দৃষ্ট হয়। হৈসলস্থাপত্য ত চালুক্য-স্থাপত্যের অঙ্গবিশেষ; সোমনাথপুর, হানেবিড প্রভৃতি সমস্ত হৈসল মন্দিরেই ইহা দেখিয়াছি। ইহা ভিন্ন হাইদ্রাবাদ রাজ্যস্থিত পর্ব্বতগাত্র উৎকীর্ণ এলোরাস্থ দেবসভা গুম্ফাতেও ইহা দেখিয়াছি। ইহার কারণ যে এলোরাস্থ গুম্ফাগুলি চালুক্যরীতিতে নির্ম্মিত। যে বৈচিত্র্যের কথা বলিতেছি, ইহার নাম "জগতী" বা ক্রমনিম্ন বা ঢালু আলিসা। মন্দিরের দ্বারের উভয় পার্শ্বে এবং "নবরঙ্গের" তিন ধারেই "জগতী" দৃষ্ট হয়। মন্দিরের তলদেশ হইতে "জগতী"-

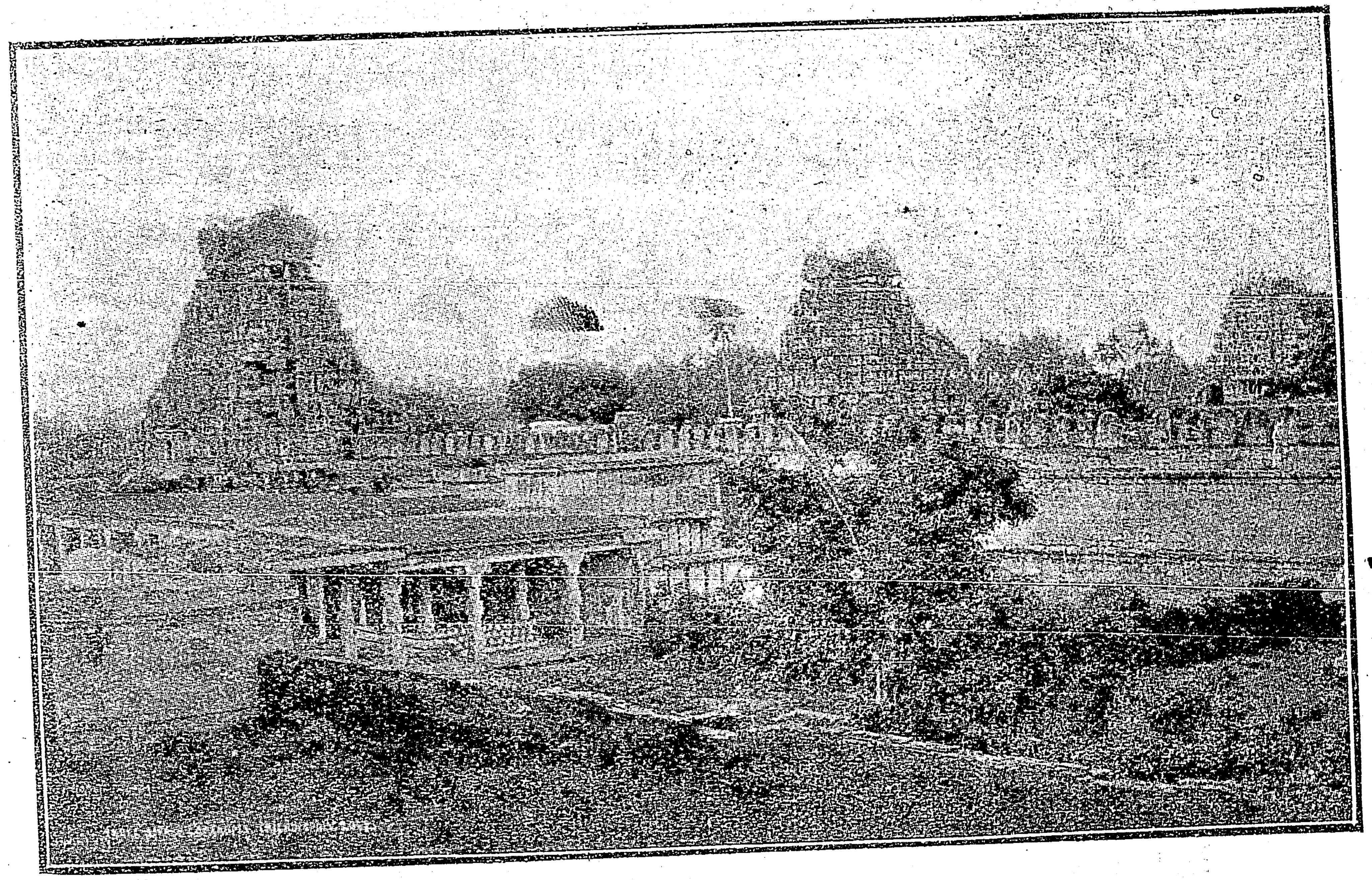

গোপুরম্

শীর্ষ পর্য্যন্ত মন্দিরের গাত্র নিম্নাচ্ছাদিত বলিলেও চলে। গাত্র সমান্তরাল কারুকার্য্যের ধারী দ্বারা বিভক্ত; এবং এই ধারীগুলিতে নানা চিত্র উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব, তাহার এ স্থানও নহে; কেন না, বর্ণনায় একখানি পুস্তক লেখা যাইতে পারে। তবে মোটা-মুটি চিত্রগুলির একটা আভাস দিতেছি। জগতী পর্য্যন্ত মন্দির-গাত্র ৮টি সমান্তরাল অংশে বিভক্ত। নিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত ক্রমগুলি এই:—(১) হস্তীর শ্রেণী, (২) "বিড" বা মুক্তা-চিহ্নিত কর্ণিস্; ইহাতে সিংহ-মস্তকের সারি রহিয়াছে, (৩) আবর্ত্তিত লতা ও তাহার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মনুষ্যমূর্ত্তি, (৪) "বিড" যুক্ত কর্ণিস্, (৫) কুলুঙ্গির মধ্যস্থিত নারীমূর্ত্তি, (৬) কুড্যস্তম্ভের সারি (Pilaster) ও তাহার মধ্যে মধ্যে যুগল বা একক নারীমূর্ত্তি, (৭) মন্দির শেখর প্রতিকৃতির সারি ও তদ্ভিন্ন কারুকার্য্য লতা প্রভৃতি, (৮) রেল ও তন্মধ্যস্থ কুলুঙ্গির মধ্যে নারী মূর্ত্তি কয়েকটি অশ্লীল। পূর্ব্বোক্ত ৮টি ধারী এমন সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ যে, তাহাদের বিষয়ে অনেক কথা বলা যাইতে পারে।

অষ্টম সংখ্যক ধারীর উপর স্তম্ভ বর্ত্তমান, এবং স্তম্ভগুলির অন্তরে সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত প্রস্তরের জালি রহিয়াছে। এইরূপ ২০টি জালি দৃষ্ট হয়। জালিগুলিতে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ-বর্ণিত ঘটনা উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন নরপতি বিষ্ণুবর্দ্ধন, ও তৎপুত্র নরসিংহের রাজসভার চিত্রও দৃষ্ট হয়। এ সমস্ত চিত্র বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও শিল্পীর শিল্পজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ সূচনা করে। জালির পার্শ্বস্থ যে স্তম্ভের কথা বলিয়াছি, তাহাদের শীর্ষে মূর্ত্তি বিদ্যমান; ইহার কথা পরে বলিব। ইহাদের মধ্যে ২।১টি দেবীমূর্ত্তি; অপরগুলি নর্ত্তকী ও

নানা ভাবযুক্ত স্ত্রীমূর্ত্তি। এগুলির মধ্যে অনেক মূর্ত্তি কামকলাবিলাসতরঙ্গে দর্শকের চিত্ত উদ্বেলিত করে। কয়েকটিতে যৌবনের উদ্দাম উচ্ছ্বাস না থাকিলেও তাহাদের স্মিতহাস্য ও নম্রনেত্রপাতে মন এক অভূতপূর্ব্ব রসাবেশে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। একটি মূর্ত্তি দেখিয়া, বরেণ্য কবির অমর কবিতার একটি কথা মনে পড়িল ঃ—

উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।
বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকাশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশি।
আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে,
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
পড়ে ছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত
করি অবনত।
কুন্দ-শুভ্র নগ্ন কান্তি সুরেন্দ্র বন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা।

আর মনে পড়িল ঃ—

মুক্তবেণী বিবসনা, বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী,
হে স্বপ্ন সঙ্গিনী।

বাস্তবিক, মধুমত্ত ভৃঙ্গের ন্যায় আমি মুগ্ধচিত্তে সৌন্দর্য্য পান করিতেছিলাম, হৃদয়ের রক্তধারা ছন্দে ছন্দে নাচিয়া উঠিতেছিল; নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে মূর্ত্তিটি দেখিতেছিলাম। আমার ভ্রান্তি হইতেছিল যে, ইহা পাষাণময়ী মূর্ত্তি, না শিল্পীর মানস-প্রতিমা। এ অবস্থায় সহসা হস্ত হইতে খাতা-পেন্সিল পড়িয়া গেল; তখন চমক ভাঙ্গিল। তখনও কিন্তু—

"চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিণী
জলে স্থলে নভস্তলে, সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়া রৌদ্রকরে
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্ম্মরে
* * * *
* * * যেন আকাশ বীণার
* * * * *
রবি-রশ্মি তন্ত্রীগুলি সুরবালিকার
চম্পক-অঙ্গুলি-ঘাতে সঙ্গীত ঝঙ্কারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল—মৌন স্তব্ধতারে
বেদনায় পীড়িয়া মূর্চ্ছিয়া।——"

যখন সম্পূর্ণরূপে চমক ভাঙ্গিল, তখন মনে বিষম লজ্জা উপস্থিত হইল। লজ্জার কারণ—মোহে অভিভূত হওয়া। কেন না যৌবন-সীমা অতিক্রম করিয়া, শিল্পই হউক, আর অশিল্পই হউক, রূপজ নেশার আবেশে মুগ্ধ হওয়া বয়সোচিত নহে। যাঁহারা রসজ্ঞ, তাঁহারা হয় ত মনে করিবেন যে, ইহা আমার অকাল-বার্দ্ধক্য। যৌবনের সীমা-বিন্দু কোথায়, তাহা ঠিক অবগত নহি। কিন্তু মায়াজাল ছিন্ন করিবার চেষ্টা আগে ২।১বার করা হইয়াছিল বলিয়া, এ রকম রূপজ মোহ অসঙ্গত বলিয়া ধারণাটা অনেক কাল ধরিয়া বদ্ধমূল হইয়াছিল। লজ্জার দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমি এত কষ্ট করিয়া যে গ্রামে, অরণ্যে, পর্ব্বতে ভারতেতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়াছি, আমার মনকে রূপ-মোহে অভিভূত হইতে দেওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে। মন্দিরের কর্ম্মচারীরা নিস্তব্ধে দেখিতেছিলেন যে, আমি মূর্ত্তিটি দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছি। আমি নিজেকে সামলাইয়া লইবার সময় লক্ষ্য করিলাম যে, তাঁহারা অবাক্ হইয়া আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমার নিকট Binocular বা দূরবীক্ষণ ছিল। তাহা দিয়া মূর্ত্তি ও অন্যান্য চিত্রগুলির সূক্ষ্ম কার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, কিছু কিছু সামান্য মোটামুটি নক্সা করিয়া লইতেছিলাম। এমন সময় একজন পণ্ডিত বলিলেন, "কিং ভবতা নরসিংহস্তম্ভং দৃষ্টং?" আমি বলিলাম "নেদং, কুত্রৈব বর্ত্ততে"? "আগচ্ছতু ভবান্" বলিয়া "নবরঙ্গ" বা মণ্ডপ মধ্যে লইয়া গেলেন। ইহার কথা বলিবার পূর্ব্বে নবরঙ্গটি দেখিয়া লওয়া যাউক।

"নবরঙ্গ"টি কি, পূর্ব্বে বলিয়াছি। সোমনাথ মন্দিরের বর্ণনা করিবার সময় এই শ্রেণীর মণ্ডপের একটা পরিচয় দিয়াছি। নবরঙ্গের চারিধারে নাত্যুচ্চ অলিন্দ রহিয়াছে। ইহা একটি মণ্ডপ অর্থাৎ স্তম্ভযুক্ত প্রকোষ্ঠ। মধ্যস্থ চারিটি স্তম্ভ অতিশয় মনোজ্ঞ; ইহার মধ্যে এমন কোন অংশ নাই, যাহা ক্ষোদিত নহে; এবং এই চারিটির মধ্যে চিত্র-

কার্য্যের কোন সাদৃশ্য নাই। একই ধরণের কার্য্য চারিটিতে থাকিলে শিল্পীর কার্য্য অনেকটা সহজ হইয়া যায়; কিন্তু এ স্থলে তাহার বিপরীত দৃষ্ট হয়। এই চারিটি স্তম্ভ ছাদের যে গম্বুজাকৃতি অংশ রক্ষা করিয়া আছে, তাহার নাম "ভুবনেশ্বরী"। ইহার ব্যাস প্রায় ১০ ফিট। ভুবনেশ্বরী কারুকার্য্য-পূর্ণ। ইহার মধ্য হইতে যে পদ্ম-কোরক ঝুলিয়া আছে, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। উহার সর্ব্ব-নিম্নের প্রস্তর-গাত্রে রামায়ণ-চিত্র

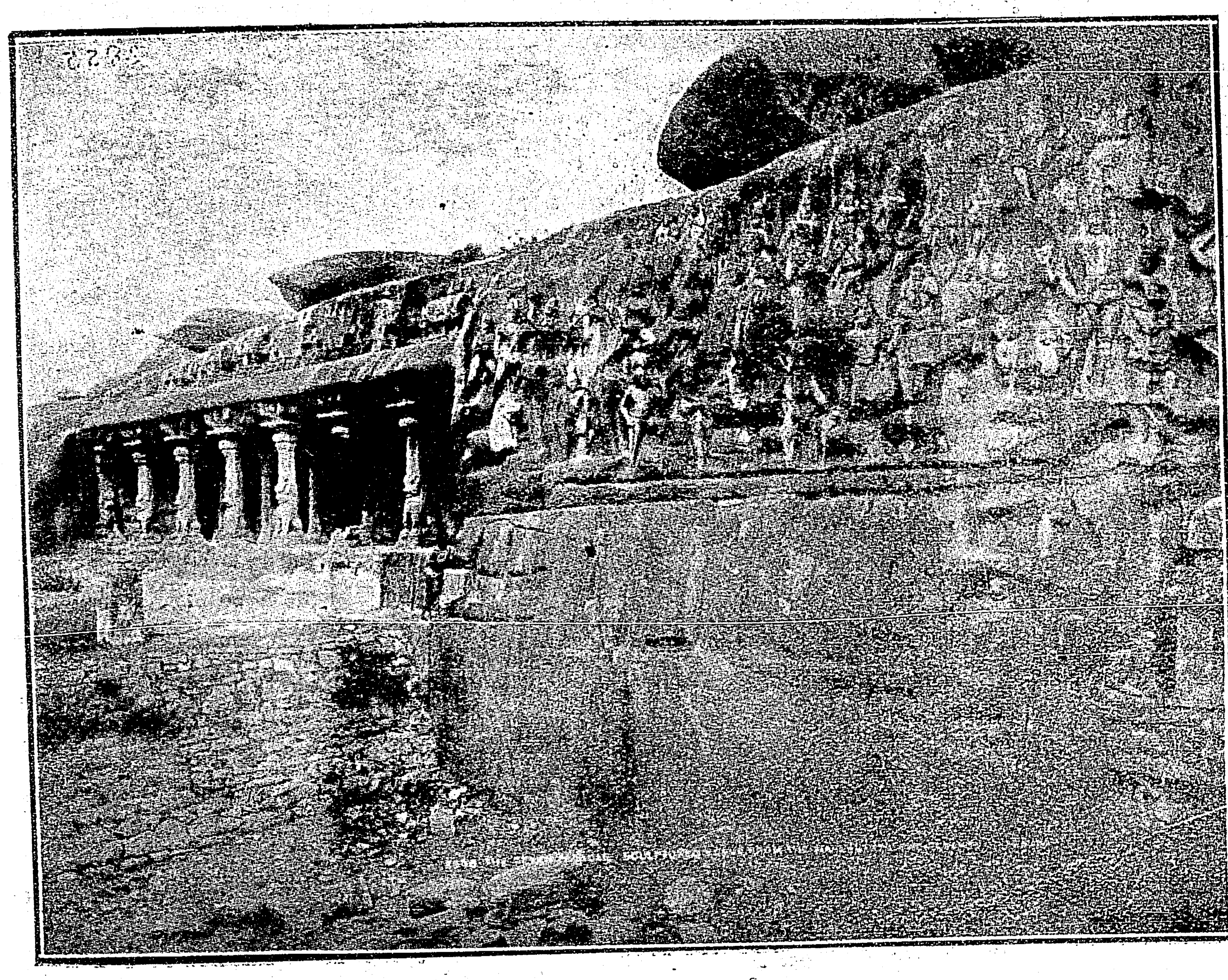

পর্ব্বত-গাত্রে উৎকীর্ণ মহাভারতীয় চিত্র—অর্জ্জুনের অনুশোচনা

জীবন্তভাবে চিত্রিত রহিয়াছে। নবরঙ্গস্থ স্তম্ভের একটির নাম নরসিংহ-স্তম্ভ। ইহার গাত্রে একটি অতিশয় ক্ষুদ্র কৃষ্ণমূর্ত্তি খোদিত আছে; এই স্তম্ভটিকে পূর্ব্বে ঘুরাইতে পারা যাইত বলিয়া প্রবাদ আছে; এখনও ইহাকে নড়াইতে পারা যায়। এই স্তম্ভের শিল্পকার্য্য এতই মনোজ্ঞ যে, শিল্পী ইহার অল্প অংশে কোন কারুকার্য্য ক্ষোদিত করেন নাই। তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল যে, অন্য কোন শিল্পী ইহার উপর কোন সূক্ষ্ম কার্য্য করিয়া তাঁহার কার্য্যের সহিত মিশাইয়া দিতে পারেন কি না, যেন এক শতাব্দী ধরিয়া তাহা দেখা হয়। কেহই সাহস করিয়া এ কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। নবরঙ্গ মধ্যস্থ অন্যান্য স্তম্ভগুলিও বিশেষ মনোহর। ধাতুর সূক্ষ্ম তারের ন্যায় কার্য্য কয়েকটি স্তম্ভ-গাত্রে দৃষ্ট হয়। এরূপ সুন্দর কার্য্য ভারতবর্ষের কোথাও দৃষ্ট হয় না। এই সকল স্তম্ভের শীর্ষে বহিঃস্তম্ভের ন্যায় নানা হাব-ভাবযুক্ত নারী-মূর্ত্তি রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্যের চারিটি স্তম্ভের একটির শীর্ষে যে স্ত্রী-মূর্ত্তিটি রহিয়াছে, তাহার হস্তে এক সুন্দর শুকপক্ষী ক্ষোদিত রহিয়াছে। এই নারীমূর্ত্তির মণিবন্ধের বলয়কে উচে ও নিয়ে নড়াইতে পারা যায়। ইহা সরস্বতীর মূর্ত্তি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়িয়া গেল; পূর্ব্বে মন্দিরের বহির্দ্দেশে যে সকল স্তম্ভের কথা বলিয়াছি, তাহার একটির শীর্ষস্থ একটি স্ত্রী-মূর্ত্তির হস্তে একটি ফল রহিয়াছে। এবং তাহার উপর একটি ক্ষুদ্র মক্ষিকা বর্ত্তমান। এ মূর্ত্তিটি অতিশয় সুন্দর।

নবরঙ্গের পর আমি “সুখনাশী”র ভিতর দিয়া গর্ভ-গৃহে প্রবেশ করিলাম। সুখনাশীর সম্মুখস্থ সরদালে বিষ্ণুর চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। ইহার দ্বারদেশের উভয় পার্শ্বে দ্বারপালের মূর্ত্তি রহিয়াছে ; ইঁহারাও প্রভাযুক্ত এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। দ্বারদেশের শীর্ষে অর্দ্ধ-বৃত্তাকার অংশের মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই অংশটি সুন্দর filigree work বা সূক্ষ্ম তারের ন্যায় কারুকার্য্য-ক্ষোদিত। লক্ষ্মী-নারায়ণের দুই পার্শ্বে দুইটি আবর্ত্তিত লতার চিত্রযুক্ত পুচ্ছ-সংবলিত মকর রহিয়াছে ; ইহাদের উপর বরুণ এবং বরুণানী বসিয়া আছেন।

গর্ভ-গৃহের বহিরাকৃতি তারকার ন্যায় ; উপপীঠের সংস্থান উত্তম, ও পশ্চিমে গর্ভ-গৃহের আকারের ন্যায়। গর্ভ-গৃহের তিনটি দেওয়ালের মধ্যদেশে রথাকৃতি তিনটি বহিরুদ্গত ক্ষুদ্র দ্বিতল প্রকোষ্ঠ বা কুলুঙ্গী রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেক তলে “জগতী” রহিয়াছে। এ স্থলে একটি জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত মনে করি ; তাহা এই। সোমনাথপুরস্থ মন্দির বর্ণনা করিবার সময় বলিয়াছি যে, তিনটি গর্ভ-গৃহের সমাবেশ এবং মণ্ডপ দ্বারা এই তিনটি সংযুক্ত হইয়া একটি গর্ভ-গৃহের সংস্থান করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এরূপ সংস্থিতিযুক্ত গর্ভ-গৃহের নাম “ত্রিকূট চাল”। বেলুড়ের গর্ভ-গৃহ এরূপ নহে। একটি প্রকোষ্ঠ লইয়াই গর্ভ-গৃহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অঙ্গন মধ্যস্থ মন্দির ও মণ্ডপের কথা বলিতে গিয়া আনুয়ার সন্নিধির কথা বলিয়াছি ; আনুয়ার শব্দের অর্থ ভক্ত। এই আনুয়ার তত্ত্ব প্রাচীন তামিল সাহিত্যের এক রত্ন স্বরূপ ; এবং ইহাদের বিষয় লইয়া অসংখ্য পুস্তক ও প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। আনুয়ার সন্নিধি ভিন্ন নিম্নলিখিত আচার্য্যদিগের সন্নিধি আছে—শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীবেদান্তদেশিকাচার্য্য, শ্রীমনবান-মামুলি। এই মন্দিরগুলি কেশব মন্দিরের মত তত প্রাচীন নহে।

হৈসল বল্লাল নরপতিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্থাপত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা স্তম্ভের কল্পনায় ; এই জন্য স্তম্ভের অঙ্গগুলির পরিমাপ ও তুলনা-মূলক পরিমাণ, ভারত-শিল্প বিষয়ে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন, তাঁহাদের উপকারে আসিতে পারে ; এই জন্য অঙ্গন মধ্যস্থ মন্দিরের স্তম্ভের মাপগুলি প্রদত্ত হইল। মূল মন্দিরে পরিমাণ করিবার সুবিধা হয় নাই ; তাহাতে আসিয়া যাইবে না।

(ক) অণ্ডালে সন্নিধি ঃ—

স্তম্ভের অধিষ্ঠান (Base) ২′-১১″ উচ্চতা (২′-৩॥০″ প্রস্থ)
„ কাণ্ড (Shaft) ৪′-৯″ „
„ বোধিকা (Capital) ১′-৭″ „ (২′-১০″)
„ প্রস্তার (Entabletuse) ৩′ (ইহার মধ্যে সরদাল বা arbitrar—১′-৫″)

মোট উচ্চতা ১২′-৩″

স্তম্ভগুলির মধ্যস্থ ব্যবধান.........৭′-৭॥০″

(খ) কাপ্পে চেন্নগরায় মন্দির ঃ—

স্তম্ভের অধিষ্ঠান (দ্বিতলযুক্ত) ৩′-১″ উচ্চতা (২′-৯″ প্রস্থ)
„ কাণ্ড.......................৩′-৬॥০″ „
„ বোধিকা.....................১′-৬″ „
„ প্রস্তার.........২′-৪″ „ (ইহার মধ্যে সরদাল— ১′-৩″)

মোট উচ্চতা ১০′-৫॥০″

স্তম্ভগুলির মধ্যস্থ ব্যবধান.........৭′-৪″

মূল মন্দির ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী মন্দির সমূহে এত মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে যে, তৎসমূহ হইতে দেবমূর্ত্তি-বিদ্যা বেশ অভ্যাস করিতে পারা যায়। এখানে এত প্রকারের বিভিন্ন মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া যায় যে, তাহাদের বিষয় সাধারণ পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতিতে মিলে না। ইহার জন্য দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আগমাদি শাস্ত্র পাঠ করিতে হয়। আমার বোধ হয় আর্য্যাবর্ত্তের কোন মন্দিরেই দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের শতাংশের এক অংশ পরিমাণ মূর্ত্তি-বৈচিত্র্য নাই। এ প্রসঙ্গে ২।১টি মূর্ত্তির পরিচয় মূর্ত্তি-বিদ্যাভিজ্ঞ পাঠকের উপকারে না আসুক, কৌতূহল-বৃত্তি চরিতার্থ করিবে।

মন্দিরের অঙ্গনে বীরনারায়ণের এক মন্দির আছে। তাহাতে কালীর যে চিত্র ক্ষোদিত রহিয়াছে, তাহারও লক্ষণ এইরূপ—শবোপরি দণ্ডায়মানা, চতুর্হস্তা ; দক্ষিণহস্তের একটিতে ত্রিশূল, আর একটি ভগ্ন ; বামহস্তের একটিতে কীর্ত্তিমুখ শোভিত ডমরু, আর একটিতে খর্পর। এই মন্দিরের গর্ভ-গৃহের দক্ষিণদিকস্থ প্রাচীরের বহির্দ্দেশে এক অষ্টভুজ যুক্ত বরাহাবতারের মূর্ত্তি ক্ষোদিত। ইহার দক্ষিণ হস্তে কুঠার, শূলের ন্যায় এক প্রকার অস্ত্র (?) খড়্গ ও

গদা ; বামহস্তে মুষল, শঙ্খ ও ঢাল এবং বামোর্দ্ধ হস্তে ভূদেবী অর্থাৎ ধরিত্রী রক্ষিতা। বরাহাবতার মনুষ্য-মূর্ত্তির উপর দণ্ডায়মান আছেন।

কাপ্পে চেন্নগরার মন্দিরে সরস্বতীর যে মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে তাহা আসীনা, চতুর্হস্তা ; দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে অঙ্কুশ ও অভয়, বাম হস্তদ্বয়ে পাশ ও পুস্তক।

কেশবের মন্দিরে কয়েকটী বৈচিত্র্যযুক্ত মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। যথা—(১) চন্দ্রমূর্ত্তির দুই হস্তে কুমুদ ; ইহার কল্পনা সূর্য্য-মূর্ত্তি হইতে গৃহীত ; সূর্য্যমূর্ত্তির দুইটি হস্তে দুইটি পদ্মপুষ্প দৃষ্ট হয়। (২) বলরাম মূর্ত্তির এক হস্তে চক্র, অপর হস্তে হল।

এই মন্দিরের একটি বৈচিত্র্য এই যে, অনেকগুলি ক্ষোদিত মূর্ত্তির উপপীঠে শিল্পীর নাম ও পরিচয় উৎকীর্ণ। মন্দির ও মণ্ডপের আশে পাশে ব্র্যাকেটের ন্যায় যে মূর্ত্তিগুলি রহিয়াছে, এগুলিকে কানাড়ী ভাষায় মদনকাই কহে ; এই “মদনকাই” মূর্ত্তিগুলি বিশেষ মনোজ্ঞ,—শিল্প ও শিল্পীর উৎকর্ষের সূচনা করে। মানুষের শিল্পকুশলতা কত উচ্চ সীমায় পঁহুছিতে পারে, ইহাতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যেকালে মহীশূর রাজ্যে এই শিল্পধারার প্রথম প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার সহিত ভূতলে ভগীরথের গঙ্গা-প্রবাহ আনয়ন করার তুলনা করা যাইতে পারে। যে শিল্পাচার্য্য ভাব-মন্দাকিনীর এই নূতন ধারায় পুরাতন চোল-চালুক্যরীতিবদ্ধ শিল্প ঐরাবতকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি আমাদের নমস্য। আর যাঁহার উৎসাহ ও উত্তেজনা ঐ ধারা প্রবাহের পথ সুগম করিয়াছিল, অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাঁহার কথা কি বলিব না? তিনি ও তাঁহার স্ত্রী ভারতের শিল্পের ইতিহাসে অমর হইয়া গিয়াছেন।

বলিতেছিলাম যে, অনেকগুলি মূর্ত্তিতে শিল্পীর নাম ধাম পরিচয় আছে। এগুলি যে শুদ্ধ এই মন্দিরেই দৃষ্ট হয় তাহা নহে ; এই রীতি অনেক মন্দিরেই প্রবর্ত্তিত আছে। যথা সোমনাথপুর। সোমনাথপুরে যাওয়ার কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বেলুড়ের মন্দিরে ৭।৮জন শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের সকলের নাম করিয়া কোন ফল নাই ; কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিলেই হইবে। তিন চারিজন শিল্পীর নামোল্লেখ করিতেছি ঃ—দাসুজ ও তৎপুত্র চবন, চিক্কহম্প, নাগুজ ইত্যাদি। তাঁহাদের উপাধিগুলি বড়ই কৌতুকপ্রদ ; এগুলি বোধ হয় নৃপতি দত্ত। আধুনিক কালের ন্যায় সে সময় উপাধি দেওয়ার কোন পরিষৎ ছিল কি না, তাহা অবগত নহি। দাসুজের উপাধি “উপাধিযুক্ত শিল্পী-সমাজের আক্রমণকারী” (বিরুড রুবারি গোণ্ডল-বড়ীব), ইঁহার পুত্রের উপাধি—“উপাধিযুক্ত শিল্পীরূপ মদন সকলের মহেশ” (বিরুড-রুবারি-মদন মহেশ) অর্থাৎ ইনি তাঁহাদের নিধনকর্ত্তা, অর্থাৎ তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একজন শিল্পীর উপাধি—“উপাধিযুক্ত শিল্পীদের গলদেশের কাঁচি স্বরূপ'—অর্থাৎ তাঁহাদের গলদেশ কর্ত্তন করেন। ইংরাজী cut-throat অর্থে এই উপাধিটি প্রযুক্ত হয় নাই, বোধ হয় তাহা বলিতে হইবে না। একজন শিল্পীর উপাধিটি বেশ মাধুর্য্য ও রসপূর্ণ ; ইহা এই—“সরস্বতী চরণ-কমল মধুপ ও সজ্জন মনোমোহন।” বাস্তবিক, এ শিল্প দেখিলে প্রাণে যে উন্মাদনা ও উত্তেজনার আবির্ভাব হয়, তাহাকে সংযত করা অসম্ভব। আমি ত ভাবাবেশে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাহা না হইলে মন্দিরাভ্যন্তর ও অঙ্গনে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে যখন তখন পড়িয়া থাকিয়া এগুলির রসাস্বাদন করিতাম না। স্থানীয় লোকেরা আমাকে কি মনে করিতেছিলেন জানি না ; কিন্তু আমাকে দেখিবার জন্য স্থানীয় কতিপয় পণ্ডিত ভদ্রলোক প্রভৃতি আসিয়াছিলেন। মন্দির মধ্যে আমাকে কয়েকটি পণ্ডিত পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন। আমার ন্যায় সামান্য লোককে তাঁহারা এতটা সম্মান করায়, মনে যে কি লজ্জার উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। বাস্তবিক, Distance lends enchantment to the view—দূরত্ব দৃশ্যকে সৌন্দর্য্য-কুহকে পূর্ণ করে।

এ স্থলে দুই-একটি স্থানীয় লোকের প্রসঙ্গ বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। একটি লোকের নাম কে, নারায়ণাচার। ইনি একটি সামান্য পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছেন ; পুস্তক সংগ্রহ করা ইঁহার এক নেশা দেখিলাম। আমাকে রাইস্ (Rice) প্রণীত Epigraphia Carnatica গ্রন্থখানি পড়িতে দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন ; কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পুস্তকখানি ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হইয়াছিল। ইনি আমার সঙ্গে কি কি পুস্তক আছে দেখিলেন ও মৎপ্রণীত উড়িষ্যা বিষয়ক পুস্তকখানি

পাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ইনি ও ইঁহার পুত্র বিশেষ করিয়া অনেকগুলি তথ্যের সংবাদ দিলেন বলিয়া আমি ইঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। আর একটি লোকের নাম পণ্ডিত কে, ভীমাচার। ইনি স্থানীয় সংস্কৃত পাঠশালার অধ্যাপক। ইহার দর্শন-শাস্ত্র বেশ পড়া আছে, বিশেষতঃ বেদান্ত ও ন্যায়দর্শন। দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিবার (১৯১৫) পূর্ব্বে আমার সাংখ্য ও ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা ছিল; এ সব বিষয়ে আমি ইংরাজী শিক্ষিত হইয়াও যে কিছু কিছু সংবাদ রাখি দেখিয়া ইনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ইঁহার সহিত শাস্ত্রালোচনায় আমার বিশেষ কষ্ট হইতেছিল; কেন না ইনি ইংরাজী জানেন না; আমাকে সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে হইতেছিল। আমার সংস্কৃত বাক্যগুলি ব্যাকরণ দোষযুক্ত হইতেছিল, ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতে-ছিলাম; তবে নিজেকে খুব সাবধানে সামলাইয়া লইতে-ছিলাম। যখন শাস্ত্রীয় চর্চ্চা হইতেছিল, তখন তত অসুবিধা হয় নাই; কারণ পুস্তকের সংস্কৃত কথা তত কঠিন নহে; কিন্তু অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিতে আমার বিশেষ কষ্ট হইতেছিল। আমি অধিকাংশ বাক্যই কর্ম্ম-বাচ্যে বলিতেছিলাম, কেন না ইহাতে পরস্মৈপদী, আত্ম-নেপদী ক্রিয়া ঘটিত ভ্রান্তি হইবার ততটা সম্ভাবনা নাই। সাংখ্যের সামান্য বিশেষের কথা বলিতে গিয়া এইরূপ বাক্য বলা অতিশয় সহজ, যথা, "ইতি সামান্য লক্ষণং ব্যাখ্যায়তে"। মাঝে মাঝে ২।১টা "ইহখলু," "তথাচ," "তথাহি," "ইত্যয়ং," "যদ্বা," "ইত্যর্থঃ," "এতার্থঃ," "ইতিবাক্যং," প্রভৃতির বুকনি দিতেছিলাম; এ সকল বুকনি আমি বহুপূর্ব্বে চতুষ্পাঠীতে সামান্য কাল অধ্যয়ন করিবার সময় ও অধুনা অধ্যাপকের নিকট সাংখ্যাদি দু-এক খানি শাস্ত্র পাঠ করিবার সময় অভ্যাস করিয়াছিলাম। বাস্তবিক আমার নিজের উপর বিশেষ ঘৃণা হইতেছিল: লজ্জা ত হইতেছিলই। ভাবিতেছিলাম, হায়রে ইংরাজী শিক্ষা, তাহার গুণে কিরূপ পণ্ডিত সাজা যায়। এত মূর্খতা সত্ত্বেও তাঁহারা আমাকে বিশেষ পণ্ডিত বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। Index, condcordance ও glossaryর জয় হউক। যাক্ সে কথা।

আমার বাঙ্গলোতে পণ্ডিত মহাশয়েরা রাত্রে আসিয়া বিচার বিতর্ক জুড়িয়া দিলেন; ছাড়ান নাই দেখিয়া আমি ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতেছিলাম। সর্ব্বদা ভয় হইতে-ছিল যে, বিদ্যা বাহির হইয়া পড়িলে অপ্রস্তুত হইতে হইবে। যাহা হউক, ইঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন। সাংখ্যের বিবর্ত্তনবাদ, বহুপুরুষবাদ, দুঃখান্তবাদ, নব্যন্যায়ের ঘট-প্রাগভাবরূপতা, ব্যাপ্যতাসিদ্ধি প্রভৃতি, বেদান্তের অধ্যাস, তটস্থ লক্ষণ, স্বরূপ লক্ষণ ইত্যাদি নানা কথার প্রবর্ত্তনায় পণ্ডিত ভীমাচারের বিশেষ আনন্দ হইল। তাঁহার আনন্দ দেখিয়া আমার দুঃখ হইল, কেন না, তিনি যে গভীর আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, আমি সে আনন্দের আস্বাদে বঞ্চিত ছিলাম; কারণ, তাঁহার ন্যায় আমার জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা কোথায়? বাস্তবিক, পণ্ডিত ভীমাচারকে বিদ্যার ভাণ্ডার বলিয়া বোধ হইল। ইনি আসিবার সময় মন্দির মধ্যে পুষ্প পত্র প্রভৃতি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, যেন প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় পথিমধ্যে কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকে।

মন্দিরের কর্ম্মচারীরা সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, রাত্রে বাঙ্গলোর দ্বার যেন বন্ধ করিয়া রাখি। রাত্রে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পাঠ করিতেছি, এমন সময় দ্বারে আঘাতের শব্দ পাইয়া চমকিয়া উঠিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বার খুলিয়া দেখি যে, মন্দির হইতে দেবতার সুগন্ধি ভোগ আমার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। যতদূর স্মরণ আছে, ইহাকে বোধ হয় পুঙ্গলি নামে অভিহিত করে; অনেকটা আমাদের খেচরান্ন ও পলান্নের ন্যায়। ভোগের মাত্রা এত অধিক হইয়াছিল যে, আমি ও আমার ভৃত্য উভয়ে মিলিয়াও ইহার সদ্গতি করিতে পারিলাম না। দুই একটি মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জন প্রস্তুত ব্যাপারে বিশেষ বৈচিত্র্য বিদ্যমান; নারিকেল খণ্ডে ইহা-দিগকে তৈয়ার করা হইয়াছে; পায়সান্ন বিশেষ মুখরোচক। অনেকটা বাঙ্গালা দেশের পায়সান্নের মতই বোধ হইল।

প্রাতে বাঙ্গলোর বারাণ্ডায় বসিয়া কফি পান করিতে করিতে বহুদূরে বাবাবুদন পর্ব্বতের কুহেলিকাবৃত সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময় আমিন্দার মহাশয় ও পুলিস ইন্‌সপেক্টর মহাশয় আসিলেন। পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটি গবর্ণমেণ্ট হইতে আমার আসিবার পূর্ব্বেই এতৎসম্বন্ধে পত্র পাইয়াছেন জানাইলেন, এবং আমার কি কি প্রয়োজন আছে তাহার সংবাদ লইলেন। তাঁহাদের আপ্যায়িত

করিয়া আমিন্দার মহাশয়ের বাসায় যাইলাম। ইঁহার মেজাজটা আমাদের "ডেপুটী" বাবুদের মত উষ্ণ দেখিলাম না; লোকটি বিশেষ ভদ্র ও মিষ্টভাষী। পুলিস ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়কেও বেশ ভদ্র বলিয়া বোধ হইল; ইঁহারা দুইজনই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। নিজের দেশে, নিজের রাজার অধীনে অল্প বেতনে কর্ম্ম গ্রহণ করায় ইঁহারা গৌরব অনুভব করেন বলিলেন। নিজের দেশ, নিজের রাজ্য, এরূপ বুদ্ধি না জন্মিলে কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উদ্রেক হওয়া কঠিন। আমিনদার মহাশয় ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়কে আদেশ দিলেন, যেন তিনি আমায় হানেবিড়ে পঁহুছাইয়া দেন, এবং আমি যত দিন তথায় থাকিব, তিনিও যেন তত দিন সেখানে অবস্থান করেন। আমি এরূপ বন্দোবস্তে বিশেষ অমত প্রকাশ করিলাম, কেন না ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের ইহাতে বিশেষ কষ্ট হইবে। আমিনদার মহাশয় আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কথা হইল, আমি আহারাদি করিয়া গোযানে যাইব, এবং তাহার ২।১ ঘণ্টা পরে ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় অশ্বপৃষ্ঠে যাইবেন। তাহাই হইল। বেলুড় হইতে হানেবিড ১২ মাইল।

আমিনদার মহাশয় বেলুড় ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে স্থানীয় "ক্লাব" বাটীতে আমায় লইয়া গেলেন। সেখানে লাইব্রেরী ও বক্তৃতার জন্য বৃহৎ প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। অনেকগুলি দেশী ও বিদেশী মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র রহিয়াছে দেখিলাম। বাস্তবিক মহীশূর রাজ্যে সাধারণ্যে শিক্ষাবিস্তারের যেরূপ ব্যবস্থা দেখিয়াছিলাম, তাহার এক সামান্যাংশও আমাদের ব্রিটিশ সরকার শাসিত রাজ্যে দেখা যায় না।

বাদল-বেদন

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি-এ

আজু এ শাঙন-ধারে বিরহিণী রাধা সম
অঝোরে মরিছে পিয়া কাঁদিয়া,
নিঠুর দয়িত ওগো? মান ভুলি বুকে লহ
বাদরে আদরে তারে টানিয়া।
হিয়ার গোপন বাণী আকুল আবেগভরে
করুণ দীরঘ শ্বাসে নীরবে লুটায়ে পড়ে,
কত না মিনতিমাখা সজল নয়ন দু'টি
তোমা লাগি আছে সখা জাগিয়া;—
অকরুণ বঁধু ও গো! ভাঙ্গিবে না মান তবু?
লবে না কি বুকে তারে টানিয়া?

তুহুঁ ছাড়া প্রিয়তম! দাদুরী কি গাবে গান?
অনাদরে যূঁই কি গো ফুটিবে?
তুমি না আসিলে সখা কে আর সোহাগভরে
মাধুরী মদিরা তার লুটিবে?
রুদ্ধ বেদনা বহি মিথ্যা তোমারে হায়
পবন চরণ ধরি কেবলি সাধিয়া যায়,
শূন্য দোল্‌নাখানি কাতরে লুটায় ভূঁয়ে,
কি আশে সে নীপশাখে ঝুলিবে?
প্রিয়ারে নিবিড় করে বাহুডোরে বেঁধে প্রিয়
তার কোলে আর কি গো দুলিবে?

মাতাল বাদল রাতে মাদল বাজে না আর,
ময়ূরী গিয়াছে নাচ ভুলিয়া;
চাতক মরিছে বহি নিদারুণ তৃষাভার—
কে দিবে কণ্ঠে সুধা তুলিয়া!
নাহি সে বাদল-রাতে মিলন-সোহাগ মেলা,
স্বপনে মিলায়ে গেছে সে সুখ স্বপন-খেলা,
তাই এ শাঙন-ধারে দয়িত-বিধুরা বালা
দিয়েছে নয়ন-বাঁধ খুলিয়া;
তবু কি কঠিন মন গলিবে না বঁধু হায়,
লবে না কি পিয়া বুকে তুলিয়া?

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্‌সি

রাস্তা পরিষ্কার করা কল—

শীত-প্রধান দেশে সমস্ত শীতকালটা বরফে আচ্ছন্ন থাকে, তা'তে লোকের পথচলার বড় অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্য উইলিয়াম পেড্রোজ William Padrose) সাহেব এক বাষ্পচালিত গাড়ীর সৃষ্টি ক'রেছেন, যা'তে ১২ ফিট চওড়া পথ একেবারে একটানে পরিষ্কার হয়ে যায়। একখানি এঞ্জিন ঐ গাড়ী টেনে নিয়ে যায়, আর চাষারা যে ভাবে লাঙল দিয়ে মাটী কর্ষণ করে, সেই ভাবে ঐ গাড়ীটি পথে সঞ্চিত তুষাররাশি কর্ষণ করতে করতে চলে যায়। এ ভাবে এক ঘণ্টা কাজ কর্ব্বার পর দেখা গেছে যে, মানুষের পরিশ্রমে যতটা সময়ের মধ্যে যতখানি কাজ পাওয়া যায়, তার দ্বিগুণ কাজ এই যন্ত্রের দ্বারা অর্দ্ধেকেরও কম সময়ের মধ্যেই শেষ করতে পারা যায়।

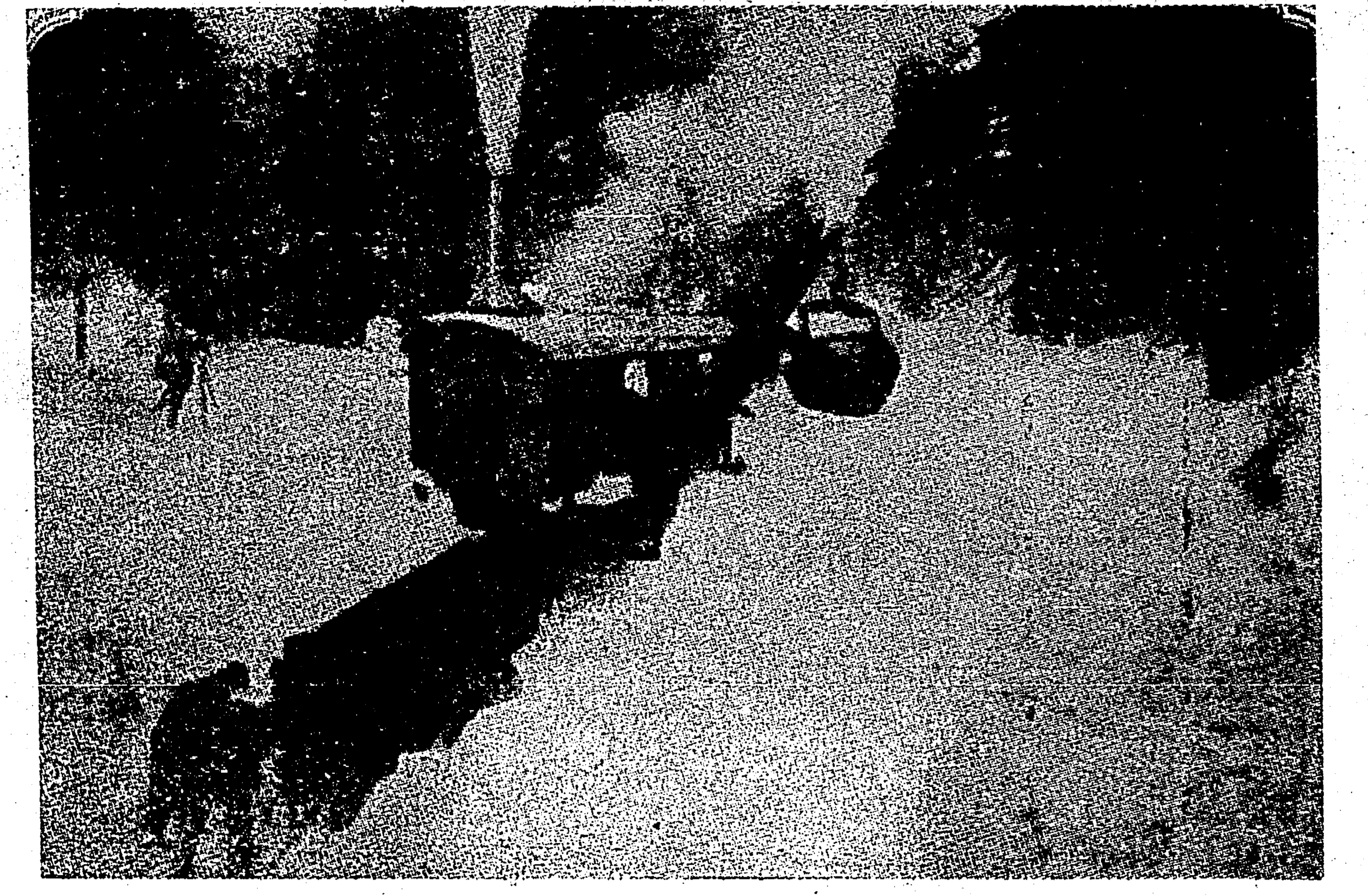

পথের বরফ সাফ্ করবার কল

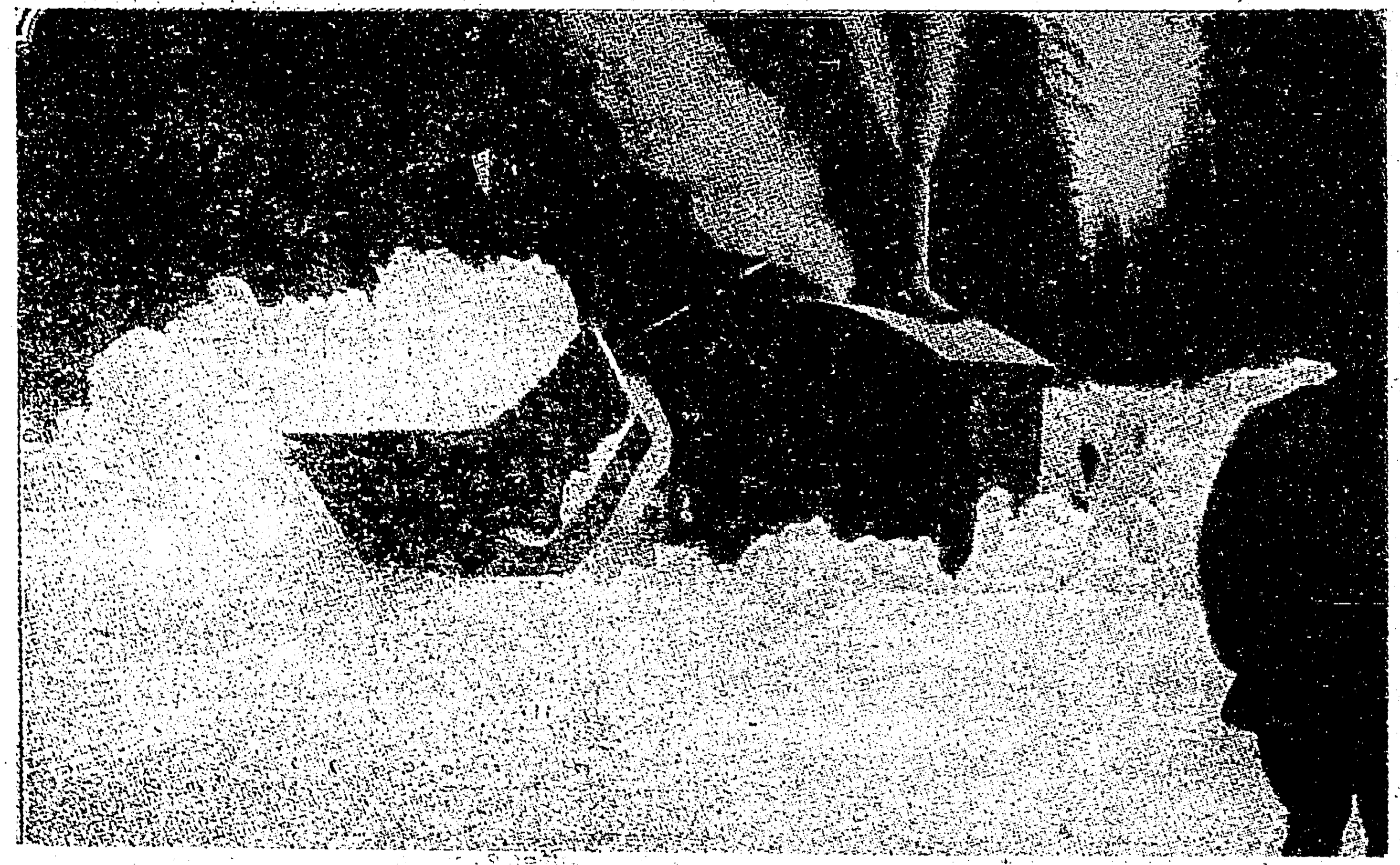

রাস্তা পরিষ্কার হবার সঙ্গে সঙ্গে তুষার রাশিও গাড়ীতে বোঝাই হচ্ছে

শূন্যে বাড়ীর অবস্থান—

আমরা ছেলেবেলায় গল্পের বইয়ে পড়েছি যে, দৈত্যরাই সুপ্ত রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁর বিশাল রাজপ্রাসাদটীও একস্থান থেকে স্থানান্তরিত করে। কিন্তু বোধ হয় শীঘ্রই সে উপকথা সত্য কথায় পরিণত হবে। সম্প্রতি Pittersburg সহরে একখানি আটতলা বাড়ীকে মাটী থেকে প্রায় ৪০ ফিট উপরে শূন্যে তোলা হ'য়েছে। তোলবার কারণ হ'চ্ছে এই যে, বাড়ীটির সর্ব্বনিম্নতলায় একটী বড় গুদামঘর তৈরী কর্ব্বার প্রয়োজন হয়। বাড়ীটির ওজন প্রায় ৪,০০০ টন ; সুতরাং সেটাকে শূন্যে তুলতে হ'লে, বাস্তবিকই দানবীয় শক্তির

প্রয়োজন। কিন্তু উন্নত বিজ্ঞান-শক্তির সাহায্যে কেবলমাত্র ১২টি জ্যাক-স্ক্রু লাগিয়ে বাড়ীটিকে শূন্যে তোলা হ'য়েছে।

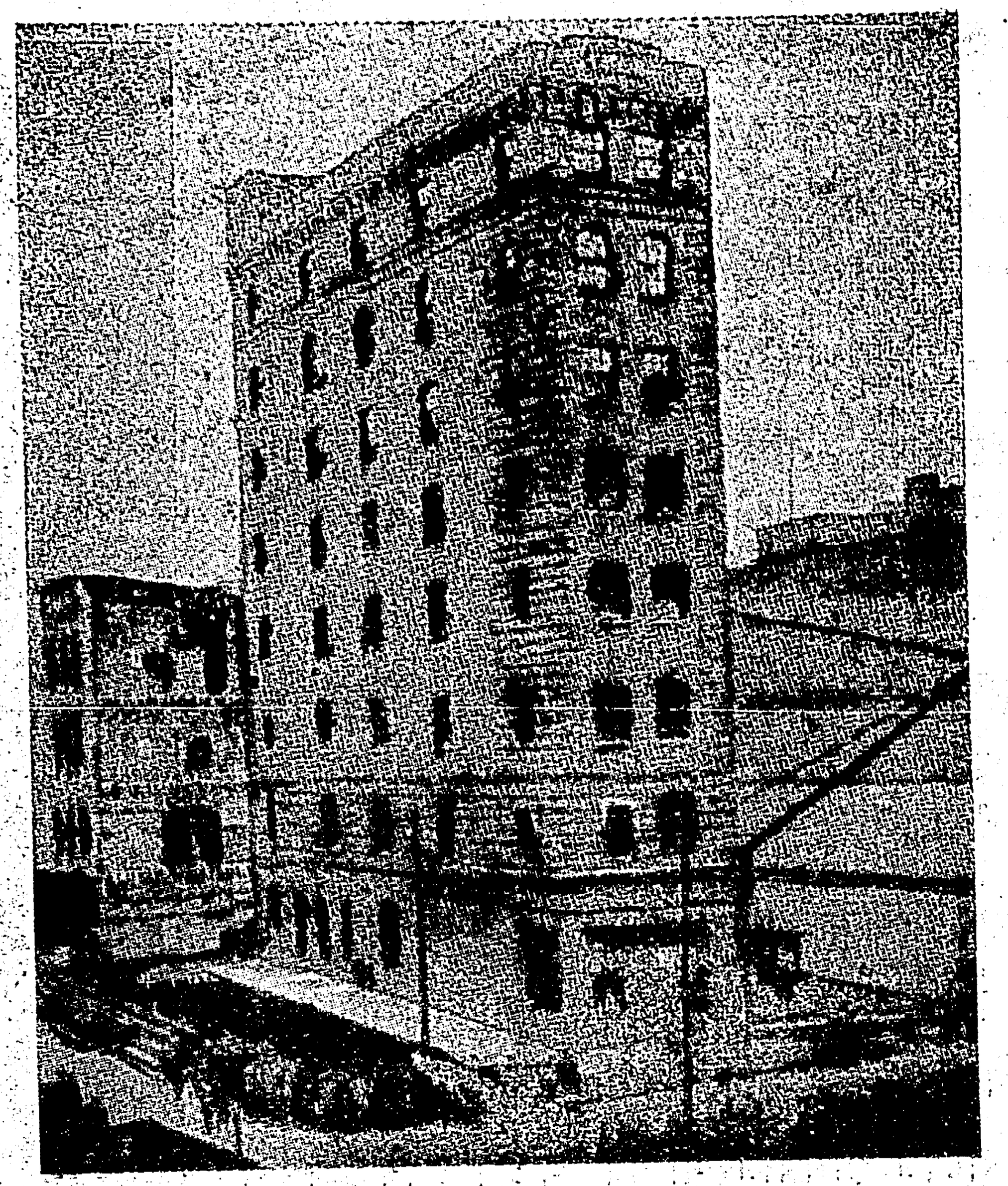

শূন্যে উত্তোলিত অট্টালিকা। (বাড়ী মাটী হ'তে শূন্যে তোলবার পর কারিগরেরা বাড়ীর তলায় গুদাম ঘর তৈরী কর্ব্বার আয়োজন কচ্ছে।)

নানা প্রকার অপঘাত মৃত্যুর ইতিহাস—

অপঘাতে প্রত্যহ দেশে বিদেশে এত লোক মৃত্যুমুখে পড়ছে যে, তার সংখ্যা হয় না। আমেরিকা এ বিষয়ে সমস্ত দেশকে পরাস্ত ক'রেছে। ১৯২০ সালে হিসাব ক'রে দেখা গিয়াছে যে, অপঘাত মৃত্যুতে এক বৎসরে আমেরিকায় ইংলণ্ডের প্রায় দ্বিগুণ লোক মারা পড়েছে। এর জন্য জনসাধারণ দায়ী করেন বিজ্ঞানকেই ; কারণ বিজ্ঞানের উন্নতিতে নানা প্রকার যন্ত্রের উদ্ভাবন হ'য়েছে, এবং সেই যন্ত্রের ব্যবহার বা অপব্যবহারই আজ এত লোকের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে। প্রত্যহ নানা কল-কারখানায় কাজ কর্ব্বার সময় দৈবদুর্ব্বিপাকে প্রায় শতকরা সাড়ে তিনজন কি চার জন লোক মারা পড়ছে— আকস্মিক পতনে, অসাবধানীর বন্দুকের গুলিতে, জলমগ্ন হ'য়ে বা অগ্নিদগ্ধ হয়ে। এই রকম নানা কারণে যে সব লোক নিয়ত মৃত্যুমুখে পতিত হ'চ্ছে, তা'দের মৃত্যুর জন্য বাস্তবিকই দায়ী হ'চ্ছে জগতের উন্নত বিজ্ঞান। অপঘাত মৃত্যুর হার ইদানীং এত বেশী বৃদ্ধিলাভ ক'রেছে যে, শুধু আমেরিকাতে প্রত্যহ কেবল মটর গাড়ী চাপা পড়েই প্রায় ৩৫ জন লোককে ইহলোক ত্যাগ ক'রে যেতে হ'চ্ছে।

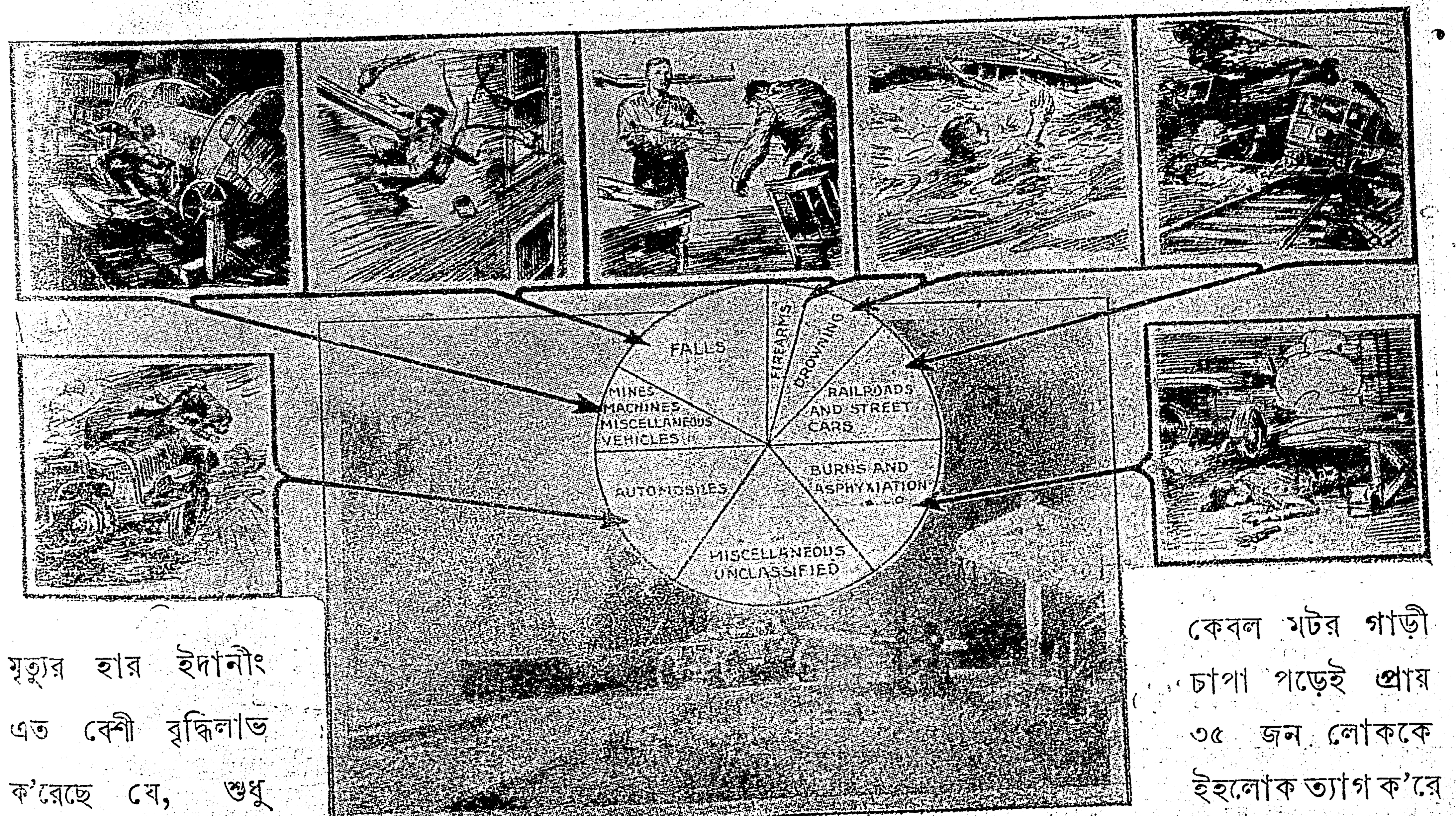

নানা প্রকার অপঘাত মৃত্যু কিসে ঘটে

সূর্য্যের অভ্যন্তরের বিবরণ—

আমাদের মত সাধারণ লোকের চোখে বাহিরে থেকে দে'খে মনে হয়, সূর্য্য যেন একটি অগ্নিময় গোলক। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের এই সাধারণ দৃষ্টিতে সন্তুষ্ট না হ'য়ে সূর্য্যের অভ্যন্তরের সঠিক খবরটা জান্‌বার জন্য বহু চেষ্টা ও অনেক অর্থব্যয় ক'র্‌ছেন। সম্প্রতি জার্ম্মাণীর একজন বৈজ্ঞানিক সূর্য্যের বিষয়ে অনেক অভিনব তথ্য আবিষ্কার ক'রেছেন। তিনি বলেন যে সূর্য্য তিন ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগ অর্থাৎ মধ্য-প্রদেশ (Photosphere) আমাদের পৃথিবীর মত; সূর্য্যের এই স্থানের মাটী আমাদের পৃথিবীর মাটীর মত। দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশের উপর দিকটা (chromosphere) একটা অগ্নিময়

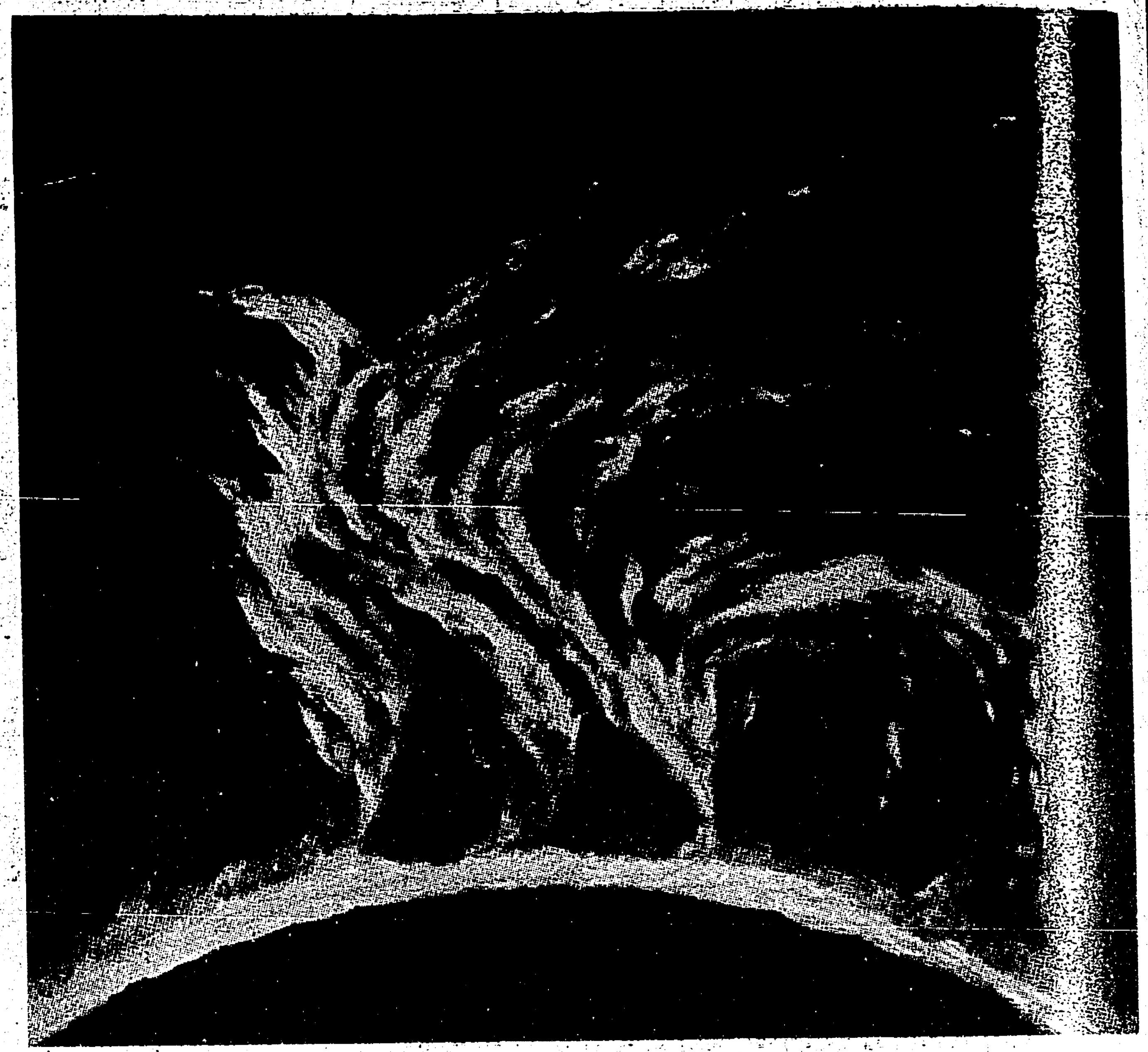

সূর্য্যের অগ্নিময় ক্ষেত্র

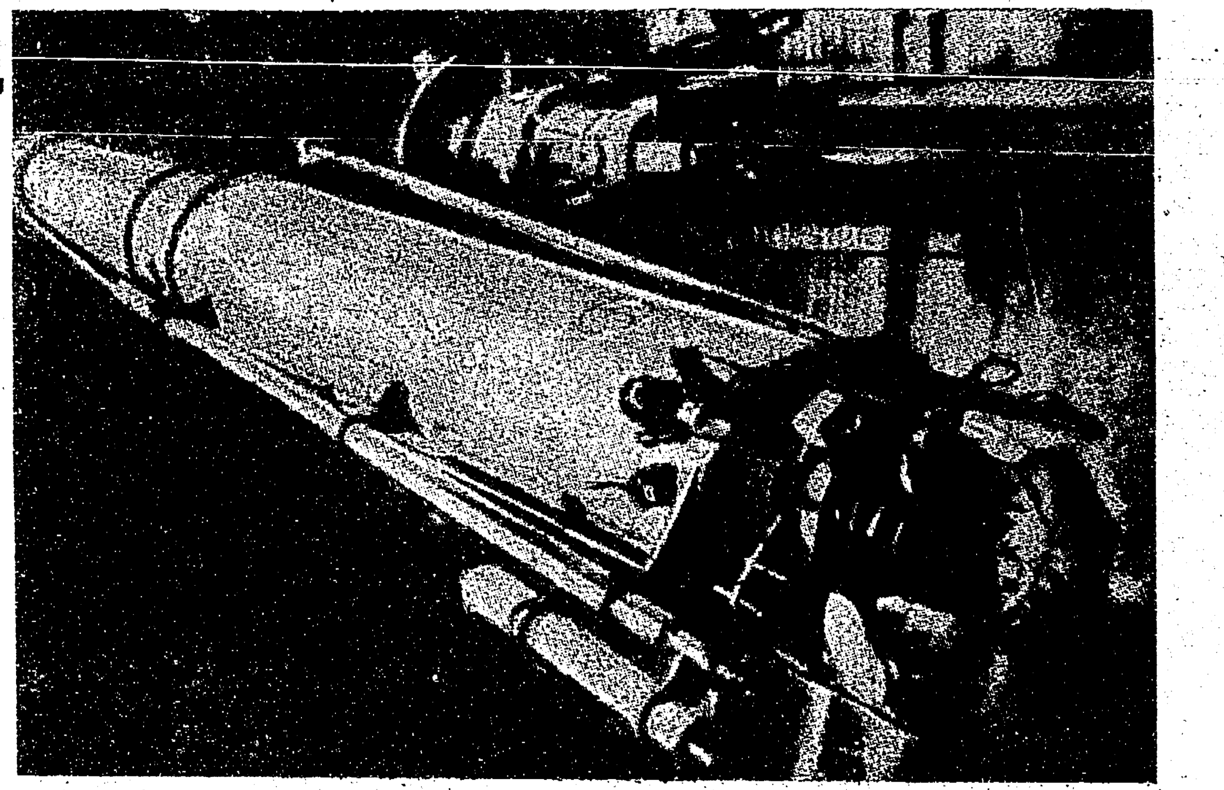

দূরবীণ নিয়ে বৈজ্ঞানিক সূর্য্যের অভ্যন্তরের পরীক্ষা করছেন

ক্ষেত্র—এইখান থেকেই আমরা দিবাভাগে আলোক পাই। অগ্নিময় ক্ষেত্র ৫০০০ থেকে প্রায় ১,০০,০০০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত; এবং তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ সূর্য্যের একেবারে বাইরের দিকটা—বেটা অগ্নি-ক্ষেত্রের শেষ সীমা থেকে যাত্রা ক'রে ক্রমে ধীরে ধীরে একাবারে অনন্তের মধ্যে এসে মিশে গে'ছে।

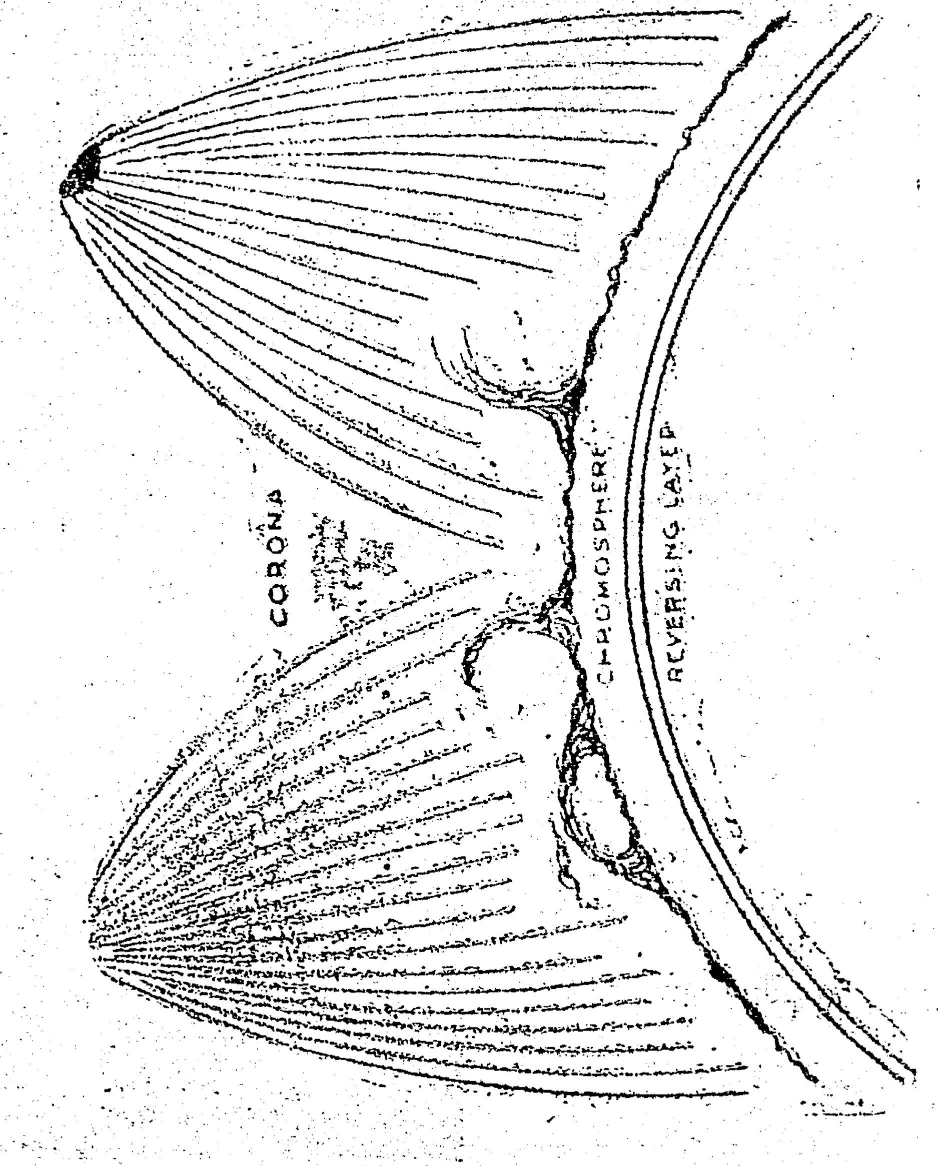

সূর্য্যের মণ্ডলত্রয়

ব্যায়াম সাধন যন্ত্র—

ব্যায়াম কর্ব্বার সময় অনেক লোক খুব শীঘ্রই শ্রান্ত হ'য়ে পড়েন। এটা তাঁদের মাংসপেশীর শ্রান্তি মোটেই নয়, তাঁদের মনের বিকার মাত্র। ঐ বিকারের কুহকে পড়ে অনেক ব্যক্তি ব্যায়াম অভ্যাস ক'রেও তাঁদের শরীরের উন্নতি করিতে পারেন না। এই বিকারের কুহক দূর করার জন্য একজন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক ডাঃ আর ডবলিউ, সুল্‌ট (Dr. R. W. Schulte) এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার ক'রেছেন, যা'তে মাংসপেশীর শ্রান্তি খুব শীঘ্র ও অতি সহজেই ধরা পড়ে যাবে। এমন কি আরও কতক্ষণ ব্যায়াম করলে শরীরের উন্নতি হ'বে বা হ'তে পারে তাও এই যন্ত্রের সাহায্যে সঠিকভাবে বলতে পারা যায়।

মাংসপেশীর শ্রান্তি নিরূপণ যন্ত্র

বজ্রের সহিত খেলা

বজ্রের সহিত খেলা—

কোনও বৈজ্ঞানিক যদি বিদ্যুৎপুঞ্জ নিয়ে খেলা করার চেষ্টা করেন, আমরা তাঁকে ত বাতুল বলিবই এবং তাঁর মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী সেটাও আমরা অবিলম্বে অনুমান ক'রে নিতে পারি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বিপুল বৈদ্যুতিক শক্তিও একজন বৈজ্ঞানিকের কাছে সহজেই পরাজিত হ'য়েছে। আর্ল হোম্ (Earl Holm) কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ইনি প্রায়ই তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে বসে বজ্রবিদ্যুৎ নিয়ে খেলা ক'রে থাকেন। অনেকে অনুমান করেন যে, তাঁর এই অসমসাহসিক খেলার মধ্যে নিশ্চয়ই একটু গোপন রহস্য আছে, যা'র জন্য প্রচণ্ড বজ্রাগ্নিও তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না। সম্ভবতঃ যখন তিনি তড়িৎ প্রভৃতি নিয়ে খেলা করেন, তখন তাঁর চেয়ারখানি নিশ্চয় কোনও রকম একটি তাড়িৎ-শক্তি-রোধক যন্ত্রের উপর রেখে বসেন।

কুকুর পুলিশ—

দস্যু তস্কর বা পলাতক খুনী আসামীর নিকটস্থ হ'তে অনেক সাহসী গুপ্ত পুলিসেরও ভরসা হয় না, অথচ তাদের গ্রেপ্তার ক'রতে না পারলে শান্তি রক্ষারও সুবিধা হয় না। পুলিশের এই বিপজ্জনক কাজ যা'তে নিরাপদে সুসম্পন্ন হ'তে পারে, সেজন্য তারা নানা অভিনব উপায় অবলম্বন করে। সম্প্রতি তারা এমন এক শ্রেণীর কুকুর নিয়ে এসে

প্রতিপালন ও শিক্ষিত ক'র্ছে, যা'রা ভবিষ্যতে গুপ্ত পুলিশের অসাধ্য কার্য্যে বিশেষ সাহায্য কর্তে পার্বে।

কুকুর নকল চোরের হাত ধরেছে

বিজ্ঞান সাহায্যে বুদ্ধি নির্দ্ধারণ—

অনেক দেশের ইস্কুলে একই শ্রেণীতে বুদ্ধিমান ও নির্ব্বোধ দু'রকম ছাত্রই দেখা যায়। কিন্তু এই দু'রকম ছাত্র একসঙ্গে পড়লে, দু'দলেরই বিশেষ ক্ষতি হয়।

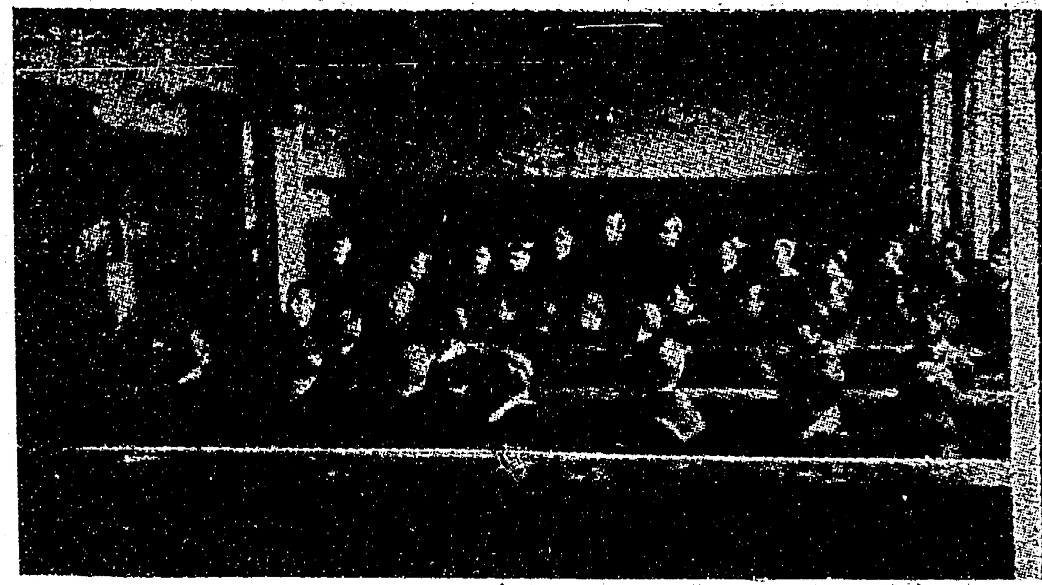

বালকগণকে স্ব স্ব বিভাগে ভর্ত্তি করবার পূর্ব্বের তাদের পরীক্ষা ক'রা হচ্ছে

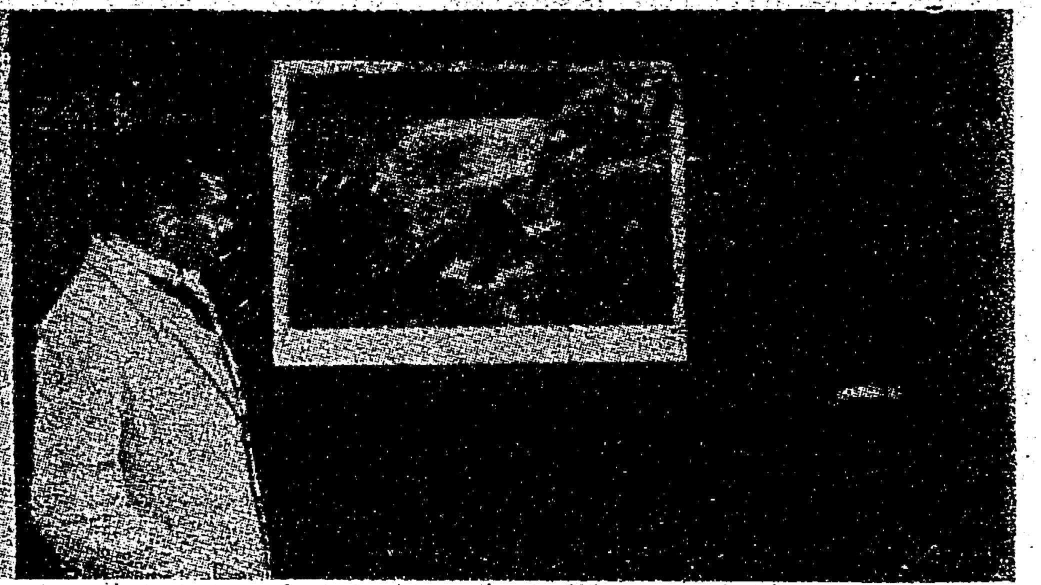

চিত্র সাহায্যে বালকের পরীক্ষা হ'চ্ছে

বুদ্ধিহীন বালকদের মেধাশক্তি অল্প; তা'দের কোনও বিষয় ভালরকম বোধগম্য হ'বার পূর্ব্বেই ক্লাসের নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। আবার বুদ্ধিমান ছেলেদের মেধাশক্তি বেশী বলে, তা'রা চট্ করে একটা ব্যাপার বেশ করে বুঝ্তে পারলেও, বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে শ্রেণীর অন্যান্য বালকদের না বোঝা পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে চুপ করে আটকে বসে থাক্তে বাধ্য হয়। এতে সময় নষ্ট হয় বলে, বুদ্ধিমান বালকদের যথাসময়ে জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ হয় না। এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্য আধুনিক মনস্তত্ত্ব-বিদ্গণ বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসের এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলেন যে, বুদ্ধিহীন বালকের সংখ্যা

চোর ধরবার কৌশল কুকুরকে শেখান হচ্ছে

বস্তুতঃ বিরল। আমরা যা'দের বুদ্ধিহীন মনে করি, বাস্তবিক তা'রা কিন্তু বুদ্ধিহীন নয়। নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা গ্রহণের দিক থেকে হয় ত তা'রা বুদ্ধিহীন, কিন্তু অন্য ধারে একদিকে আবার দেখা যায় যে, তাদের জ্ঞানের বেশ উত্তম বিকাশ হ'য়েছে। এই জন্য মনস্তত্ত্ববিদেরা পরীক্ষা ক'রে বালকদেব স্ব স্ব উপযোগী শ্রেণীতে ভর্ত্তি করে দেবার পক্ষপাতী। পরীক্ষক হয় ত ছেলেদের একখানি এঞ্জিন ও তা'র কলকব্জাগুলি দে'খালেন। কোনও কোনও বালক ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই এঞ্জিন ও তা'র কলকব্জাগুলি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ক'রে ফেললে; কিন্তু বাকী ছেলেরা পারলে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বালকেরা যে যান্ত্রিক বিভাগে

ভর্ত্তি হ'বার উপযুক্ত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। আবার পরীক্ষক যখন একখানি সুন্দর ছবি দেখিয়ে তা'র মর্ম্ম বুঝিয়ে দিলেন, তখন অবশিষ্ট দলেরকোনও কোনও ছেলে তৎক্ষণাৎ সেটা বুঝ্তে পেরে চিত্রখানির একটি সুন্দর ও সঠিক বিবরণ এমন কি নকল পর্য্যন্তও ক'রে দিতে পার্লে, তখন তা'রা যে চিত্র বিভাগে যাবার উপযুক্ত সেটা বুঝ্তে আর বাকী থাকে না। এই রকম পরীক্ষার পর বালকদের শ্রেণী বিভাগ করাই কর্ত্তব্য এবং এইটাই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত।

রেডিয়ম মিশ্রিত পানীয়

ব্যাধিতে রেডিয়াম—

আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক Dr. C. Everett Field বলেন যে রেডিয়াম নাকি মানুষের বিগত যৌবন ফিরিয়ে আন্তে পারে। তিনি আরও বলেছেন যে, নিয়মিতভাবে রেডিয়াম মিশ্রিত জলপান কর্লে প্রত্যেক লোক তার জীবনের ১৫ বৎসর পূর্ব্বেকার অবস্থা পুনর্ব্বার ফিরে পাবে। বিকলাঙ্গ দেহে রেডিয়ামের প্রলেপ দিলে সেই বিকলাঙ্গ নাকি অত্যাশ্চর্য্য-রূপে সেরে উঠে। স্নায়ু ও মাংসপেশীর উপরও রেডিয়ামের আধিপত্য নাকি প্রমাণ হ'য়ে গেছে। এমন কি ভীষণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীও নাকি রেডিয়ামের কৃপায় নিজের হৃত স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হচ্ছে।

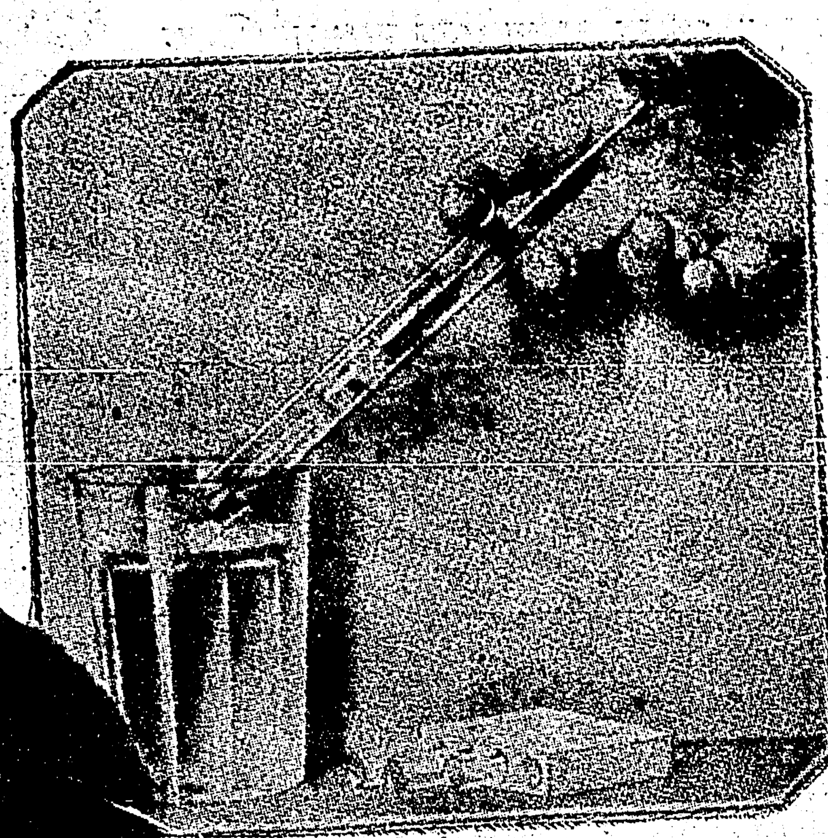

যন্ত্রের দ্বারা জলে রেডিয়াম মিশান হচ্ছে

নরমুণ্ডের ঘড়ি—

দেশ-বিদেশে অনেকে অনেক রকম ঘড়ি ব্যবহার করে। কেউ বা আরব সংখ্যাযুক্ত আবার কেউ কেউ রোমক সংখ্যাযুক্ত ঘড়ি ব্যবহার করে। কিন্তু কিছুদিন হ'ল আমেরিকার

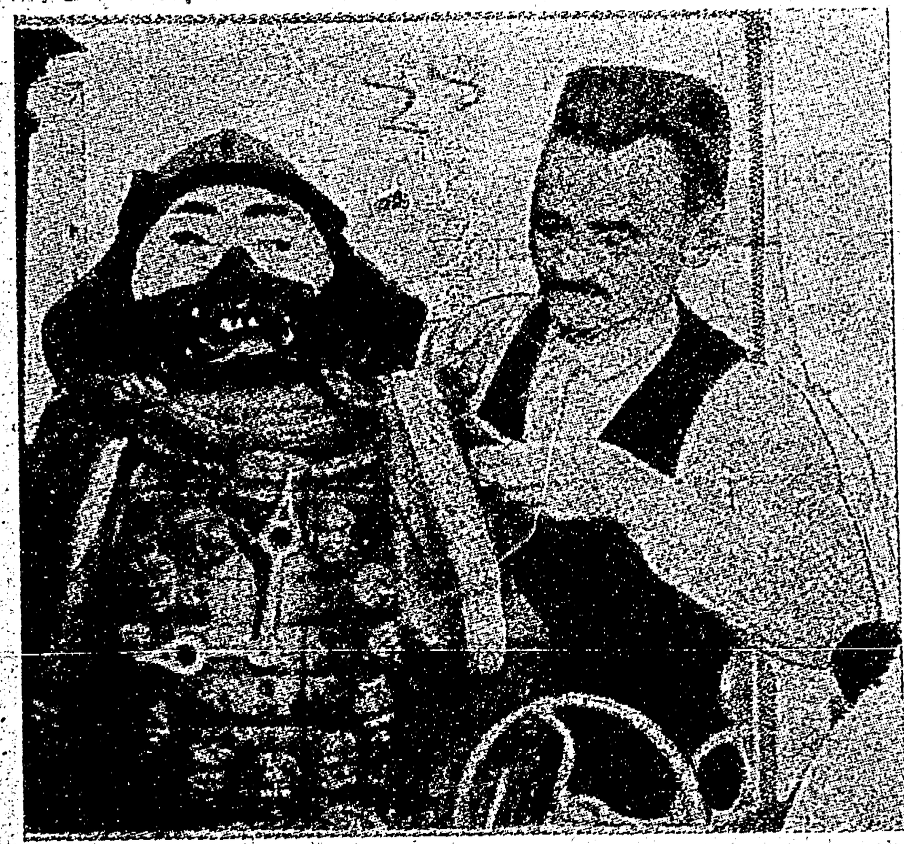

নরমুণ্ডের ঘড়ি

কোনও কারখানায় এক অদ্ভুত ঘড়ির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিপালন ও শিক্ষিত ক'রছে, যা'রা ভবিষ্যতে গুপ্ত পুলিশের অসাধ্য কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করতে পারবে।

কুকুর নকল চোরের হাত ধরেছে

চোর ধরবার কৌশল কুকুরকে শেখান হচ্ছে

বিজ্ঞান সাহায্যে বুদ্ধি নির্দ্ধারণ—

অনেক দেশের ইস্কুলে একই শ্রেণীতে বুদ্ধিমান ও নির্ব্বোধ দু'রকম ছাত্রই দেখা যায়। কিন্তু এই দু'রকম ছাত্র একসঙ্গে পড়লে, দু'দলেরই বিশেষ ক্ষতি হয়।

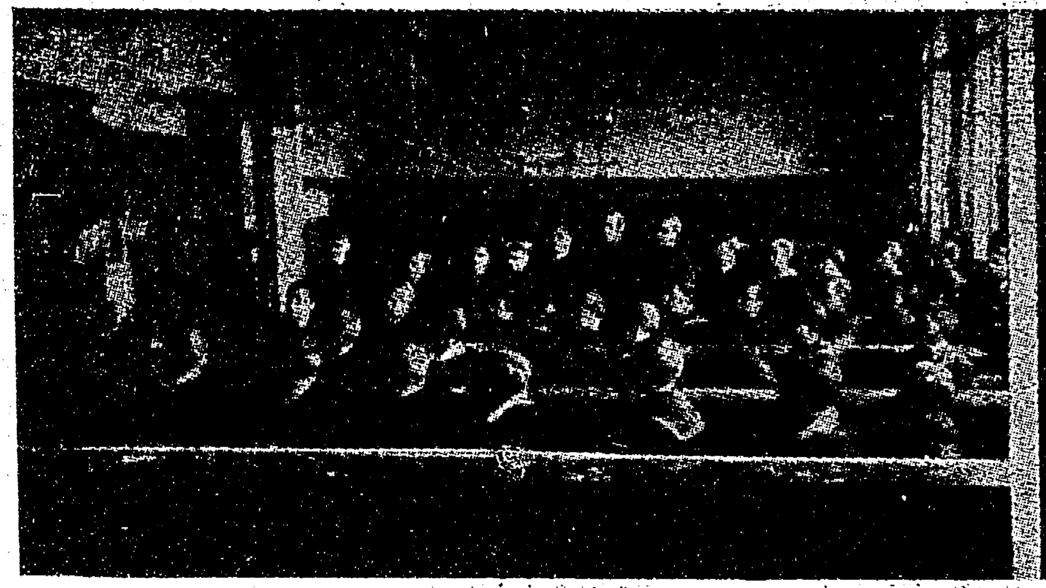

বালকগণকে স্ব স্ব বিভাগে ভর্ত্তি করবার পূর্ব্বের তাদের পরীক্ষা ক'রা হচ্ছে

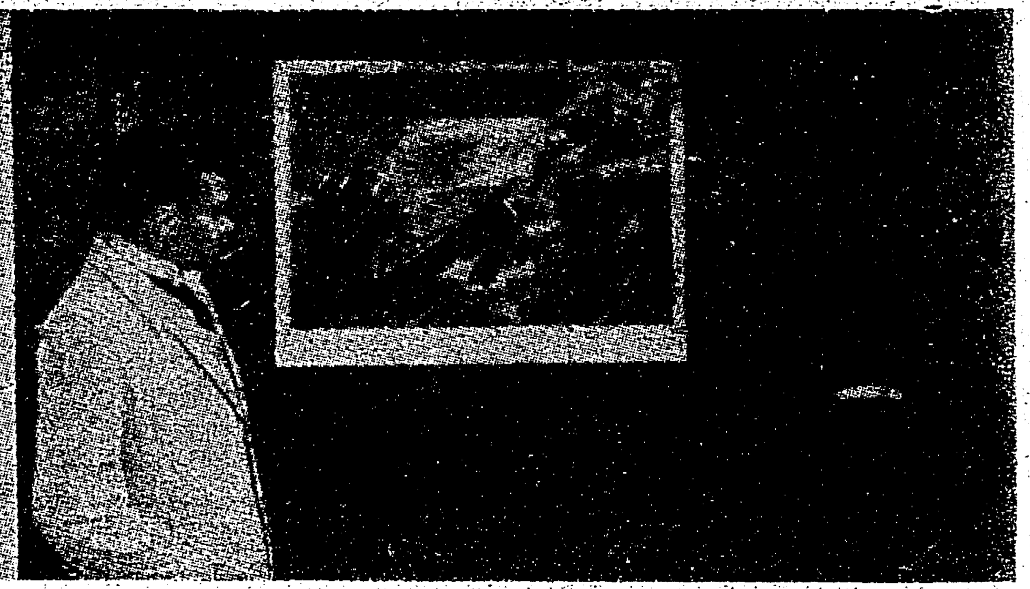

চিত্র সাহায্যে বালকের পরীক্ষা হ'চ্ছে

বুদ্ধিহীন বালকদের মেধাশক্তি অল্প; তা'দের কোনও বিষয় ভালরকম বোধগম্য হ'বার পূর্ব্বেই ক্লাসের নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। আবার বুদ্ধিমান ছেলেদের মেধাশক্তি বেশী বলে, তা'রা চট্ করে একটা ব্যাপার বেশ করে বুঝ্তে পারলেও, বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে শ্রেণীর অন্যান্য বালকদের না বোঝা পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে চুপ করে আটকে বসে থাক্তে বাধ্য হয়। এতে সময় নষ্ট হয় বলে, বুদ্ধিমান বালকদের যথাসময়ে জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ হয় না। এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্য আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসের এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলেন যে, বুদ্ধিহীন বালকের সংখ্যা বস্তুতঃ বিরল। আমরা যা'দের বুদ্ধিহীন মনে করি, বাস্তবিক তা'রা কিন্তু বুদ্ধিহীন নয়। নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা গ্রহণের দিক থেকে হয় ত তা'রা বুদ্ধিহীন, কিন্তু অন্য আর একদিকে আবার দেখা যায় যে, তাদের জ্ঞানের বেশ উত্তম বিকাশ হ'য়েছে। এই জন্য মনস্তত্ত্ববিদেরা পরীক্ষা ক'রে বালকদেব স্ব স্ব উপযোগী শ্রেণীতে ভর্ত্তি করে দেবার পক্ষপাতী। পরীক্ষক হয় ত ছেলেদের একখানি এঞ্জিন ও তা'র কলকজ্জাগুলি দে'খালেন। কোনও কোনও বালক ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই এঞ্জিন ও তা'র কলকজ্জাগুলি সম্পূর্ণরূপে আরত্ত ক'রে ফেললে; কিন্তু বাকী ছেলেরা পারলে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বালকেরা যে যান্ত্রিক বিভাগে

ভর্ত্তি হ'বার উপযুক্ত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। আবার পরীক্ষক যখন একখানি সুন্দর ছবি দেখিয়ে তা'র মর্ম্ম বুঝিয়ে দিলেন, তখন অবশিষ্ট দলেরকোনও কোনও ছেলে তৎক্ষণাৎ সেটা বুঝ্তে পেরে চিত্রখানির একটি সুন্দর ও সঠিক বিবরণ এমন কি নকল পর্য্যন্তও ক'রে দিতে পারলে, তখন তা'রা যে চিত্র বিভাগে যাবার উপযুক্ত সেটা বুঝতে আর বাকী থাকে না। এই রকম পরীক্ষার পর বালকদের শ্রেণী বিভাগ করাই কর্ত্তব্য এবং এইটাই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত।

রেডিয়ম মিশ্রিত পানীয়

ব্যাধিতে রেডিয়াম—

আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক Dr. C. Everett Field বলেন যে রেডিয়াম নাকি মানুষের বিগত যৌবন ফিরিয়ে আন্তে পারে। তিনি আরও বলেছেন যে, নিয়মিতভাবে রেডিয়াম মিশ্রিত জলপান করলে প্রত্যেক লোক তার জীবনের ১৫ বৎসর পূর্ব্বেকার অবস্থা পুনর্ব্বার ফিরে পাবে। বিকলাঙ্গ দেহে রেডিয়ামের প্রলেপ দিলে সেই বিকলাঙ্গ নাকি অত্যাশ্চর্য্যরূপে সেরে উঠে। স্নায়ু ও মাংসপেশীর উপরও রেডিয়ামের আধিপত্য নাকি প্রমাণ হ'য়ে গেছে। এমন কি ভীষণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীও নাকি রেডিয়ামের কৃপায় নিজের হৃত স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হচ্ছে।

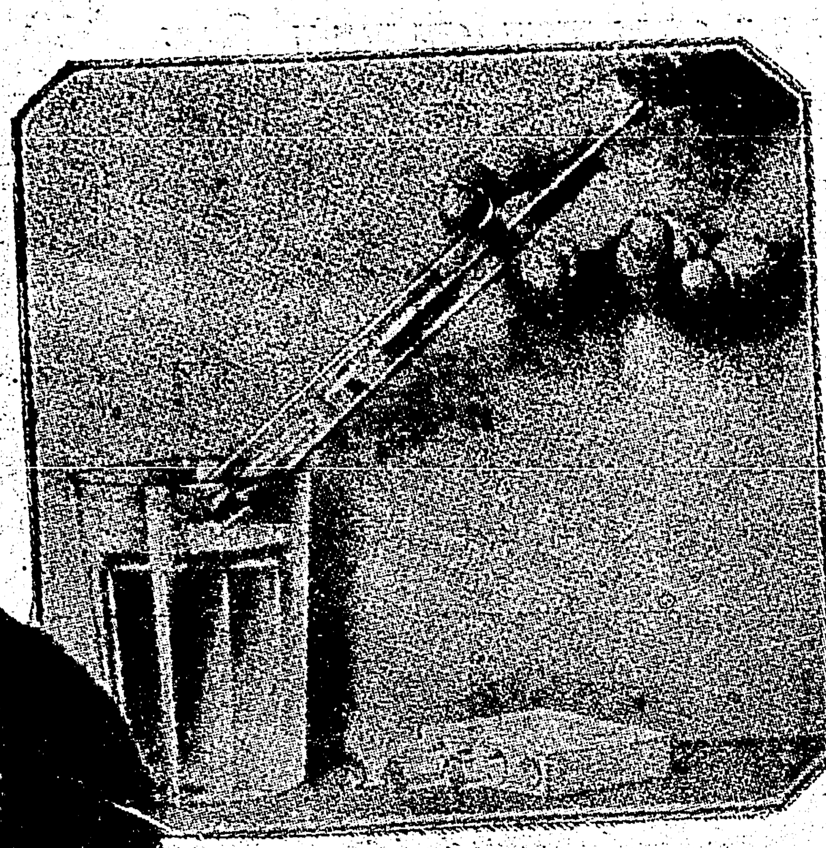

যন্ত্রের দ্বারা জলে রেডিয়াম মিশান হচ্ছে

নরমুণ্ডের ঘড়ি—

দেশ-বিদেশে অনেকে অনেক রকম ঘড়ি ব্যবহার করে। কেউ বা আরব সংখ্যাযুক্ত আবার কেউ কেউ রোমক সংখ্যাযুক্ত ঘড়ি ব্যবহার করে। কিন্তু কিছুদিন হ'ল আমেরিকার কোনও কারখানায় এক অদ্ভুত ঘড়ির সৃষ্টি হয়েছে।

নরমুণ্ডের ঘড়ি

ঘড়ির সাধারণ আকৃতির পরিবর্ত্তে একটি আদিম বর্ব্বর মানুষের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়েছে, সেই মানুষের বুকের মাঝখানে একত্রে গ্রথিত দ্বাদশটি নরমুণ্ডের মালা সংলগ্ন আছে। কাঁটা যখন এক মুণ্ড থেকে অপর এক মুণ্ডের দিকে চলে যায়, তখন কটা বেজে কত মিনিট হয়েছে তা' সহজেই বলা যেতে পারে।

ব্যাধি ও স্বভাব নিরূপণ যন্ত্র—

একজন জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক ডাঃ বারগার (Dr. Burger) প্লাসটোমিটার (Plastometer) নামে এমন এক অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার ক'রেছেন, যা'র সাহায্যে মানুষের মনের কথা সমস্ত বলা যেতে পারে। এছাড়া কোনও লোকের ব্যাধি হ'বার আশঙ্কা আছে কিনা, আর সে ব্যাধি শীঘ্র কি বিলম্বে হ'বে, এমন কি আক্রমণের সঠিক সময় পর্য্যন্তও এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি অব্যর্থ বল্‌তে পারেন। কে বক্তা, কে গায়ক, কে যন্ত্রী, কে শিল্পী, কে ভাস্কর, কে কারিগর, এসবও তিনি ঐ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা ক'রে নির্ভুলভাবে ব'লতে পারেন।

স্বভাব নিরূপণ করবার যন্ত্র

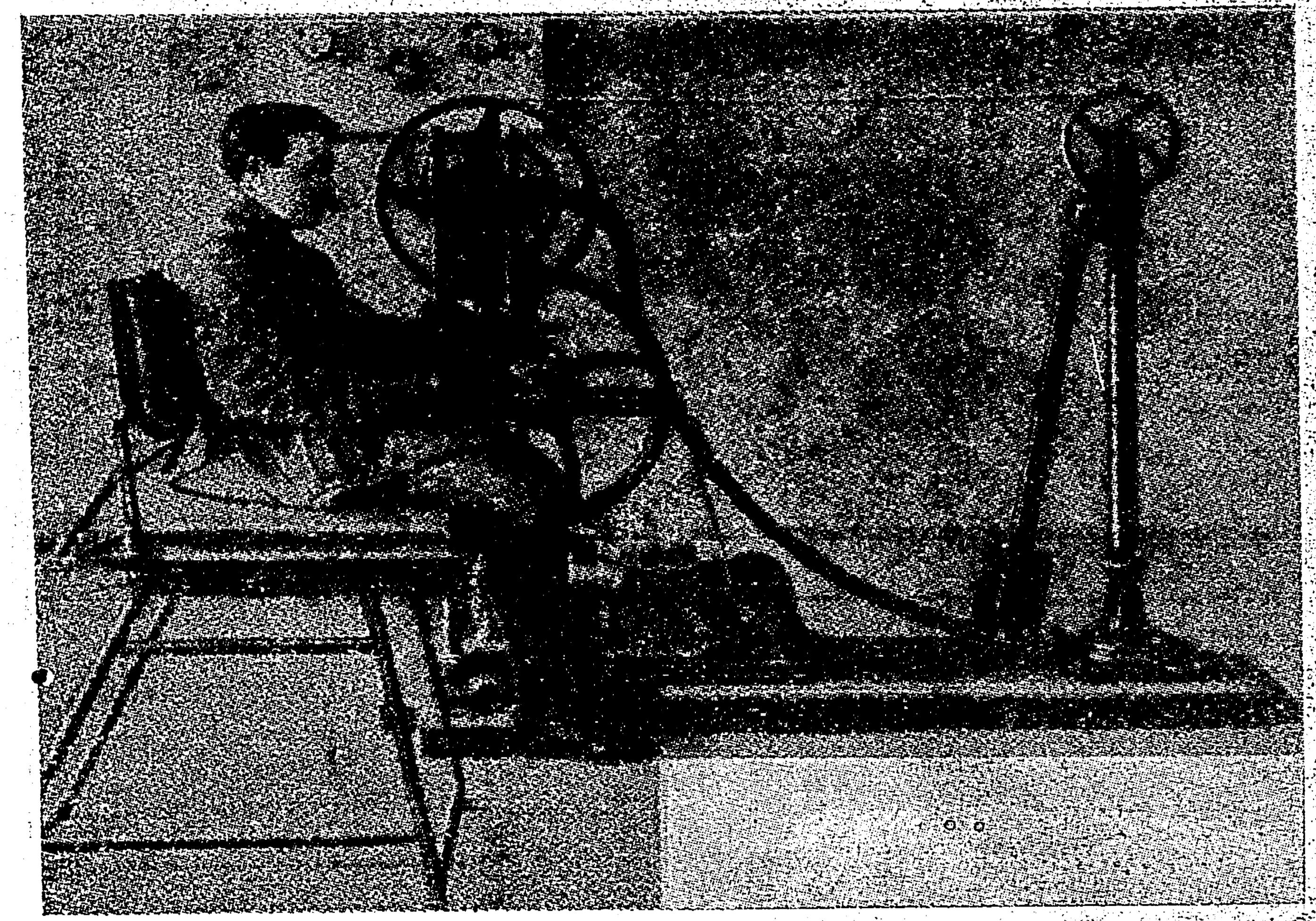

হাতভাঙার চিকিৎসা

সন্ধিস্থল ভেঙে গেলে সারাবার যন্ত্র

অস্ত্রাঘাতে বা পড়ে গিয়ে কারুর যদি হাত পা বা শরীরের অন্য কোনও সন্ধিস্থল ভেঙে যায়, তা'হলে সে আর সারে না ; আর যদিও বা সারে তা'হলেও শরীরের সে অংশ কম জোর ও অকর্ম্মণ্য, হ'য়ে যায়। এই বিপদ দূর কর্ব্বার উদ্দেশ্যে একজন ফরাসী চিকিৎসক একটি সুন্দর ব্যায়াম-সাধনের যন্ত্র উদ্ভাবিত ক'রেছেন, যা'তে শরীরের আহত স্থান আবার পূর্ব্বতন সুস্থ অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হ'তে পারে। এই যন্ত্রের কলকব্জাগুলি এমন সুন্দর যে, রোগী যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবেই অবস্থান ক'রে চিকিৎসা গ্রহণ কর্ত্তে পারে। চিকিৎসা গ্রহণ কর্ব্বার সময় যন্ত্রের কৌশলে রোগীর আহত স্থানে কিছুমাত্র বেদনা বোধ হয় না।

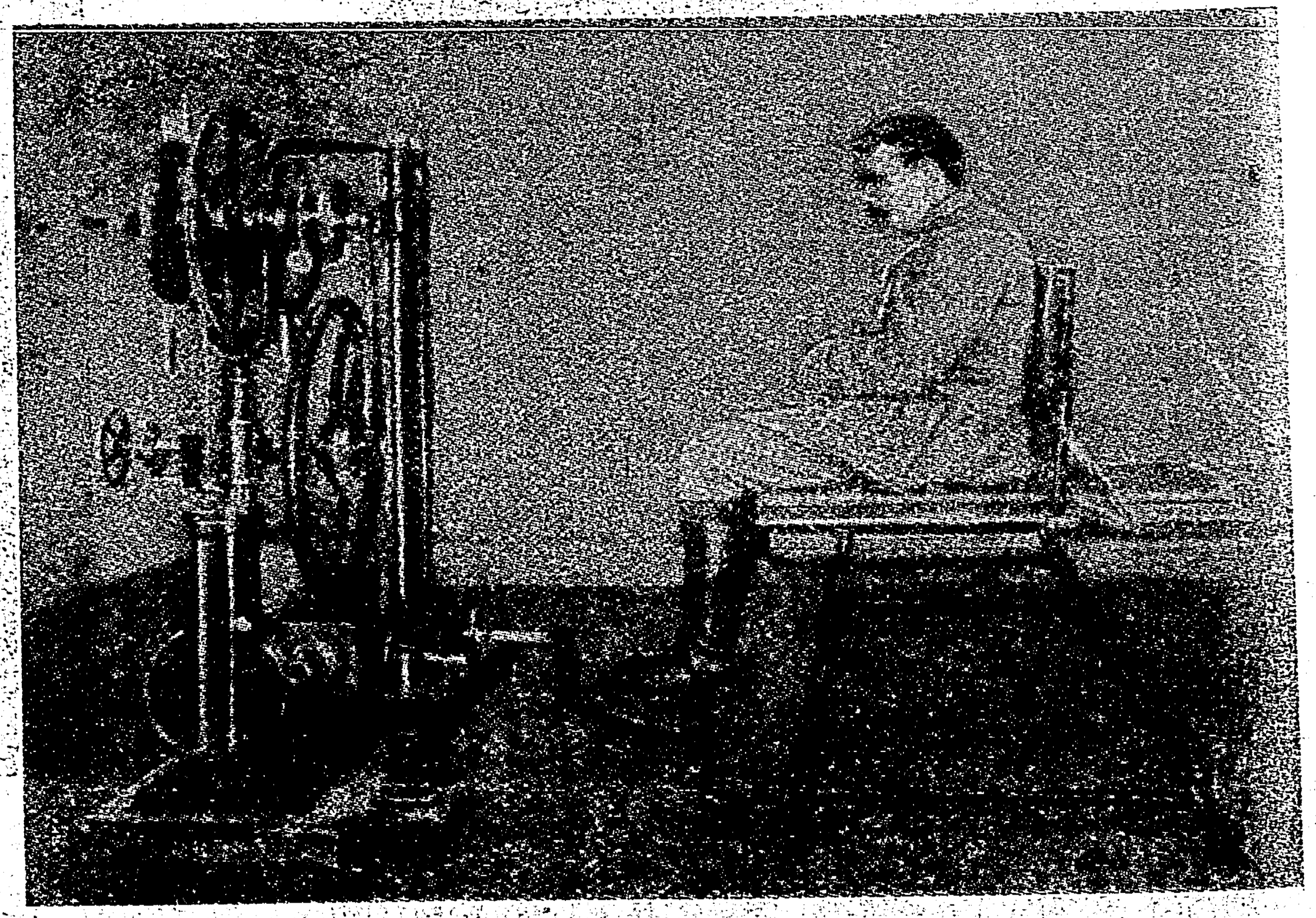

পা-ভাঙার চিকিৎসা

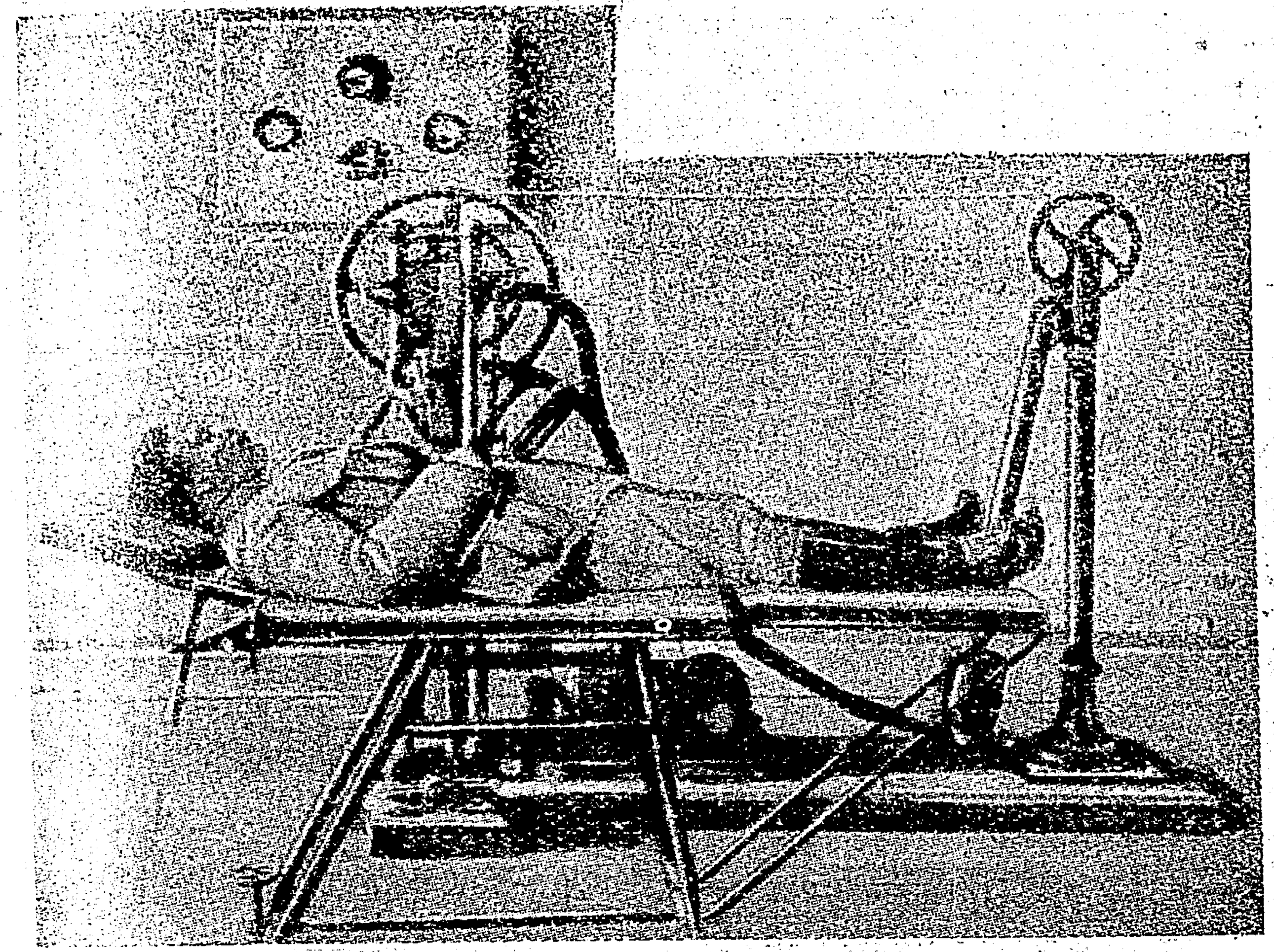

কোমর ও ঘাড় ভাঙার চিকিৎসা

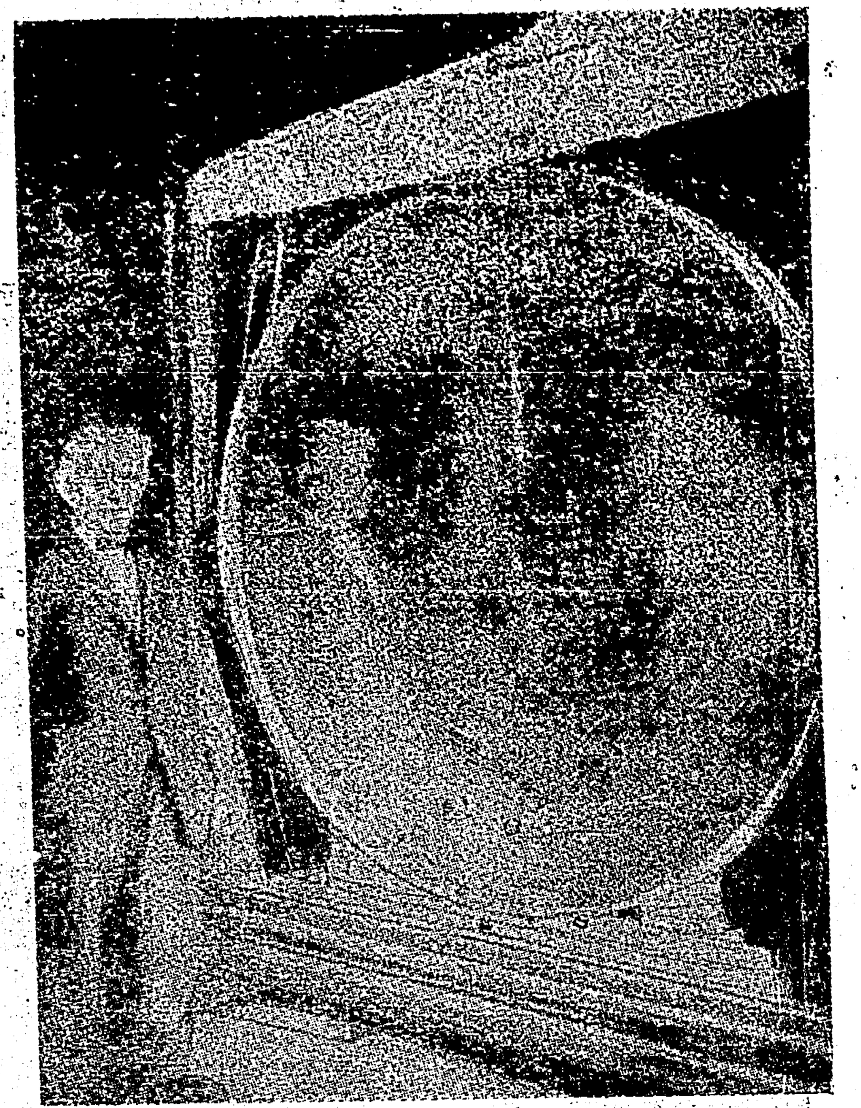

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম দূরবীক্ষণের মুখ

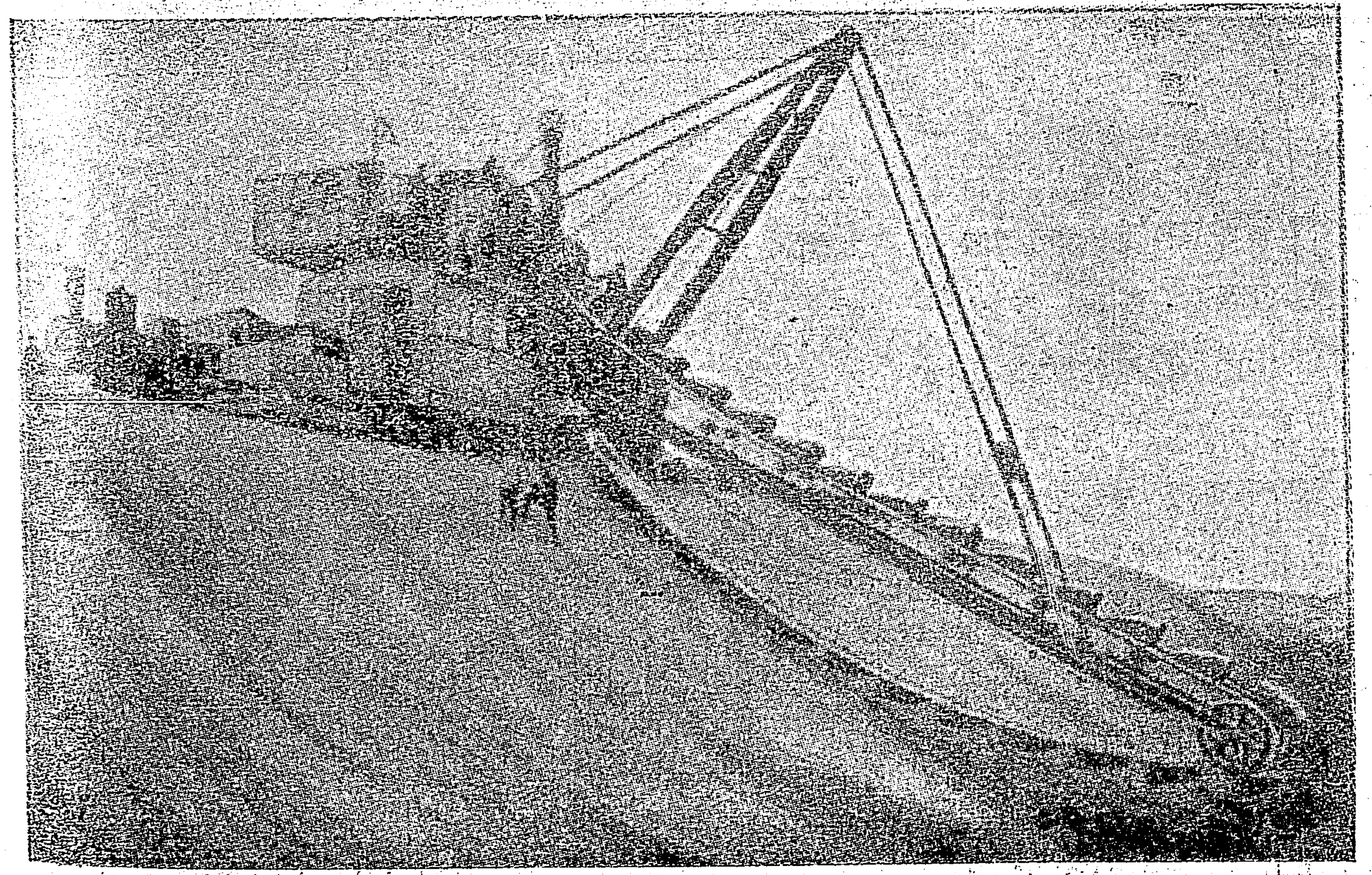

মাটী খোঁড়বার, তোলবার ও বোঝাই করবার যন্ত্র

মাটী খুঁড়িবার যন্ত্র—

বাড়ীর ভিত্তি ও খনির খাদ আরম্ভ কর্ব্বার সময় মাটী খননের জন্য বিস্তর কুলি মজুর, বিপুল অর্থ ও যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়। এই সকল অসুবিধা যাতে না ভোগ কর্ত্তে হয় এজন্য এক রকম যন্ত্র তৈরী হয়েছে, যা দিয়ে মাটী খুড়ে তুলে ফেলে গাড়ী বোঝাই দিতেও কোনও লোকের সাহায্যের দরকার হয় না। এই যন্ত্রে আপনা-পনিই সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

অক্সিজেন—

আমাদের দেশে রোগীর একেবারে অন্তিম সময়ে আমরা Oxygen গ্যাস ব্যবহার করি ; কিন্তু বিলাতে Oxygen বহু ব্যাধির প্রতিষেধক হিসাবে সদা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হচ্ছে, বিশেষতঃ ফুসফুসের রোগে ঐ গ্যাস বিশেষ ফলপ্রদ। ডাঃ পোল্‌টন (Poalton) সাহেব গায় (Guy) হাঁসপাতালে একটি ঘর নির্ম্মাণ করেছেন সে ঘরটি সদা সর্ব্বদা টাট্‌কা Oxygen গ্যাসে পরিপূর্ণ থাকে।

সেই ঘরের মধ্যে যে হৃদ্‌রোগীকেই শোয়ান যায় ৪।৫ দিন পরে দেখা যায় যে সে রোগী একাবারে সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে।

খোলাফ্রেমের সাশী

নক্ষত্রের উত্তাপ-নিরূপণ যন্ত্র

চলচ্চিত্র—

মঙ্গলগ্রহের চলচ্চিত্র তোলবার জন্য ডাঃ টড একপ্রকার যন্ত্র তৈরী করিয়েছেন। সেই যন্ত্রের কাজ আগামী ভাদ্র মাস থেকে আরম্ভ হবে, কারণ ঐ সময়ে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর খুব সন্নিকটে আসে, সেই সময়ে ছবি তোলবার খুব সুবিধা হবে। এই যন্ত্রের বীক্ষণ-কাচ জগতের মধ্যে সব চেয়ে বড়—ইহার ব্যাস ৫ ফুট আড়াই ইঞ্চি।

সার্সি—

শীতকালেই হ'ক আর গ্রীষ্মকালেই হ'ক বাহিরের আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চল্‌তে না পারলে অসুখ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। অনেক বাটীতে এরূপ দেখা গেছে যে, বাটীর লোকেরা ছাতের উপরে শয়ন করেন, আবার কেউ কেউ সারারাত্রি ঘরে খুব জোরে বৈদ্যুতিক পাখা চালিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকেন। এ দু'টোই করা ভাল নয়, তবে যদি গায়ে কিছু চাপা দিয়ে শুতে পারেন তা'হলে বিশেষ ভয়ের কারণ নেই। অনেক সময়ে রাত্রে শয়ন কক্ষের আমরা সমস্ত জানালাই খুলে রাখি, এতে ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগ্‌বার বিশেষ সম্ভাবনা। আবার আমাদের বাড়ীর জানালাগুলি এরূপ ভাবে তৈয়ারী যে আমাদের মনের মত করিয়া সে সেগুলিকে খুলে রাখ্‌ব, তারও সুবিধা নাই। মানুষের মনের সৌখীন ভাবের সঙ্গে বাহিরের সৌন্দর্য্যের একটা নিরাপদ সাম্য স্থাপিত কর্‌বার উদ্দেশ্যে একজন বৈজ্ঞানিক কারিগর এক রকম সার্সির ব্যবস্থা করেছেন। সার্সিটির মাঝামাঝি আড়ভাবে কাটা আর তার কাঠের ফ্রেমগুলি এরূপভাবে তৈয়ারী যে, যখন ইচ্ছা সার্সিগুলি একেবারে খোলা যায়; যে রকমভাবে খুলে রাখবার ইচ্ছা সেইভাবে রাখা যায়। আবার পরিষ্কার কর্‌বার সময় সমস্ত সার্সিগুলি খুলে নিয়ে সার্সি ও জানালাটি পরিষ্কার ক'রে আবার ইচ্ছামত আটকে দেওয়া যায়।

ডিপ্‌থিরিয়া—

ডিপ্‌থেরিয়া রোগে সাধারণতঃ "ইনজেক্‌শন্‌" দেওয়া হয়। ইনজেক্‌শন সময় মত দেওয়া না হয় তা'হ'লে অস্ত্রোপচার কর্ত্তে হয়। কিন্তু সব সময়ে সেটা সুবিধাজনক হয় না। আমেরিকার সম্প্রতি ডাঃ লিনা (Lynap.) একপ্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন তাতে অস্ত্রোপচারের কোনও প্রয়োজন হয় না। সেই যন্ত্রের সাহায্যে যে সকল "গুল্ম" গলার মধ্যে জন্মায় সেগুলিকে ধীরে ধীরে অপসৃত ক'রে রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাস বেশ সরল করে দেওয়া যায়। মাত্র কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই এই যন্ত্রটীর অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

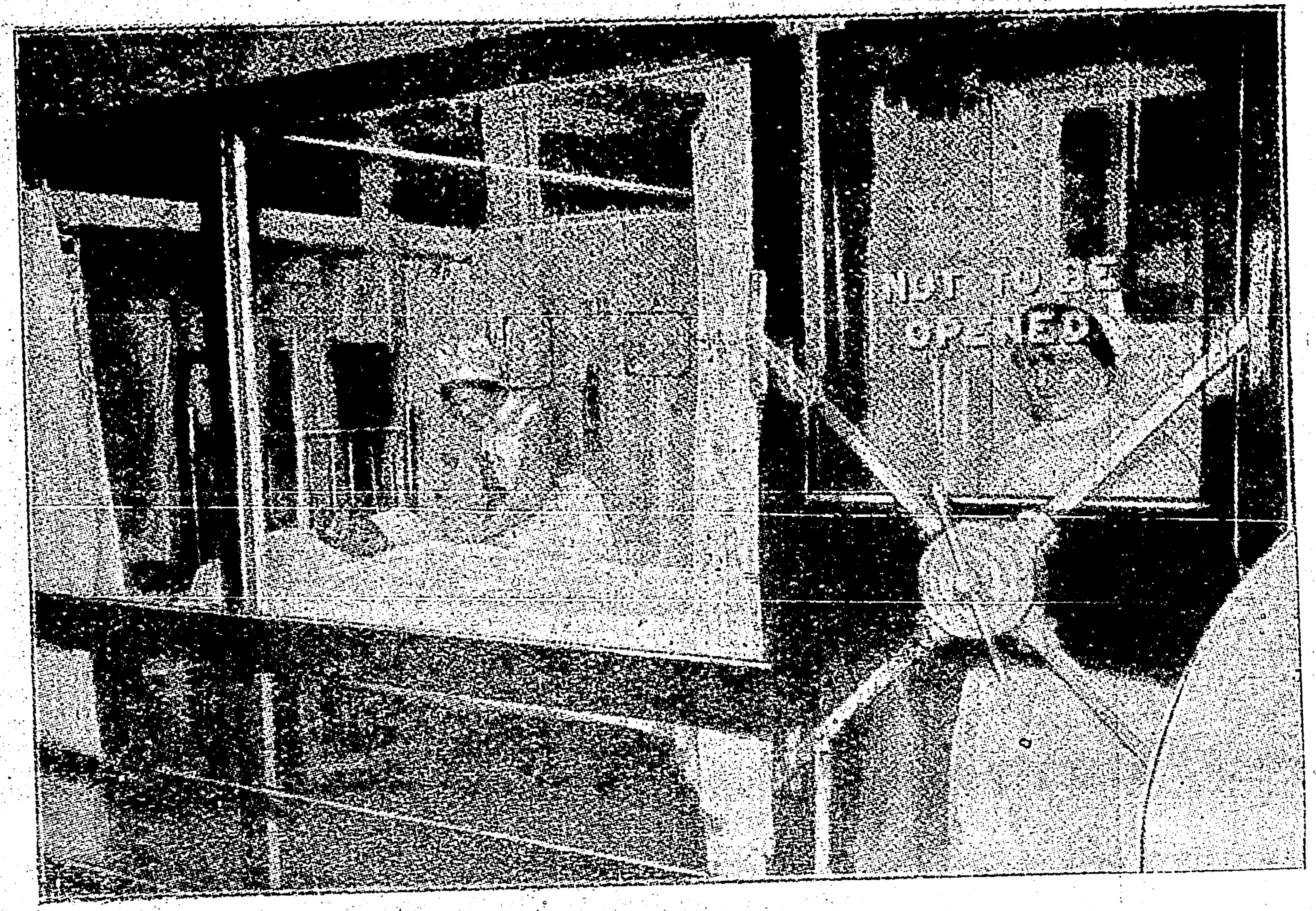

অক্সিজেন-পূর্ণ-কক্ষ

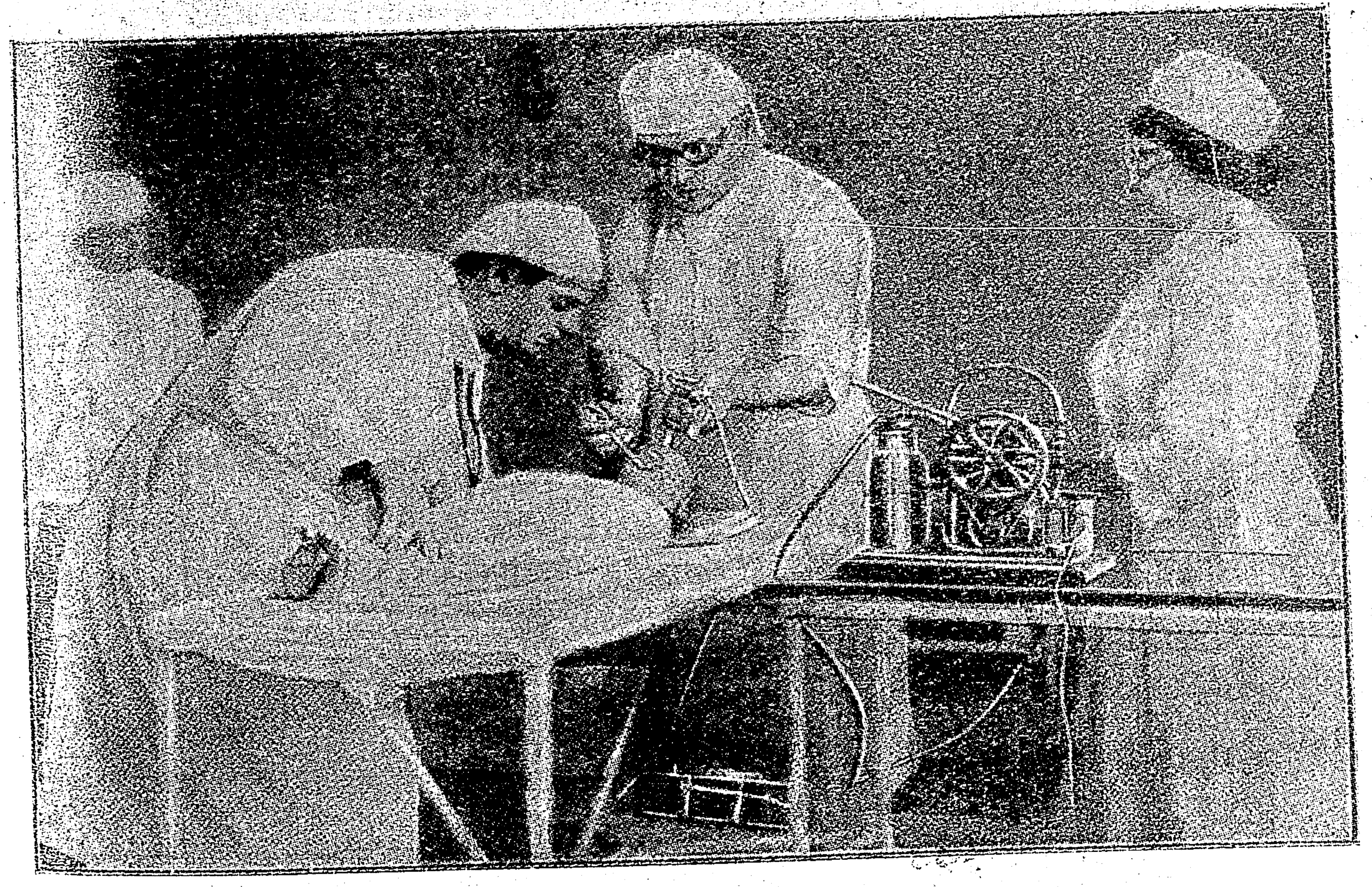

ডিপ্‌থেরীয়ার নূতন চিকিৎসা

উত্তাপ-নির্ণয়—

ডাঃ কোব্‌লেঞ্জ (Dr Coblentz) একপ্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করেছেন, যাতে সুদূরের কোনও জিনিষের কত উত্তাপ তা অনায়াসে ঠিক কর্ত্তে পারা যায়। তাঁর যন্ত্রটী এত সূক্ষ্ম সংবেদন সম্পন্ন যে ২৫ ক্রোশ দূরে একটি বাতি জ্বললে তাঁর উত্তাপে যন্ত্রটি বিচলিত হয়। এঁর যন্ত্রে নক্ষত্রের উত্তাপ ৩০০০০ ডিক্রি থেকে ৪০,০০০ ডিক্রি ধরা গেছে।

মস্তিষ্কের প্রভাব—

যখন আমরা কোনও কাজ করি তখন আমাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়া কিভাবে হয় এবং মস্তিষ্কের সঙ্গে আমাদের দেহের ও মনের সম্বন্ধ কি সে খবর বোধ হয় আমরা অনেকেই জানি না। যখন আমাদের খুব ক্ষুধার উদ্রেক হয়, আর সেই সময়ে যদি কোনও খাদ্যদ্রব্য সামনে দেখতে পাই আমাদের মুখে লালা ঝরে এবং সেই খাদ্য

চার কোটী বৎসরের পুরাতন হংসডিম্ব

কাগজে উঠান পায়ের ছাপ

ডিম্ব পেয়েছেন। মাটীর অনেক হাত নিম্নে খনন কর্‌তে কর্‌তে ডিম্বটী প্রস্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়। উক্ত পণ্ডিত বলেন যে ডিম্বটী না কি ৪ কোটিবৎসর আগেকার! আর সেটি হাঁসজাতীয় পাখীর এবং তাহাদের অস্তিত্ব নাকি এখনও খুব প্রাচীন বনের মধ্যে দেখতে পাওয়া অসম্ভব নয়।

চালিয়াৎ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ

সমীর, হরেন ও প্রভাত প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়্‌ত। তাদের মধ্যে ভারি বন্ধুত্ব ছিল। প্রভাতের স্বভাব শান্ত ও মৃদু, পড়াশুনোয় সে বেশ ভালো, বরাবরই স্কলার্শিপ পেয়ে আস্‌ছে। সমীর ছিল একেবারে উল্টো, সে কোনোরকমে পাস করে যেতো. তার সময় কাটত খেলায়, গল্পগুজবে ও অন্য পাঁচরকমে। হরেন ছিল এ দুজনের মাঝামাঝি।

সমীরের প্রকৃতিটী একটু খুলে বলা দরকার। তার কাজে ও কথায় এমন একটা আকর্ষণী-শক্তি ছিল যে, প্রভাতের মতো লোকও তাকে না ভালোবেসে থাকতে পারত না। সে বড়মানুষের ছেলে, নানা দেশ-বিদেশে ঘুরেছে, অনেক গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে আলাপ ছিল। সকলে তার কাছে রকম-বিরকমের খবর পেত। কেউ কেউ বলত, সমীরের অভ্যাস—সব জিনিস বাড়িয়ে বলা। প্রভাত কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করতে চাইতো না। হরেন তো তার একেবারে অন্ধ ভক্ত ছিল।

সেটা জুলাই মাস, আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে। তিন বন্ধু কলেজে এসে দেখলে—Notice টাঙ্গানো, প্রফেসর ক্লাশ নেবেন না। হরেন বললে "সমীর, বাদলার দিন একটু গল্প করবি চল।" প্রভাত লাইব্রেরীর দিকে যাচ্ছিল, সমীরের গল্পের টানে সে ফিরে এল।

Common Roomএর একটা নির্জ্জন কোণ তিন বন্ধু মিলে দখল করলে। বাইরে কেবল বৃষ্টির শব্দ,—মাঝে মাঝে মেঘের ডাক শোনা যাচ্ছিল,—আর ঝড়ো হাওয়ার ঝাপ্‌টা ঘরের ভেতর এসে ঢুকছিল।

সমীর জিজ্ঞাসা করলে "কি গল্প শুন্‌বি ?"

হরেন বল্‌লে "আজকের দিনটা ভারি করুণ। তোর জীবনে যদি কোনো প্রেমের কাহিনী থাকে তো বল্।"

সমীরের হাতে একটা মরোক্কো লেদারে বাঁধা বই ছিল। সেটা সে বুকে ঠেকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে "এই বইখানির সঙ্গে আমার জীবনের অনেক মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে।"

হরেন অমনি বইখানা টেনে নিয়ে দেখলে Keats। প্রথম পাতা খুলতেই চোখে পড়ল, লেডি-হ্যাণ্ডে লেখা, Monica Wilson, Woodstock College, Mussourie। হরেন একটা খাঁটি রোমান্সের সন্ধান পেয়ে লোলুপ হয়ে উঠ্‌ল।

আকাশ তখন আরো কালো হয়ে এসেছে। প্রভাত একটু দূরে বসে ছিল, সে বইখানার দিকে নজর করলে না।

হরেন বললে, "বল্ ভাই, তোর ভালোবাসার ইতিহাস।"

সমীর আরম্ভ করলে, "সেবার আমি মসুরী যাই। থাকতুম ল্যাণ্ডোরে একটা বাড়ীতে। লোকালয়ের কোলাহল ভালো লাগ্‌ত না বলে, টিহরীর নির্জ্জন রাস্তা ধরে বেড়াতে যেতুম। রাস্তার আসে পাশে ডালিয়া, রোডোডেনড্রন, উইলো, পাইন গাছগুলো আমার সঙ্গী হয়েছিল। মসুরীতে ইংরেজ মেয়েদের একটা কলেজ আছে। সেটা এই রাস্তার ধারেই একটা পাহাড়ের ওপরে। আমি প্রায় সেই কলেজের গেট অবধি গিয়ে ফিরতুম। এক দিন বিকেলে, সবে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গিয়ে রোদ উঠেছে, ফগের আড়াল থেকে দূরে বদ্রি-নারায়ণের চূড়ো ঝিক্‌মিক্ করছে। আমি একটা পাইন গাছের তলায় বসে বাঁশী বাজাচ্ছিলুম। এমন সময়ে কে একজন মিষ্টি সুরে বললে, 'তুমি ভারি সুন্দর বাঁশী বাজাও তো।' চেয়ে দেখি, মূর্ত্তিমতী বনদেবীর মতো একটী তরুণী।

"ক্রমে তার সঙ্গে আলাপ হল। সে Woodstock Collegeএ পড়ত। বয়স হবে আঠারো উনিশ। তার বাড়ী Liverpoolএ। এখানে এসেছিল বাপের সঙ্গে। বাপ লক্ষ্ণৌর এঞ্জিনিয়ার। তাকে বাঁশী বাজানো শেখালুম। আমরা প্রত্যেক দিন একটা Shrubএর কাছে পরস্পরের দেখা পেতুম। কত আবেগভরা আলোচনা, কত কাব্যচর্চ্চা হত। এখনো মনে করলে বুকটা টনটন করে!"

হরেন ভারি গলায় বললে, "তা হলে না হয় থাক্।"

সমীর আপন মনে বলে যেতে লাগল, "কিন্তু এত সুখ তো বেশী দিন থাকবার নয়। কি করে এ কথা Lady Principalএর কাণে উঠল। এক দিন বিকেলে Monicaর কাছে গেছি, সে জলভরা করুণ চোখ আমার ওপরে রেখে বললে, 'সমী, আর তো আমাদের দেখা হবে না, Principal আমাদের meetingএর কথা জানতে পেরেছেন, ও আমার ওপরে অন্যায় সন্দেহ করেছেন। আজ আমার room-matesদের ডেকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি ঠিক জানি, কাল থেকে আমার বেড়ানো বন্ধ হয়ে যাবে। বিদায় দাও।'

আমার চোখের সামনে একরাশ অন্ধকার ভেসে উঠল! সে বললে, 'ভেবো না, এক দিন না এক দিন আমরা পরস্পরের দেখা পাবই পাব।'

আমি বললাম, 'তবু একটা স্মৃতিচিহ্ন ?' সে শিথিল চরণে ফিরে গেল। এই বইখানি Hostel থেকে এনে দিলে; তার পর কাঁদনভরা হাসি হেসে বিদায় নিলে। সেই দিন থেকে এই বইখানি আমার শয়ন স্বপনের সাথী, আমার সাত রাজার ধন মাণিক হয়েছে। জানি না, জীবনে তার দেখা আর কখনো পাবো কি না! ঐ বইখানি আমার সর্ব্বস্ব!"

হরেন আবেগে সমীরের হাত চেপে ধরলে।

* * * * *

প্রভাত এতক্ষণ চুপ করে বসে শুনেছিল; সে বললে "দেখি।" বইখানা উল্টেপাল্টে ভালো করে দেখে বললে, "দুদিন আগে আমি এখানা খলিল মহম্মদের old book shopএ দেখেছি। সমীর তুমি নিশ্চয় এখানা সেখান থেকে কিনেছ ?" হাতে হাতে ধরা পড়ে সমীরের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল।

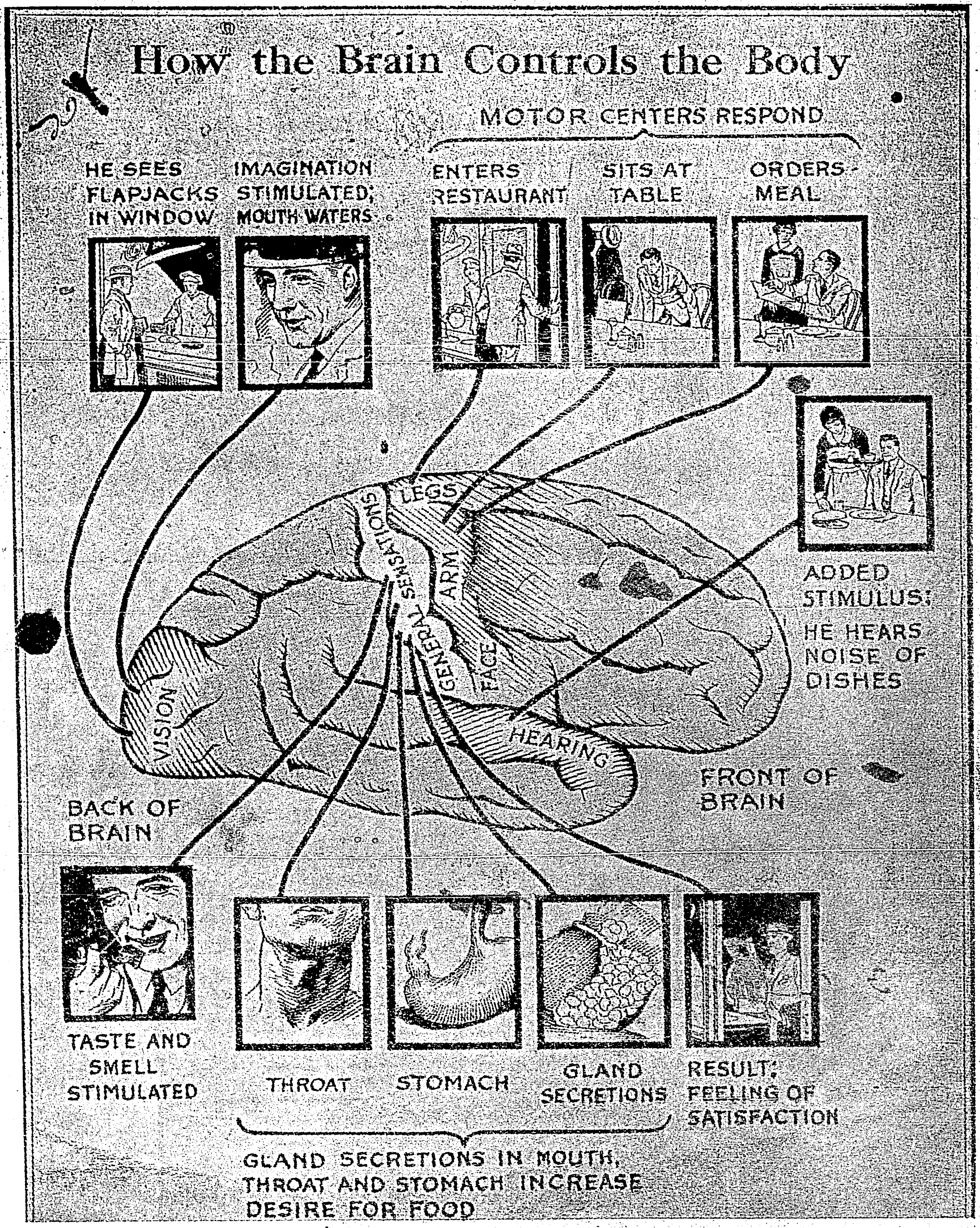

শরীরের উপর মস্তিষ্কের প্রভাব

আস্বাদনের জন্য আমাদের প্রবল আগ্রহ হয়। এরূপ অবস্থায় আমাদের মস্তিষ্কও উত্তেজিত হয়। কি কি কারণে মস্তিষ্কের কোন কোন স্থান উত্তেজিত হয় সেটা পার্শ্বস্থ চিত্রে বেশ পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে।

সাঙ্কেতিক আলোক নিক্ষেপের কৌশল—

সৈনিকদের পক্ষে যুদ্ধের সময় এক স্থান হ'তে স্থানান্তরে বার্ত্তা প্রেরণ অতি কঠিন কাজ। বেতারে, তাড়িত-বার্ত্তাবহ তারে বার্ত্তা প্রেরণ বরং সহজ, কিন্তু সাঙ্কেতিক আলোকের সাহায্যে ইহা ঠিক গোপনে প্রেরণ করা যায় না। আলোকের সাহায্যে তারা যে কোন বার্ত্তা প্রেরণ ক'রে আলোক যতই ক্ষুদ্র হ'ক না কেন, তা'র বার্ত্তা বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। সামরিক বিভাগের এই

অসুবিধা করবার উদ্দেশ্যে একজন বৈজ্ঞানিক তাঁর পরীক্ষাগারে আলোক-বার্ত্তা নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে জান্‌তে পেরেছেন যে, বার্ত্তাবহ আলোক-রশ্মি যদি তির্য্যকভাবে নিক্ষেপ করা যায় তা'হ'লে সে আলোকবার্ত্তা বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় না। এই আবিষ্কারের সঙ্গেসঙ্গেই তিনি আলোকরশ্মিকে যা'তে বহুদূর পর্য্যন্ত রেখাকারে নিক্ষেপ করা যেতে পারে, তা'র কৌশলও আবিষ্কার ক'রেছেন। এইভাবে আলোক-সঙ্কেতকে আপনার মুষ্টিগত ক'রে রাখবার তিনি আরও অনেক অভিনব কৌশল উদ্ভাবিত ক'রেছেন।

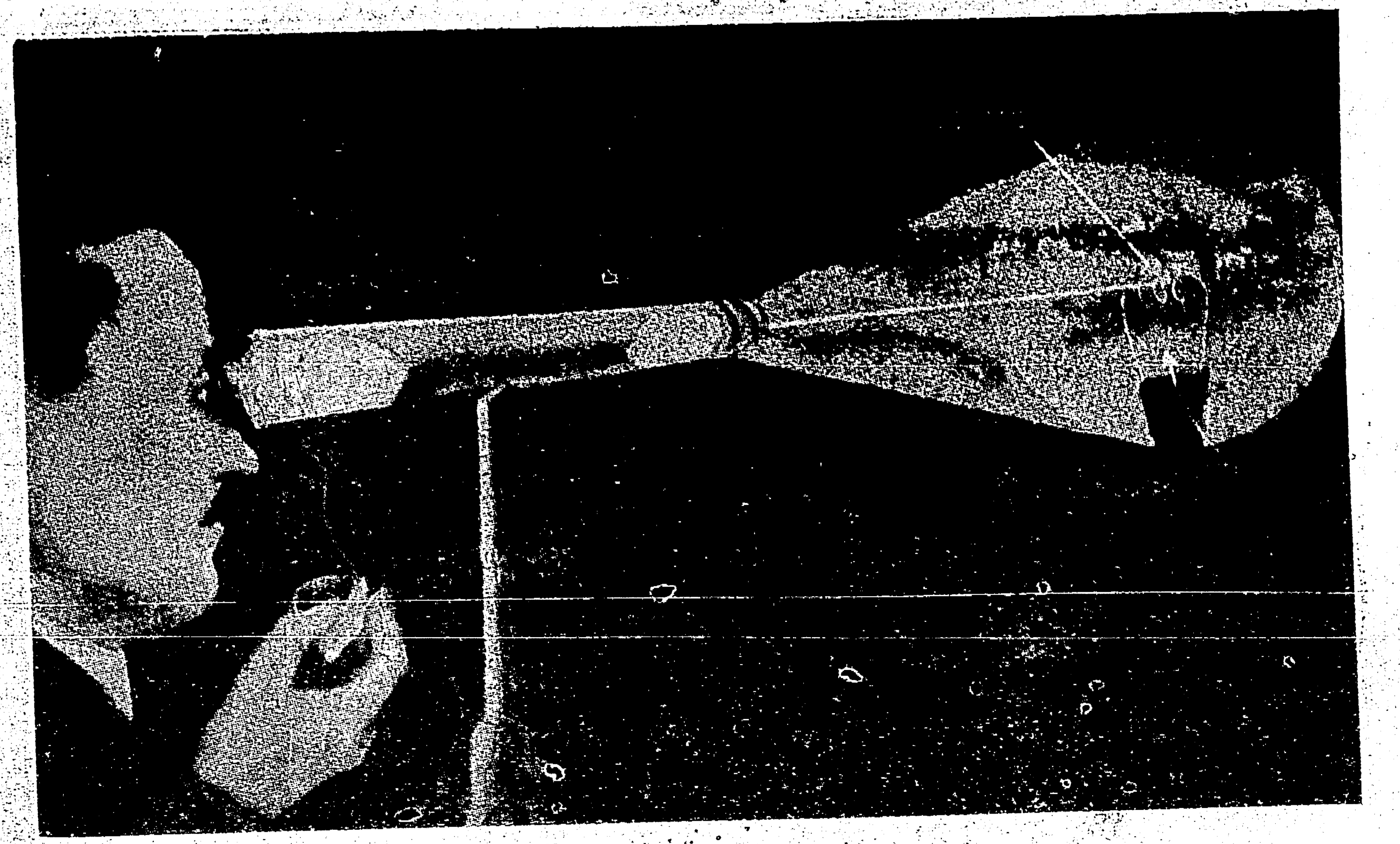

সাঙ্কেতিক আলোক নিক্ষেপ করবার কৌশল

মা ছেলের পায়ের ছাপ নিচ্ছেন

ছেলে চুরি—

ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, আমেরিকা ইত্যাদি সুসভ্য দেশেও প্রতি বৎসরে তুতিনশ ৯।১০ মাসের শিশু থেকে ৯।১০ বৎসরের বালক বালিকা পর্য্যন্ত চুরি যায়। সেজন্য সেখানে শিশু অপহৃত হ'লে তা'র উদ্ধার সহজ হ'বে বলে শিশুর পদতলের এক একখানি ছাপ নিয়ে রাখা হয়। প্রত্যেক শিশুর পদতলের এমন কতক-গুলি রেখা থাকে যাহা অন্য কোন বালক বালিকার পদতলে থাকে না; আর সেই রেখা শিশু বয়সে বাড়লেও সহজে বিলুপ্ত হয় না। যদি কোনও শিশু বালক বা বালিকা চুরি যায় বা হারিয়ে যায়, তা'র পদতলের গৃহীত ছাপের রেখা দেখে দীর্ঘকাল পরেও তা'কে পুনরুদ্ধার করবার সম্ভাবনা থাকে।

প্রস্তরীভূত ডিম্ব—

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ব বিশারদ দক্ষিণ দাকোতায় (South Dakota) একটি

৺দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁহার সঙ্গীত

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আজ আমি আপনাদের কাছে সঙ্গীত রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা সম্বন্ধে দু' চারটে কথা নিতান্তই অনাড়ম্বর ভাবে বলতে চাই। দ্বিজেন্দ্রলালকে আপনারা প্রায় সকলেই হয় কবি, না হয় নাট্যকার, না হয় স্বদেশী গানের রচয়িতা, না হয় হাস্য-রস-রসিক বলে জেনে এসেছেন। কিন্তু খুব কম লোকেই খবর রাখেন, তিনি সঙ্গীত-রচয়িতা হিসেবেও একজন কত বড় প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, এমন কি আমার মনে হয় যে, এটা বল্‌লেও অত্যুক্তি হবে না যে, এদিকে তাঁর প্রতিভা অন্য কোনও প্রতিভার চেয়েই কম ছিল না—যদিও এ কথা শুন্‌লে খুব সম্ভবতঃ আপনাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই একটু আশ্চর্য্য হবেন। এই রকমেরই একটা কথা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় অনেক দিন আগে বলেছিলেন ও কাগজে লিখেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতে মৌলিক দান সম্বন্ধে তিনি যে সব কথা লিখেছিলেন, তার মধ্যে আমি একটা সত্যিকার অন্তর্দ্দৃষ্টির পরিচয় পেয়েছিলাম, এবং সেটা আমার কাছে বিশেষ রকম ভাল লেগেছিল এই জন্য যে, আমি অনেক দিন ধরে তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা সম্বন্ধে যে সব কথা মনে প্রাণে অনুভব করে এসেছি, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ কর্ত্তে সাহসী হয়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল আমার পিতা ছিলেন। কাজেই সঙ্গীতে তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা সাধারণ্যে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করা আমার পক্ষে কঠিন—যদিও এ কুণ্ঠার ঠিক কারণটি খুব স্পষ্ট করে বলা সহজ-সাধ্য নয়। তবু আমি যে আজ এ বিষয়ে সাধারণ্যে কিছু বল্‌তে উদ্যত হয়েছি, তার প্রধান কারণ এই যে, তাঁর সঙ্গীত-সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে বল্‌বার—ও যেটা তার চেয়ে দরকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবার লোক—বাংলাদেশে বেশী নেই। য়ুরোপে তাঁর মত প্রতিভা নিয়ে কোনও সঙ্গীত-রচয়িতা জন্মগ্রহণ করলে তাঁর রচনাদির আলোচনায় মাসিক পত্র প্রভৃতি ছেয়ে যেত। কিন্তু আমাদের দেশে সঙ্গীত প্রভৃতি আর্ট নিয়ে মাথা ঘামায় এমন লোক বড়ই কম। তাছাড়া আমাদের দেশে সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনও প্রবুদ্ধ লোক-মতই আজ অবধি গড়ে ওঠে নি। অথচ এ লোকমত গড়ে না উঠ্‌লে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই। এই সব সাত-পাঁচ ভেবে চিন্তে আমি আজ আপনাদের কাছে দ্বিজেন্দ্রলালের বহু-মুখিনী প্রতিভার মধ্যে সঙ্গীত-প্রতিভা সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে সাহসী হয়েছি।

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত-প্রতিভার নিদর্শন শৈশবেই পাওয়া গিয়েছিল। এখানে এ নিদর্শনের সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলা দরকার। আমি তাঁর কাছে শুনেছি যে, তাঁর শৈশবে এক দিন তিনি কি একটা স্বরচিত ছেলেমানুষি গান নিজেই সুর দিয়ে আপন মনে গাইছিলেন, যে সুরটি অলক্ষ্যে শুনে তদীয় পিতা ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র এতই চমৎকৃত হয়েছিলেন যে, অত্যন্ত রাশভারি পিতা হওয়া সত্ত্বেও পুত্রের সাম্‌নে এসে গানটি আর একবার শোন্‌বার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এখানে বলে রাখা দরকার যে, কার্ত্তিকেয়চন্দ্র তাঁর সময়ে একজন অতি উচ্চদরের গায়ক বলে গণ্য ছিলেন। কাজেই তাঁর মত ওস্তাদেরও

যে দ্বিজেন্দ্রলালের বাল-সুলভ সুরটি ভাল লেগেছিল, এ সংবাদটির দাম আছে। দুঃখের বিষয় যে সুরটি আমাদের জানা নেই, কারণ, জানা থাক্‌লে আমাদের দ্বিজেন্দ্রলালের বাল-প্রতিভা সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য লাভ হ'ত।

আর্টে প্রতিভার নিদর্শন যে সব সময়েই বাল্যকালে পাওয়া যায় এমন নয়। কিন্তু সঙ্গীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, "The child is the father of man" কথাটি প্রায়ই খাটে, যেমন দ্বিজেন্দ্র লালের ক্ষেত্রে খেটেছিল। এক সময়ে কৃষ্ণনগরে বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্স আসেন। তাঁর কাছে "ক্যায়সে কটেঁ পল ছন ঘড়ি' গানটি বালক দ্বিজেন্দ্রলাল এমন সুন্দর শিখেছিলেন যে বিখ্যাত খেয়ালী আহম্মদ খাঁ তাঁর গানের সুখ্যাতি করেছিলেন। শৈশব হতেই তাঁর গানের পারদর্শিতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিয়ে এ প্রবন্ধের কলেবরটি অনর্থক স্ফীত করে তুল্‌তে চাই না। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের বাল-রচনার একটিমাত্র উদাহরণ আমি না দিয়ে থাক্‌তে পারছি না। এ গানটি তিনি 'আর্য্য গাথা' প্রথম ভাগে প্রকাশ করেছিলেন। (এখানে তিনটি মেয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের "গগনভূষা তুমি জনগণ মনোহারী" গানটি গেয়েছিল।) গানটির বাঁধুনি ছন্দ সুর ও লয় দেখ্‌লেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে, এ রচনা পরিণত মনের নয়—নিতান্তই সবুজ মনের। আমরা গানটির সুর এবং কথার মধ্যে একটি শিল্পীর—একটী সরল তরুণ মনের আবেগের দখিন হাওয়ার সেই মধুর উদাস পরশটি পাই, যে মন জীবনের আনন্দেই ভরপুর, রঙীন নেশায় উতলা, স্বচ্ছন্দ চলার হরষেই মাতোয়ারা। এ সুর রচনার মধ্যে শিল্পীর হাত আছে বল্‌লাম এই জন্য যে, এর মধ্যে দ্বিজেন্দ্র-লালের সেই মনোজ্ঞ মৌলিকতাটির আমেজ পাওয়া যায়, যা তাঁর পরিণত বয়সে বিচিত্র সম্ভারে, লতায়-পাতায়, ফলে-ফুলে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছিল।

বাল্যকাল থেকেই স্বীয় পিতৃদেবের উচ্চদরের খেয়াল গান শুন্‌তে শুন্‌তে দ্বিজেন্দ্রলালের শিশু মনেই উচ্চসঙ্গীতে গভীর অনুরাগের সেই বীজটি উপ্ত হয়, যা পরে বিচিত্র পত্র-পুষ্পে সমৃদ্ধ হয়ে সার্থক হয়েছিল। তাছাড়া দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্যকালেই শশিভূষণ কর্ম্মকার বলে একজন গায়কের কাছে রীতিমত গান শিখ্‌তে আরম্ভ করেছিলেন। আজ আমি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করব যে, তাঁর পরবর্ত্তী রচনাতে এ শিক্ষার ও উচ্চসঙ্গীতে অনুরাগের ফল কিরূপে ফলেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের এক শ্রেণীর সঙ্গীতে হিন্দুস্থানী সুরের ধারা বড় চমৎকার বজায় রাখা হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে হয়ত classicism এমনভাবে বিকাশ পেত না যদি তিনি গান শিক্ষা করা ও শোনা সম্বন্ধে পিতার অনুমতি না পেতেন। কারণ, বাল্যকাল হতে আমাদের উচ্চসঙ্গীত শোনার সুযোগ-সুবিধা থাক্‌লে যে সে সঙ্গীতে অনুরাগ সহজেই জন্মাতে পারে এ কথা আমি ইতিপূর্ব্বেই বলেছি। দ্বিজেন্দ্রলালের বালক মনেই যে এ অনুরাগ জন্মেছিল, তার জন্য ধন্যবাদার্হ তাঁর পিতা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র, যাঁর কাছে সঙ্গীতে তাঁর হাতে-খড়ি হয়েছিল। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত-প্রতিভার বিকাশ ভাল করে বুঝতে হ'লে, তাঁর দীক্ষা-গুরু পিতৃদেবের সঙ্গীত-প্রতিভার সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলা বোধ হয় অবান্তর হবে না।

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র বাল্যকালেই হিন্দুস্থানী গান রীতিমত শিক্ষা করেন, এবং পরে সে সব গানের সুরে অনেকগুলি বাংলা গান রচনা করে "গীতমঞ্জরী" নামক একখানি গীতি-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর যেরূপ সঙ্গীত-প্রতিভা ছিল সেরূপ কবিত্ব-শক্তি ছিল না। সুতরাং তিনি খট্, বেহাগড়া, সোহিনী, মুলতানী, আলাহিয়া প্রভৃতি বড় বড় বিশুদ্ধ রাগিনীতে গান রচনা করলেও সে গানগুলি স্থায়ী হয় নি। কিন্তু বাংলা গানে যে হিন্দুস্থানী সুরের আমদানী করা সম্ভব এ ইঙ্গিত বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলাল তদীয় পিতৃদেবের কাছেই সর্ব্বপ্রথম পেয়েছিলেন; কারণ তাঁর অনেক গানেই আমরা রাগ-রাগিনীর প্রাধান্য দেখ্‌তে পাই। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের এই একটি মহৎ সম্পৎ ছিল যে, তিনি যেমন একদিকে পিতার নিকট হতে পেয়েছিলেন—সঙ্গীত-প্রতিভার প্রেরণা, অপর দিকে তেম্‌নি বিধাতার নিকট হতে পেয়েছিলেন—কবিত্বশক্তির প্রতিভা। কাজেই আধুনিক সঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলালের কীর্ত্তির মধ্যে যে স্থায়িত্বের উপাদান আছে, এ কথা মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে বলেই মনে হয়।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-রসিক মাত্রেই জানেন যে, অদ্যাবধি হিন্দুস্থানী গানের মধ্যে কথার দাম যদি হয় এক আনা, তবে সুরের দাম পনের আনাই হয়ে এসেছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের এ ধারার মধ্যে একটা মহান্ গরিমা আছে (সে কথা আমি ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবেই লিখেছি *); কারণ এইখানেই আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কতখানি সত্য বা স্থায়িত্বের উপাদান আছে, সে বিচার অন্যত্র করার ইচ্ছা রইল। আপাততঃ কেবল এই কথাটি বল্‌তে চাই যে, বাংলা গানের বিকাশের ধারা ঠিক্ এদিকে পরিণতি লাভ করেনি। বাংলা গানের বিকাশ হয়েছে সুরের আবেদনের সঙ্গে কথার আবেদনের একটা সহজ মিলন বা সামঞ্জস্যের দিকে। বাংলা সঙ্গীতে এই নূতন স্রোতটীর আমদানি হয়েছে কীর্ত্তন, বাউল, নিধুবাবুর টপ্পা প্রভৃতি গানের প্রচলনের সময় হতে। বর্ত্তমান সময়ে এ ধারাটি উত্তরোত্তর বিকাশ করেছেন প্রধানতঃ তিনজন পুরোহিত—দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলচন্দ্র (সেন) ও রবীন্দ্রনাথ। এই ত্রয়ীর মধ্যে প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব ঢঙ আছে। আজ আমি এদের মধ্যে কেবল দ্বিজেন্দ্রলালের ঢঙ নিয়ে আলোচনা করব। দ্বিজেন্দ্রলালের ঢঙের মধ্যে যে একটা অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আছে ও একটা মনোজ্ঞ বৈশিষ্ট্য আছে, এ কথা প্রায় সব উদারপন্থী বিশেষজ্ঞগণই স্বীকার করেন। আমি আজ সাধ্যমত নির্দ্দেশ করতে চেষ্টা পাব—তাঁর ঢঙের বিশেষত্বটি

* "The classical music of Northern India"........... Rupam, January 1923; অথবা Forward—April 13th, 1924.

কোথায় ও নূতনত্বটাই বা কোন্‌খানে। কেবল দুঃখের বিষয় এই যে, এজন্য আমার যতগুলি দৃষ্টান্ত গেয়ে শোনান উচিত ছিল, সময়াভাবে আমি ততগুলি দৃষ্টান্ত দিতে পারব না। তাই পরে আরও দুএকটি প্রবন্ধে এ বক্তব্যটি সমধিক পরিস্ফুট করে তোল্‌বার ইচ্ছে রইল।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের ঢঙ্‌ বুঝতে হলে, তাঁর সকল শ্রেণীর গান নিয়েই আলোচনা করা দরকার; কারণ, গানে তাঁর প্রতিভার গতি বহুধা হওয়ার দরুণ তিনি নানান্‌ শ্রেণীর গান রচনা করে গেছেন। ম্যাথিউ আর্নল্ড কোথায় একস্থলে বড় সুন্দর লিখেছেন যে, দুইজন কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যদি তুল্য মূল্য হয় তাহলেই কিছু বলা যায় না তারা দুজনে একদরের কবি। শ্রেষ্ঠ কবি সেই যার মধ্যে God's plenty নিজেকে প্রকাশ করার আগ্রহে অধীর। এ কথা গানের সম্বন্ধেও খাটে। গানে তান বিস্তারের (improvization) মহিমাই ঠিক্‌ এইখানে। যাঁর বেশী বল্‌বার আছে, যাঁর মনপ্রাণ তাঁর বাণীর বৈচিত্র্যের ভারে বেশি নুয়ে পড়ে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীও বেশী। শিল্পীর কত কথা বল্‌বার আছে—এটাও দেখতে হবে। দ্বিজেন্দ্রলালেরও গানে বল্‌বার ছিল এত যে, তিনি শুধু সময়াভাবে তা বলে উঠতে পারেন নি। এইজন্য শিল্পীর অবসরের প্রয়োজন সাধারণ মানুষের চেয়ে ঢের বেশী। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-মন একবার সমুদ্র উপভোগ কর্ত্তে কর্ত্তে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিল ঃ—

"হায় শুদ্ধ অন্নচিন্তা যদি না থাকিত ও অন্ততঃ
দিবার ছয়টি ঘণ্টা পরদাস্য না করিতে হ'ত!" (মন্দ্র)

তাঁর সৃষ্টি-উন্মুখ মনের পক্ষে এ অবসরের অভাব যে কতখানি ক্লেশকর হয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু সে কথা থাক্‌। আপাততঃ আমি দেখাবার চেষ্টা পাব যে কর্ম্ম-ক্লান্তির অবসাদ ও অবকাশের অভাব সত্ত্বেও তিনি সঙ্গীতরাজ্যে কত জিনিষ সৃষ্টি করে গেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানকে প্রধানতঃ চার শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে ঃ—(১) প্রেমসঙ্গীত; (২) ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত; (৩) স্বদেশ-সঙ্গীত ও (৪) হাসির গান।

আজ আমি প্রধানতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেম-সঙ্গীত নিয়েই আলোচনা করব ও দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাবার প্রয়াস পাব—তাঁর ঢঙের বিশেষত্বটি কোথায়। কারণ তাঁর অন্যান্য শ্রেণীর গান সম্বন্ধে এত কথা বল্‌বার আছে যে, এক দিনে সে সব বক্তব্য বলে শেষ করা সম্ভব নয়।

প্রণয়-সঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলালের ঢঙের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাতে বাংলা সঙ্গীতের কথার মহিমা খর্ব্ব না ক'রে classicismএর অনেকখানি রসই বজায় রাখা যায়। এ গুণটি অতুলচন্দ্রের গানেও অনেকটা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এখানে classicism বল্‌তে বুঝতে হবে, হিন্দুস্থানী গানের ও তার বিস্তারের (improvization) রস। বাংলা গানে কথার সৌন্দর্য্যের সঙ্গে হিন্দুস্থানী গানের তানালাপের সৌন্দর্য্যের মিলন সাধন করা যে সম্ভব ও একান্ত বাঞ্ছনীয়, এ কথা আমার মনে উদয় হয়েছিল প্রধানতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের এই শ্রেণীর গানের ও নিধুবাবুর টপ্পার ধারা লক্ষ্য করে। আমি এই জিনিষটির উপরেই জোর দিতে চেয়েছিলাম। আমার পূর্ব্বোল্লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধে লিখেছি যে, আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রধান বিশেষত্বই এই যে, তার মধ্যে নিয়মের ধরা-বাঁধা সত্ত্বেও এমন একটা স্বাধীনতার Scope আছে, যে স্বাধীনতা প্রত্যেক গায়ককেই তার নিজের সৌন্দর্য্যানুভূতিটি ফুটিয়ে তোল্‌বার যথেষ্ট সুযোগ দিয়ে থাকে। বাঁধাধরা গানের ক্ষেত্রে এটা সম্ভবপর হয় না, কাজেই তার মহিমাও কম। একই রাগের গানের মধ্য দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের গানে ভিন্ন ভিন্ন গায়ক নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে, এর কারণ এই যে, গানগুলির সুর classical ঢঙে রচিত, অথচ তার মধ্যে বাংলা সঙ্গীতের বিশেষত্ব আছে। তা ছাড়া এসব গানে দ্বিজেন্দ্রলালের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—তাঁর classical চাল ও বাংলা সঙ্গীতের ধারা বজায় রাখবার সঙ্গে সঙ্গে গানগুলিকে এক নূতন ছাঁচে ঢাল্‌বার ক্ষমতা। এই নূতন ছাঁচ বা ঢঙ এমনই একটা বিশেষত্বের গরিমায় রঞ্জিত যে, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় সব শ্রেণীর গানের মধ্যেই তার একটা বিশিষ্ট ছাপ পাওয়া যায়। আমাদের কথা-বার্ত্তা, ভাবা-চিন্তা, লেখা-পড়া, চাল-চলন—সব কিছুরই একটা বিশিষ্ট ধরণ আছে। সে ধরণটি বা ঢঙের প্রকৃতির অনেকটাই নির্ভর করে—আমাদের পারিপার্শ্বিকের বা বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার উপর। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের ঢঙের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। আমি পরের প্রবন্ধে দেখাবার চেষ্টা করব—দ্বিজেন্দ্রলালের গানের ঢঙের ওপর তাঁর য়ুরোপীয় সঙ্গীতের অভিজ্ঞতা কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমাদের চিন্তা-ধারার ও ধারণাদির ওপর প্রতীচ্যের প্রভাব যে সচরাচর কত বেশী পড়ে থাকে, তা আমরা ভাল করে বিশ্লেষণ করে না দেখলে অনেক সময়ে ঠিক উপলব্ধি করতে পারি না। দ্বিজেন্দ্রলালের চিন্তা-ধারা ও আর্টেও এ প্রভাব পড়েছিল। কেবল প্রতিভার বিশেষত্ব এই যে, সে নানান বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে এমনভাবে গ্রহণ করতে পারে যে, যখন সে দৃশ্যতঃ বাইরের কোনও জিনিষকে গ্রহণ করে, তখন তাকে একেবারে আপনার করে নেয়। দ্বিজেন্দ্রলালের গানে সুর দেওয়ার ক্ষমতা বিশ্লেষণ করে দেখলে, এ কথার সত্যতা আমরা বুঝতে পারি। কি কীর্ত্তন, কি বাউল, কি হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিনী—সবই তাঁর প্রতিভার কাছে ধরা দিত একটি বিশেষত্ব নিয়ে। অর্থাৎ তাঁর সমস্ত সুর রচনার মধ্যেই একটা ছাপ পাওয়া যায়, যা দ্বিজেন্দ্রলালেরই নিজস্ব অথচ সে সব এমন সহজে রূপ পরিগ্রহ করেছে যে তার মধ্যে অনেক সময়ে অভাবনীয়তা থাকলেও অস্বাভাবিকতা নেই। এর কারণ পূর্ব্বেই বলেছি যে, দ্বিজেন্দ্রলাল গান ও সুর দুই-ই রচনা করার এক অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলেন। এ মণি-কাঞ্চন-যোগ দুর্লভ। কিন্তু ইংরাজীতে একটি কথা আছে "When nature gives, she gives with both hands"। দ্বিজেন্দ্রলালের বহুমুখিনী প্রতিভা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। আমি বাল্যকালে তাঁকে গানের পর গান ও সুরের পর সুর এমন অবলীলাক্রমে রচনা কর্ত্তে দেখতাম যে, তখন আমি তাঁর গানের সুর জানলেও অনেক সময়েই গাইতে চাইতাম না। কারণ, তখন মনে হ'ত, বুঝি এ

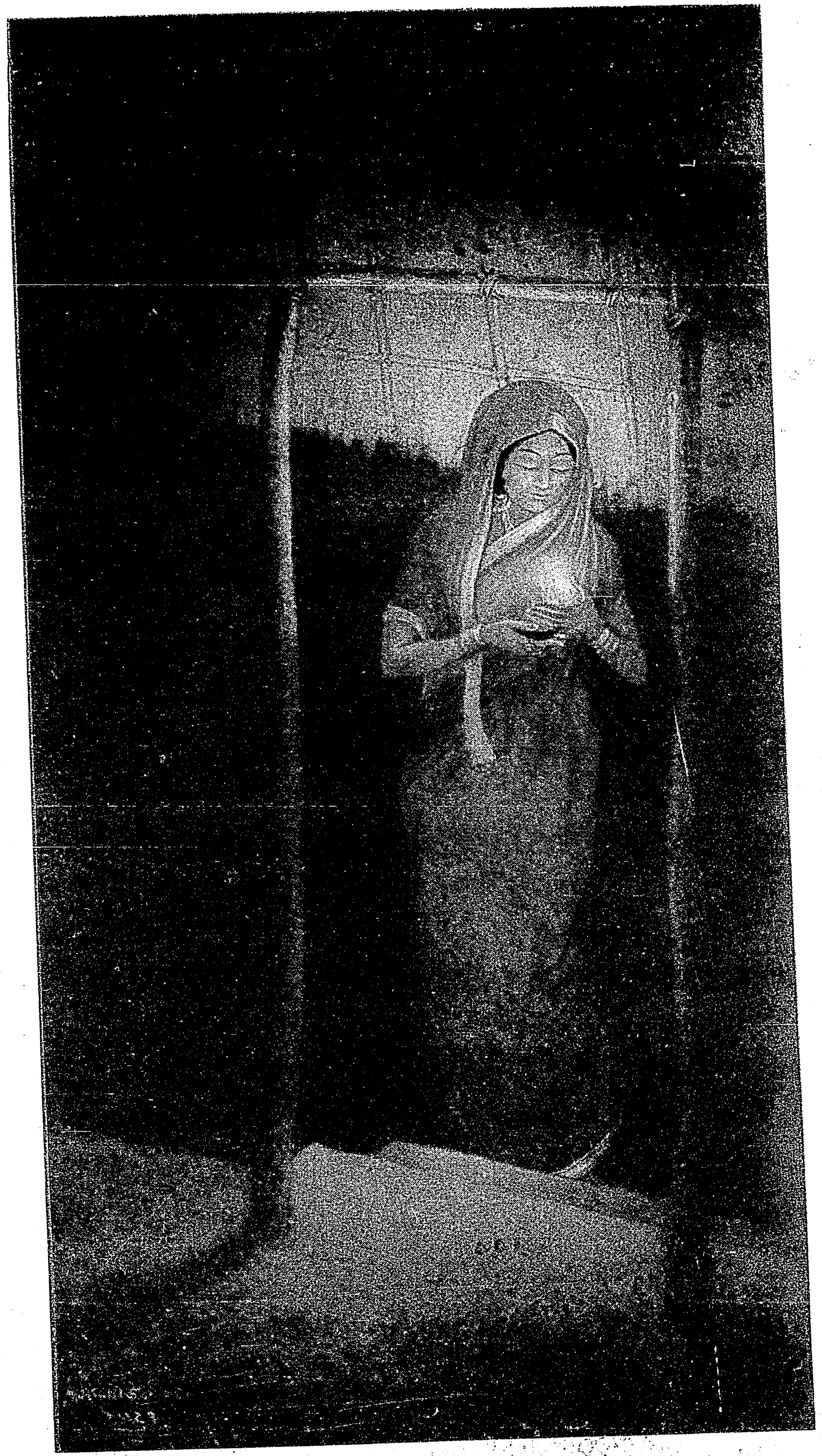

সন্ধ্যা-প্রদীপ

আমাদের এ আঁধার ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালো—রবীন্দ্রনাথ

COLOURED ILLUSTRATION

খুবই সহজ। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গেই মানুষ জানতে পারে মৌলিকতা কি জিনিষ, ও তখন বোঝে যে, মৌলিকতায় সাধারণ মানুষ চেষ্টা করে প্রতিভার সঙ্গে একাসন পেতে পারে না। পরের প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের এই মৌলিকতাকে নানাদিক দিয়ে দেখতে চেষ্টা করব। আজ কেবল এই কথা বলেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের শেষ কর্ত্তে চাই যে, সঙ্গীত রচনায় তাঁর মৌলিকতা ও বিশেষত্বের মধ্যে এমন একটা মহত্ত্ব আছে যা ক্রমে ক্রমে সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কর্ব্বেই কর্ব্বে। (মহিলা)

ময়ূরভঞ্জ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু

গত বৎসর যখন শ্রদ্ধেয় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের কাছে ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন শিল্পের কথা শুনি, তখন ময়ূরভঞ্জে গিয়ে সেই শিল্পের নিদর্শন দেখবার লোভ হয়েছিল। সুখের বিষয় শীঘ্রই একটা সুযোগ উপস্থিত হল। তখন বিশ্বভারতীর তরফ থেকে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে মিউজিয়মে শ্রীযুক্ত চন্দমহাশয়ের নিকট প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য যে, আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ভারতীয় বিদ্যার আলোচনাকে প্রধান স্থান দিয়েছেন। যাতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই বিদ্যার চর্চ্চা হয়, সেজন্য বিদেশ থেকে ডাক্তার শিল্ভ্যাঁ লেভী ও ডাক্তার উইণ্টার্ণিজ প্রভৃতি মনীষীদের বিশ্বভারতীতে আনিয়েছেন। ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্ব বিশেষভাবে জড়িত। সেইজন্য ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনের জন্য আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ আমাকে কলিকাতা মিউজিয়মে পাঠান। এবার পূজার ছুটির আগে যখন ফের মিউজিয়মে এলাম, শ্রীযুক্ত চন্দ মহাশয় বল্লেন, আমি ময়ূরভঞ্জে খনন কাজের জন্য যাচ্ছি। আপনি যদি আমার সঙ্গে আসেন, তবে খুব উপকৃত হবেন। তাঁর সাথী হতে অনিচ্ছা আমার মোটেই ছিল না, শেষে যখন বিশ্ব-ভারতী থেকে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের অনুমতি পেলাম, তখন আর কোনও বাধা রইল না। ৬ই নভেম্বর ১৯২৩ আমরা কলিকাতা থেকে রওনা হলাম। তার পরদিন ময়ূরভঞ্জের বর্ত্তমান রাজধানী বারিপাদাতে পৌঁছলাম। ময়ূরভঞ্জ উড়িষ্যার করদরাজ্যের একটা প্রধান রাজ্য। এটা উড়িষ্যার মধ্যে হলেও এখানে বাঙালীর প্রভাব কম নয়। কিছুদিন আগে এখানকার দেওয়ান ছিলেন শ্রীমোহিনীমোহন ধর, এবং এখানকার বার্ষিক রিপোর্টও বাংলায় লেখা হত। এখনও বাঙালী কর্ম্মচারীর সংখ্যা কম নয়। বর্ত্তমান রাজধানী বারিপাদাতে বড় জগন্নাথের মন্দির একটী দর্শনীয় জিনিস। এটার বিশেষত্ব এই যে, এটী পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত ও এখানে বৈষ্ণব-মূর্ত্তি ছাড়া জৈন ও বৌদ্ধমূর্ত্তিও আছে। এখানকার নাট-মন্দিরের প্রাচীরের গায়ে উড়িয়া চিত্রকররা নানা রকম ছবি এঁকে রেখেছে। তার মধ্যে একটী ছবির বিষয়—দশ অবতার,—আর সব অবতারের ছবি ঠিক আছে, কেবল নবম অবতার বুদ্ধদেবের স্থানে জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রা আঁকা রয়েছে। আমি এটা দেখে একটু বিস্মিত হয়েছিলুম। জিজ্ঞাসা করলুম—এর মানে কি? সেখানকার পূজারী বল্লে—জগন্নাথই বুদ্ধদেব কি না, তাই ওখানে জগন্নাথ আঁকা রয়েছে। পথে করন্‌জিয়া বলে একটী সহরে (রাজধানী থেকে ৭২ মাইল দূরে) আমরা একটী বৌদ্ধ তারা-মূর্ত্তি দেখেছিলাম। লোকে সেটীকে "বাশুলী" বলে পূজা করে। এখান থেকে আর একটী মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তি রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেটী এখন বারিপাদা লাইব্রেরীতে আছে। সেখান থেকে আমরা খিচিং বলে এক গ্রামে আসি। এটীই হল আমাদের কার্য্যক্ষেত্র। রাজধানী থেকে এটী ১০০ মাইল দূরে। এর খুব কাছের রেলওয়ে ষ্টেশন ৫০ মাইল দূরে, পোষ্টআফিসও ১০ মাইল দূরে। এমন জায়গায় আমাদের তাঁবু পড়েছিল। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা শ্রীযুক্ত চন্দ মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন এখানকার প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ খনন কার্য্যের জন্য। এ গ্রামের চারিদিক ঘুরে আমরা বুঝলাম যে, এককালে এটী একটী সমৃদ্ধ সহর ছিল। এইটীই ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন ভঞ্জরাজগণের রাজধানী ছিল। তাম্রশাসনে এর নাম—খিজ্জিংঙ্গপট্ট। এর উত্তরে ভণ্ডণ নদী, দক্ষিণে কটাখয়ের নদী, আর পশ্চিমে বৈতরণী। এর নানা দিকে নানা মন্দির ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। আমরা সেখানে পৌঁছে চারিদিক প্রদক্ষিণ করতে বেরলাম। এখানকার প্রধান মন্দির হচ্ছে—ঠাকুরাণীর মন্দির, যার ধ্বংসাবশেষ আমাদের খনন করতে হবে। এরই কিছু দক্ষিণে "চাউল কুণ্ডি'—সেটীকে লোকে ভীমের বাড়ী বলে। সেখানে খুব সুন্দর কারুকার্য্য-করা স্তম্ভ এখনও পড়ে রয়েছে। সেখানে সম্ভবতঃ একটী মন্দির ছিল। তার কিছু পশ্চিমে কীচকরাজার গড় আছে। এখন সেটী জঙ্গলে পূর্ণ, তবে সেখানে যে ২।৩টী মন্দির ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে কণ্টাখয়ের নদীর তীরে "শখুয়া রাজার মন্দির" ছিল। যখন শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জে প্রত্নতত্ত্বের অন্বেষণে যান, তখন ময়ূরভঞ্জের রাজকর্ম্মচারী শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বসু এই স্থানটী খুঁড়েছিলেন। এখানে একটী পাথরের দুই পাশে দুটি শঙ্খ খোদাই করা আছে। সেইজন্যই লোকেরা এটীকে "শখুয়া রাজার মন্দির' বলে। কামাখ্যাবাবু আর একটী যে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ভাবে খোঁড়েন, সেখান থেকে একটী বড় ও একটী ছোট হরগৌরীর মূর্ত্তি পান। এখানে যে বৌদ্ধ মন্দিরটী ছিল, তার নাম হচ্ছে "ইটামুণ্ডি"; কারণ, এটী ইট দিয়ে তৈরী। সেখান থেকে একটী বড় বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছিল। সে মূর্ত্তিটী ৬৬ ইঞ্চি উচু। কামাখ্যাবাবুর খননের দোষে এই বৌদ্ধ মন্দিরের যে ভিত্তিটুকুও অবশিষ্ট ছিল, তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর একটী উল্লেখযোগ্য ধ্বংসাবশেষ হচ্ছে—"করমরাজার দেউল," সেখান থেকেই না কি অবলোকিতেশ্বরের একটী ভগ্ন মূর্ত্তি পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিতে যে শিলালিপি আছে তা

থেকে বোধ হয় যে এটী রায়ভঞ্জ রাজ দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল। এ ছাড়া ছোট ছোট মন্দির অনেক আছে। এ থেকে মনে হয় এককালে এটী একটী খুব সমৃদ্ধিশালী সহর ছিল।

এখানকার প্রধান মন্দির হচ্ছে কীচকেশ্বরীর বা কীঞ্চকেশ্বরীর মন্দির। সেই মন্দিরটী কালক্রমে ভেঙে গিয়ে একটী প্রকাণ্ড স্তূপ হয়ে পড়েছিল। সেখানে আরও যে দু তিনটী মন্দির ছিল, সেগুলাও ক্রমশঃ ভগ্ন হয়ে পড়ে যায়। আমাদের কাজ ছিল—সেই যে প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপ রয়েছে, সেইটী খনন করে দেখা—কোন মূর্ত্তি বা স্থাপত্যের নিদর্শন সেখানে মাটীর নীচে রয়েচে কি না। প্রথমে গিয়ে দেখি যে, সেখানে যে জঙ্গল হয়েছে তা পরিষ্কার করা দরকার। আমরা প্রথমে জঙ্গল পরিষ্কার করে কাজ সুরু করলাম। এ বিষয়ে ময়ূরভঞ্জের মহারাজা লোকজনের সব আয়োজন করে দিলেন। তবে এখানে বাধা বিপত্তি অনেক ছিল, সে সব আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছে। যে সব লোক কাজের জন্য এসেছিল, তাদের চালান বড় শক্ত কথা। তারা সব কাছেরই গ্রামের লোক। তাদের মধ্যে কোল, সাঁওতাল, ভূঁইয়া, বাথুড়ী, গণ্ড, সাঁউতি, পুরাণ, পান, মহান্ত আর গৌড় বেশী। এরা একদিকে খুব সরল আর আমুদে, আবার অন্যদিকে বড়ই স্বাধীনতাপ্রিয়। তাদের সঙ্গে সেইজন্যে খুব সাবধানে কাজ করতে হ'ত। আরও সেই প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপের মধ্যে অনেক বড় বড় পাথর ছিল, সেই সব পাথরে কোনটায় নানারকম নক্সা, কোনটায় মূর্ত্তি খোদা ছিল। যে সব কুলি এল তারা আবার এসব কাজে দক্ষ নয়। তারা খুব সহজে বড় বড় শাল গাছ, আমগাছ কাটতে পারে; কিন্তু মাটীর ভেতর থেকে পাথর খুঁড়ে ঠিকভাবে বের করান তাদের দ্বারা হয় না। সেইজন্যে প্রথমে তাদের শেখাতে হ'ল, কিভাবে তারা কাজ করবে। তার পর সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর সরানও এক দায়। রত্নবেদীর প্রকাণ্ড পাথর বা মন্দিরের দেয়ালের পাথর খুব সাবধানে ট্রলি করে সরাতে হল। কয়দিন খোঁড়াবার পরই আমরা বুঝতে পারলাম যে, প্রাচীন মূল মন্দিরের কারুকার্য্য কি রকম উচ্চ ধরণের ছিল। এই খনন কাজে আমরা অনেক মূর্ত্তি, কোনটী ভাঙা অবস্থায়, কোনটী বা ঠিক অবস্থায়, পেলাম। সেই সব মূর্ত্তির বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। সেই বিস্তৃত বিবরণ দেবেন শ্রীযুক্ত চন্দমাহাশয় তাঁর সরকারী রিপোর্টে। বর্ত্তমানে তিনি Monuments of Mayurbhanja বলে একখানি বই রচনায় ব্যস্ত আছেন। সেই বইখানি প্রকাশিত হলে আমরা তাতে ভারতীয় শিল্পের নতুন এক অধ্যায়ের পরিচয় পাব। বর্ত্তমানে এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, এখানকার শিল্পের একটা যে বিশেষত্ব আছে, তা ভারতের খুব কম জায়গাতেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এখানকার শিল্পীদের বিশেষত্ব এই যে, তারা সমস্ত জিনিষকে স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করেছিল। ভারতের অন্য স্থানে যে সব শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে গুপ্তযুগের শিল্প ছাড়া অন্যতে এতটা পরিমাণে স্বভাবকে অনুকরণ করা হয়নি। স্বভাবকে অনুকরণ করতে পেরেছিল বলে এই সব শিল্পীদের কার্য্য এত সুশোভন হয়েছে। আমরা মাটীর মধ্যে থেকে যে সব মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি, গণেশমূর্ত্তি, শিবমূর্ত্তি, নাগ ও নাগিণী মূর্ত্তি, scroll পেয়েছিলাম, তাতে ময়ূরভঞ্জের শিল্পের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

(শান্তি-নিকেতন)

মেঘের খেলা

শ্রীরমলা বসু

প্রথম দৃশ্য

সময়—অরুণোদয়।

অলস ঘুম চোখে, প্রভাত-প্রকৃতি বসে—মাথায় অরুণ মুকুট, হাতে মল্লিকার গুচ্ছ। প্রভাত রাগিণী শুনে, ঘুম ঘোর ভেঙ্গে এগিয়ে আস্‌বে।—বাতাসের দোল খেয়ে, প্রভাত-মেঘও নেচে নেচে এগিয়ে আস্‌বে—তূলোর মত সাদা পোষাকে,—অরুণের প্রথম আলো লেগে গোলাপী আভা ফুটে বের হবে—মাথায় শিশির-মুকুট।

গান।

কামোদ—তেতালা

প্রভাত-প্রকৃতি—

কে তুমি গো, স্বপ্নে ঘেরা, আধেক ফোটা আশ রে?
কে তুমি গো, পুঞ্জ করা, শিউলি ফুলের রাশ রে?
আলোর পথে, কে তুমি গো, ঊষার শুভ্র হাস রে?
কোথা থেকে, আস্‌ছ তুমি, কোথায় তোমার বাস রে?

গান।

মিশ্র বাঁরোয়া—কাহার

প্রভাত-মেঘ—

আমি মেঘ-শিশু, বাতাসেরি দেশে, লঘু পদ ভরে।
চলি ভেসে, ভেসে, চলি ভেসে ভেসে, ভেসে রে।
পাহাড় মায়ের বুকে ছিলাম কেমন সুখে,
সুপ্তি জড়িয়া অলসে মগন
কত সুখ আশা করিয়া রচন,
সেই সোণার স্বপনেরি দেশে, স্বপনেরি দেশে, স্বপনেরি দেশে,
স্বপনেরি দেশে, দেশে রে।
ছড়ায়ে সে স্নেহ কোল, বাতাস দিল দোল,
কখন কি জানি, চুপি চুপি এসে, চুপি চুপি এসে, এসে রে।
বলাকার মত আঁকা, সেই হতে মেলি পাখা,
যেথায় তরুণ অরুণ তপন
জাগায় ধরায় সুপ্তি মগন,
লঘু মনে, চলি ভেসে ভেসে, নানা দেশে দেশে
নানা দেশে দেশে, নানা দেশে দেশে, দেশে রে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময়—সন্ধ্যাকাল।

সন্ধ্যা-রাগিনী বেজে উঠ্‌বে। ধূসর ছায়া ভরা সন্ধ্যাকাশ থেকে সাঁঝের প্রকৃতি বেরিয়ে আস্‌বে। মাথায়—চাঁদের মুকুট, ওড়নায়—তারার চুম্‌কি। ডুবন্ত সূর্য্যের ছড়িয়ে-পড়া কিরণ থেকে রং-ধার-করা কাপড় পরে, সন্ধ্যারাগিণীর তালে তালে সাঁঝের তিনটী মেঘকণা, নাচ্‌তে নাচ্‌তে বেরিয়ে আস্‌বে। তাদের মাথায় তারার মুকুট।

গান।

বাউলের সুর—দাদরা

প্রকৃতি-বালা—

কে গো সুরের আলোয়, বাজাও বীণা
স্বর্ণ শতদলে।
ক্লান্ত রবি, শ্রান্তি ভরে যেথায় পড়ে ঢলে,
সেই আকাশের তলে—
আহা স্বর্ণ শতদলে।

গান।

ভীমপলশ্রী—একতালা

সাঁঝের মেঘ—ক্লান্ত রবির, শ্রান্তি হ'তে, চুরি করে হাসি,
সাঁঝের সকল, কালোর, আলো,
করতে বড় বাসি ভালো,
ছড়িয়ে দিয়ে গগন-পথে
হোলির খেলা রাশি।
সাঁঝা-গগনে সাঁঝের মেঘ,
আলোর রথে ভাসি॥

তৃতীয় দৃশ্য

সময়—বর্ষাকাল

ক্লান্ত ভাবে আষাঢ় প্রকৃতি বসে। দূরে বর্ষা রাগিণী বাজ্‌বে। মাথায় রজনীগন্ধা—হাতে রজনীগন্ধার ঝাড়। স্নিগ্ধ শ্যামল ওড়না ওড়াতে ওড়াতে ও হাতে রূপালী জলের ধারা নিয়ে আষাঢ় মেঘকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, সতেজ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াবে।

গান।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—খেং

প্রকৃতি-বালা—

কে তুমি শ্যামল মূর্ত্তি, নয়ন লোভন
ক্লান্ত নয়ন, তৃপ্ত, করি দরশন।
ছায়া ফেলি বনপথে সরসী হৃদয়পাতে
এ কি এ যমুনা তল, করিলে সৃজন?

আষাঢ়-মেঘ—

আমি আষাঢ়ের মেঘ, স্নিগ্ধ ঘনশ্যাম
নিদাঘের রৌদ্র তপ্ত, ক্ষুব্ধ দেহ প্রাণ
ধরণী আমার পানে দু'বাহু বাড়ায়ে,
শীতল পরশ মোর মাগে অবিরাম।

চতুর্থ দৃশ্য

সময়—বর্ষাকাল

ধূসর মেঘে ঢাকা অদৃশ্য প্রকৃতি। পেছন থেকে বর্ষা-রাগিণী বাজ্‌তে থাক্‌বে। রাগিণী শেষ হবার আগেই, ধানের গুচ্ছ হাতে লইয়া ও পাকা ধানের মুকুট পরিয়া, শ্রাবণ প্রকৃতির প্রবেশ, ও অন্য দিক হতে তার ধূসর জাল দিয়ে ধরণীর বুক ঢেকে দিতে দিতে শ্রাবণ-মেঘের প্রবেশ—মাথায় তার বিদ্যুতের মুকুট, সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ ও হাতে বিদ্যুতের দণ্ড।

গান

গৌড়মল্লার—তেতালা

প্রকৃতি-বালা—

শাওন গগন ঘিরি আঁধার মূরতি পরি,
ক্ষণে ক্ষণে বুক পরি চমকি বিজলী জ্বালা।
গুরু গুরু ঘন স্বর, পরাণে লাগায় ডর,
আঁখি শুধু ঝরঝর, কে তুমি তমসা বালা?

গান

নটনারায়ণ—ঝাঁপতাল

শ্রাবণ-মেঘ—

দিগন্ত ব্যাপিয়া ঘোর, গভীর ধূসর জালে,
ধরণীর বুক আঁটি মুছি দিয়ে দিক্ কালে
আমি শ্রাবণের মেঘ, প্রবল প্রতাপ বেগ,
ঢালি জল অবিরল বিজলী জ্বালিয়া ভালে॥

পঞ্চম দৃশ্য

সময়—গ্রীষ্মকাল

ধূলায় ভরা, অদৃশ্যমান আকাশ ও প্রকৃতি। ঝড়ের বেগে গাছ পালা কাঁপ্‌বে। নিদাঘের রুদ্র রাগিণী বাজতে থাক্‌বে। প্রলয়ের মূর্ত্তিতে কালবৈশাখীর প্রবেশ। হাতে পিণাক দণ্ড। মাথায় পিঙ্গল জটা। অন্যদিক থেকে ঝরাপাতার মুকুট ও ঝরাপাতার মালা পরে নিদাঘ প্রকৃতির প্রবেশ এবং কালবৈশাখীকে দেখিয়া ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে যাওয়া। ধূলা ও ঝরাপাতার ঝড়।

গান

ইমন্ ভূপালী—তেতালা

প্রকৃতি-বালা—

একি পিঙ্গল জটা রুদ্র মূর্ত্তি,
তাণ্ডবে নর্ত্তনে প্রলয় প্রকৃতি

হুঙ্কার ছাড়ি অসুর সুপ্ত
সহসা জাগিয়া করিতে লুপ্ত
চাহিছে সকল বিশ্ব স্থিতি।

গান

জয়জয়ন্তী—একতালা

কালবৈশাখী—

আমি বেতালা বিঘোরা পাগলপারা
কালবৈশাখীর আকুল ধারা।
দুর্দ্দম মম চলন ভঙ্গ
ক্ষত বিক্ষত ধরণী অঙ্গ
নিমেষের মাঝে সকল হারা।
আমি সহসা আসিয়া সহসা থামিয়া,
আপন দর্পে সরমে সারা
লুকাই আঁধার গগন-মাঝে
যেথায় জ্বলিছে সন্ধ্যাতারা।
পড়ে রয় শুধু প্রলয়বাতে
ছিন্ন ধরণী প্রলয়াঘাতে
ভয়ে স্তম্ভিত বিভল পারা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

সময়—শরৎকাল

স্বচ্ছ নীল আকাশের গায়ে, সপ্ত রংএর ইন্দ্রধনুর সূর্য্যের চারি পাশে নৃত্য। (বেগুনে, গাঢ়, নীল, ফিকে নীল, সবুজ, হল্‌দে, কমলা ও লাল) সবুজ কাপড় পরা আনন্দ মূর্ত্তি শরৎ লক্ষ্মীর প্রবেশ।

গান

ভৈরবী—তেতালা

শরৎ-লক্ষ্মী—

আজি চারিদিকে হেরি, এ কি মধুর বরণ
ওলো আজি বুঝি শরতের হল আগমন।
তাই বর্ণে বর্ণে মাতোয়ারা, নিখিল ভুবন,
বহে দুলে দুলে ফুলে ফুলে, ধীর সমীরণ।
বনলতা ফুল ফলে, বাতাসে গগন তলে,
হেরি মধুর বরণ।

গান

নটমল্লার—কাওয়ালী

ইন্দ্রধনুগণ—

আমরা শুধুই হরষে মাতাই,
সকল ভুবন বরণে সাজাই,
নিখিলে আলো হাসি, রাশি রাশি ছড়িয়ে,
রঙ্গিন করি তুলে ফুলে ফুলে চুমিয়ে,
শ্যাম তৃণদলে, নীহারে নদীজলে,
নাচিয়া বেড়াই।
বুকে অরুণ কিরণ ধরে,
সারা ভুবন, গগন পরে
চড়ি বাসবের ধনু পরে, আমি আর যাই।
তিলেক করি মোরা দরশন যেথানে
কেবলি হাসি খেলা আলো মেলা সেথানে
শুধু মোরা হাসিয়া, হরষে নাচিয়া সবারে মাতাই।

"মা"

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

মায়ার বিয়ের পর প্রায় আট বছর কেটে গেলেও যখন তা'র কোনো ছেলে হ'লো না, তখন তা'র শ্বশুরবাড়ীর ও বাপের বাড়ীর সকলেই একটু বিষণ্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো। সে নিজেও কম দুঃখিত হ'লো না। তা'র বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই তা'র হৃদয়ের ভিতরকার মাতৃ-প্রকৃতিও ক্রমশঃ সজাগ হ'য়ে সন্তানের স্নেহ-আবেষ্টনের ভিতর নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌বার জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছিল।

সকল দেশের সকল মেয়ে ছোটবেলা থেকেই ঘর-সংসার এবং নিজেকে চিন্‌তে আরম্ভ করে' ছোট্ট একটি নকল খেলা-ঘর-সংসার তৈরি করে'। সেইখানেই সে পুতুল-ছেলে-মেয়ে নিয়ে নিজের মাতৃত্বের বোধন আরম্ভ করে। তার পর ক্রমশঃ সত্যিকারের মা হ'য়ে এক দিন সংসারের ভিতর ঢোকে সেই ছেলেখেলার সংসারের গণ্ডী কাটিয়ে। তাদের এই যে মা হবার ইচ্ছা, এটা ঈশ্বর-প্রেরিত। তিনি তা'দের প্রাণের ভিতর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃ-জীবনের অনুভূতি প্রেরণ করেন। আর সেইটাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ পেতে থাকে। যে যত শীঘ্র মাতৃত্বের গৌরব লাভ করে, সে তত শীঘ্র নারী-মর্য্যাদায় অভিনন্দিত হয়। আর যে এই মাতৃ-জীবনের বিকাশ অনুভব কর্‌তে পায় না, তা'র জীবন দুর্ব্বহ হ'য়ে পড়ে। ঈশ্বর তো তাদের মা হবার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। আর এই মা-ধ্বনি সেই কোন্ অনাদি অতীত কাল হ'তে বিশ্বের সকল সুর-ঝঙ্কারের মধ্যে দিয়ে সকল সুরের উচ্চে ধ্বনিত হ'য়ে আস্‌ছে। যে সন্তান মাতৃহীন, তা'র মত অভাগা এ জগতে আর নেই। আর যে জননী সন্তান-হীনা, তা'র মতও দুর্ভাগা আর নেই।

মায়ার স্বামী প্রশান্ত পুলিসের ইন্‌স্পেক্টার ছিল। পুলিসের আর সকল কর্ম্মচারীর মত তা'র মন কঠোর ছিল না। প্রাণ ছিল তা'র চির-তরুণ। মায়া সময় সময় প্রশান্তর কাছে দুঃখ কর্‌তো। প্রশান্ত তা'কে নানা রকমে বোঝাতো। তা'তেও কিন্তু মায়ার মন প্রবোধ মান্‌তো না। সে বলতো,—ওগো, ছেলে না হওয়া কি কম পাপ। ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছি যে, পুরাকালে সন্ন্যাসীরা, যাদের ছেলে হ'তো না, তাদের হাতে ভিক্ষে নিতো না। না, অমন করে' হেসে উড়িয়ে দিলে চল্‌বে না। এ আমি খুব সত্য বলে' মানি যে, পাপ থাক্‌লে ছেলে হয় না। তা'রা যে স্বর্গের জিনিধ,—পাপের রাজত্বে তো তা'রা পা দেয় না।

প্রশান্ত মায়ার এই কথায় কেবল হাস্‌তো। তা'র প্রাণেও যে দুঃখ হ'তো না, এমন নয়। পাছে তা'র দুঃখ প্রকাশ হ'লে মায়া আরো দুঃখ করে, এই জন্যেই সে হাসি দিয়ে মায়ার ও নিজের সকল দুঃখকে উড়িয়ে দিতে চাইতো। মায়ার মনে একটি কেবল সান্ত্বনা ছিল, সেটি প্রশান্তর অনাবিল ভালবাসা। সেইটুকুর জোরে সে সকল দুঃখ-কষ্টকে চাপা দিয়ে রাখ্‌তো। প্রশান্ত কত দিন দুপুরবেলা আপিস পালিয়ে মায়াকে দেখতে ছুটে এসেছে। মায়া কিন্তু তা'র এই আচরণে লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠেছে। বলেছে,—রোজ রোজ কেন এ রকম আপিস পালিয়ে আসো, বল তো?

প্রশান্ত হেসে উত্তর কর্‌তো,—মায়া যে আমায় চারি দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। তা'কে কিছুতেই কাটাতে পার্‌ছি না। তারই টানে ছুটে আসি। আর জান তো—মায়ার টানে জগৎ চল্‌ছে, আমি তো কোন্ ছার।

মায়া কৃত্রিম ক্রোধে বল্‌তো,—যাও, তোমার সঙ্গে তো কথায় পার্‌বো না। এবার বাড়ী এলে আর দেখা কর্‌বো না। বলে' ঘর হ'তে চলে যেতে চাইতো। আর প্রশান্ত খপ্ করে' তা'র আঁচল চেপে ধরে' কাছে টেনে নিতো। তার পর আস্তে আস্তে সোহাগ-ভরে তা'র সরল সুগোল গ্রীবার উপর চুম্বন কর্‌তো। মায়া অবশ শিথিল হ'য়ে প্রশান্তর বুকের উপর লুটিয়ে পড়্‌তো। মায়ার এমনি করেই দিন কাট্‌ছিল।

সেদিন এক ফাল্গুনের জ্যোৎস্না-জাগা রাত্রি। সারা আকাশটায় যেন আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

আজকের দিন মায়ার ও প্রশান্তর আট বছর আগের মিলন-দিন। মায়া ঘরের জান্‌লা খুলে দিয়ে বিছানার-উপর-এসে-পড়া জ্যোৎস্নায় নিজেকে এলিয়ে দিয়েছিল। প্রশান্ত তখনো আসেনি। তা'রই প্রতীক্ষায় মায়া বসে ছিল। আর নানা রকম ভাবনায় নিজেকে জ্যোৎস্নার মতই দিকে দিকে উধাও করে দিয়েছিল। ঠিক এমনি সময় প্রশান্ত ঘরে ঢুক্‌লো এক মুখ হাসি নিয়ে। মায়া তাড়াতাড়ি উঠে প্রশান্তকে প্রণাম কর্‌লে। প্রশান্তও পকেট থেকে একছড়া ফুলের মালা বের করে' মায়ার গলায় পরিয়ে দিলে, আর কতকগুলো কুচো ফুল তা'র খোঁপায় গুঁজে দিলে। তার পর দু'জনে পাশাপাশি বসে গল্প কর্‌তে লাগ্‌লো।

প্রশান্ত হেসে বল্‌লে,—আট বছর আগের ঠিক এমনি দিনটি মনে পড়ে। মায়া আমায় কি রকম আপনার করেছিল—এমনি দিনে। সেদিনও যেমন জ্যোৎস্না-ভরা আকাশ ছিল, আজও তেমনি, যেন আমাদের মিলন-দিনকে চির-জাগ্রত করে রাখবার জন্যে এত আয়োজন।

মায়া একটু ম্লান হেসে বল্‌লে,—সময়ে আমার মেয়ে হ'লে আজ তা'র বিয়ের চেষ্টা দেখ্‌তে হ'তো, কেমন নয় কি?

প্রশান্ত শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মায়ার কথার উত্তর দিলে। তার পর চুপচাপ। দুজনেই একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়্‌লো। আজ এই মিলন-দিনটির স্মৃতির মাঝে ঐ একটা বেদনা কেবলি কাঁটার মত খচখচ ক'রে বিঁধতে লাগ্‌লো। সমস্ত আনন্দ নিরানন্দের গাঢ় কালিমায় ঢেকে গেল। দু'জনে চুপ করে বসে রইলো। চন্দ্রদেবও

তাদের দুঃখে একটা বাড়ীর আড়ালে মুখ লুকোলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক অন্ধকার দৈত্যের মত হুড়োমুড়ি করে' ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়্‌লো।

তারপর এক দিন ভগবান সত্য সত্যই মুখ তুলে চাইলেন। এক অন্ধকার রাত্রির প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের দুঃখেরও প্রভাত হ'লো,—মায়ার একটি ছেলে হ'লো। সেদিন তাদের কি আনন্দ!

মায়ার সারা হৃদয় আনন্দের উচ্ছ্বাসে ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগলো। তা'র ভিতরকার যে মা এত দিন সন্তান অভাবে গুমরে কেঁদে মর্‌ছিল, সে আজ মাতৃত্ব লাভ করে' সত্যই মহিমান্বিতা হয়ে উঠ্‌লো। মা আজ পূর্ণত্ব লাভ করে' জগজ্জননী হয়ে বিশ্বের শিশুকে যেন কোলের ভিতর পেল। মায়া শিশুকে বুকের ভিতর আঁকড়ে ধর্‌লে। দিগন্ত-প্রসারিত আকাশের বুকে ধীরে ধীরে কলায় কলায় চন্দ্রের পূর্ণ হওয়ার মতই, শিশুও মায়ার স্নেহ-ক্ষুধাতুর প্রশান্ত বুকের উপর বেড়ে উঠ্‌তে লাগলো। তার পর একদিন খুব ঘটা করে শিশুর অন্ন-প্রাশন হলো। শিশু এত সুন্দর হয়েছিল যে, যে দেখ্‌তো, সেই মুগ্ধ হ'য়ে যেতো। সকলেরই আগ্রহ হতো, তা'কে বুকের ভিতর চেপে ধর্‌তে—এমনি সুন্দর হ'য়েছিল।

এ আনন্দ কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হলো না। বছর খানেকের হ'তে না হ'তেই, শিশু মায়ার কোল শূন্য করে, যে নন্দন-কানন হ'তে চ্যুত পারিজাতের মত ধরায় এসেছিল, সেইখানে চলে গেল। মায়া আছাড় খেয়ে মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়্‌লো। সন্তান না হওয়ার চেয়ে হ'য়ে যাওয়ার বেদনার আঘাত যে কত বেশী, তা' আজ মায়া প্রাণে প্রাণে অনুভব কর্‌লে।

যখনি সামনের দুঃখকে বড় করে দেখা যায়, তখনি তার পিছন থেকে আর একটা বড় দুঃখ উঁকি মেরে সামনে এসে দাঁড়িয়ে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, এতক্ষণ যা দেখছিলে তা' কিছুই নয় এর কাছে। মায়ারও আজ তাই হলো। যখন সে সন্তানের জননী হয় নি, তখনকার দুঃখ তো এর কাছে কিছুই নয়। এ দুঃখ—উঃ! বুকের ভিতর যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে। কিছুতেই সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। যাকে বুকের সমস্ত রস নিঙড়ে খাইয়ে মানুষ করছিল, সে আজ এক মুহূর্ত্তে কোন্ অজানা দেশের উদ্দেশে পাড়ি দিলে, সমস্ত বুকটাকে দলিত মথিত করে। বসন্তের প্রাণ-জাগানো স্পর্শে একটি অনাঘ্রাত কুসুম ফুটে উঠেই যেন ঝরে পড়ে গেল,—রেখে গেল কেবল স্মৃতি তাদের মনের মধ্যে, যারা তা'র সৌরভ উপভোগ কর্‌বার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিল।

(২)

রুদ্র বৈশাখের দুপুর। মায়া তা'র ঘরের জানলা খুলে দিয়ে রোদে-পোড়া আকাশের দিকে চেয়ে বসে ভাবছিল। দু'চোখ দিয়ে তার অশ্রুর বান ডেকে গিয়েছে। বাইরে তখন রোদ পৃথিবীর বুক পুড়িয়ে দিচ্ছে। মায়ার বুকের ভিতরও দুঃখের ঝাঁজে পুড়ে খাঁ খাঁ করছে। তা'র মাতৃ-হৃদয়কে জাগিয়ে তোল্‌বার জন্যে সে যে সোণার কাঠির স্পর্শ দুদিনের জন্য অনুভব করেছিল, তা' আজ কোন্ দৈত্যের তীব্র হুঙ্কারে কোথায় হারিয়ে গেল—তা'র প্রাণকে আর না জাগিয়ে দিয়েই। জেগে উঠে সে কিন্তু আর সে স্পর্শের মোহনতা অনুভব কর্‌তে পার্‌লে না—এ কি কম দুঃখ! ঘুমিয়ে কোনো একটা প্রাণ-মাতানো স্বপ্ন দেখে জেগে উঠ্‌লে, প্রাণ যেমন স্বপ্ন-ভাঙার অবসাদে পূর্ণ হয়ে ওঠে, এও যেন তেমনি। মায়া যেন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছিল যে, কোন্ এক স্বর্গের দেব-শিশু তা'র কোলে এসে তা'কে অভিনন্দিত কর্‌ছে। তা'র মন পুলকে দুলে দুলে উঠ্‌তে লাগলো। তার পর হঠাৎ যেন কিসের ধাক্কায় ঘুম ভেঙে যেতেই, চোখ মেলে চেয়ে দেখ্‌লে, কোথায় বা সে দেব-শিশু, আর কোথায় বা সে পুলক। সে শুয়ে আছে একলা কর্কশ বিছানার উপর। অন্তর তার তীব্র হাহাকারে কেঁদে উঠে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌লো।

মায়া যখন জানলায় বসে' বসে' নিজের দুঃখের বেদনাকে অশ্রু-ধৌত কর্‌ছিল, ঠিক সেই সময় তা'র তন্ময়তা ভাঙিয়ে কাণে একটা শিশু-কণ্ঠের শব্দ এলো—মা! সে চম্‌কে উঠ্‌লো। এ কি! তা'র দুঃখের উপর বিধাতার এ কি বিদ্রূপ! আবার সেই ডাক—মা! সে পিছন ফিরে দেখ্‌লে, পিছনে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত, আর তা'র কোলের উপর একটি ছোট্ট ফুটফুটে সুন্দর ছেলে। মায়া তাড়াতাড়ি উঠে তা'র দিকে হাত বাড়াতেই, শিশু মা বলে' তা'র কোলে ঝাঁপিয়ে এলো,—অপরিচিত বলে তা'র কোলে যেতে কিছুমাত্র দ্বিধা কর্‌লে না।

বোধ হয় তা'র মার মতই তাকে দেখ্‌তে ছিল। শিশুর মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌লো; কিন্তু তখনো তা'র গালের অশ্রুর দাগ মুছে যায় নি। মায়ার মুখেও অশ্রুর ভিতর দিয়ে হাসি ফুটে উঠ্‌লো, ঠিক শরৎকালের ক্ষণ-বর্ষণের পর রোদের মৃদু হাসির মত। মায়া শিশুকে বুকের ভিতর চেপে ধরে চুমোয় চুমোয় তা'কে ভরিয়ে দিলে। বালকও সেই স্নেহের অত্যাচার বেশ শান্তভাবেই উপভোগ করতে লাগলো। প্রশান্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো—এই মেঘের কোলে রোদের খেলা। মায়ার অতৃপ্ত হৃদয় আবার তৃপ্তির মহিমায় দীপ্ত হয়ে উঠ্‌লো; খালি বুক যেন আবার ভরে উঠ্‌লো।

কিছুক্ষণ এমনি নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে কেটে যাবার পর মায়া প্রশান্তকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—হ্যাঁগা, একে কোথায় পেলে?

প্রশান্ত বল্‌লে,—দুপুর বেলা আপিসে বসে আছি, এমন সময় একটা পাহারাওয়ালা একে কোলে করে' নিয়ে এসে বল্‌লে, এ একা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে অনেক খোঁজ করেও কাদের ছেলে জান্‌তে পারেনি। তাই থানায় নিয়ে এসেছে। থানায় কোথায় রাখ্‌বো বলে' বাড়ী নিয়ে এলাম। যার ছেলে সে খোঁজ কর্‌লে ফিরিয়ে দিতে হবে।

প্রশান্তর কথা শুনে, মায়ার মুখে ও অন্তরে যে আনন্দের আলো উদ্ভাসিত হয়েছিল, তা' কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। মায়া ম্লান মুখে বল্‌লে,—ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, দোহাই তোমার, কেউ যদি খোঁজ কর্‌তে আসে তো বলো না যে, তুমি জান। আমি একে ছেড়ে দেবো না। তাদের হয় তো অনেক আছে, আমার যে আর নেই গো। একে ছাড়্‌লে আমি বাঁচবো না। বলে' শিশুকে বুকের ভিতর চেপে ধর্‌লে—যেন এখনি কেউ কেড়ে নেবে।

প্রশান্ত ধীরে ধীরে বল্‌লে,—তা' যে হয় না মায়া! আমাদের নিজের জিনিষই যে ধরে রাখ্‌তে পার্‌লাম না, আর এ তো পরের ছেলে। একে কোন্ জোরে ধরে রাখ্‌তে চাও? প্রশান্তর কথা শুনে মায়ার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়্‌লো। প্রশান্ত আস্তে আস্তে ঘর হতে বেরিয়ে চলে গেল।

প্রশান্ত ঘর হতে চলে যেতেই, মায়া ছেলেটাকে দুম্ করে' মেঝেয় বসিয়ে দিয়ে বল্‌লে,—হতভাগা, থাক্‌বিই না যদি, তো এলি কেন? যা, যেখান থেকে এসেছিস, সেইখানে যা। বলে মুখ ফিরিয়ে গুম্ হয়ে বস্‌লো।

ছেলেটা কিছু বুঝ্‌তে না পেরে খানিকক্ষণ হতভম্ব হ'য়ে বসে রইলো। তার পর চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌লো। তা'র কান্না গিয়ে মায়ার মাতৃ-হৃদয়ে ধাক্কা দিতেই, মায়া আর চুপ করে' থাক্‌তে পার্‌লে না,—উঠে এসে তা'কে বুকের ভিতর চেপে ধর্‌লে। শিশুর চোখের জলের সঙ্গে তা'র চোখের জল মিশে গিয়ে এক সঙ্গে ঝরে পড়ে' দুজনের বুক ভাসিয়ে দিতে লাগ্‌লো। মায়া শিশুকে কোলে করে' ভাবতে লাগ্‌লো, এ কি অদৃষ্টের পরিহাস! যাকে ভগবান নিজের বলে জোর কর্‌বার জন্যে দিয়ে-ছিলেন, তাকেই যখন দু' দিন যেতে না যেতেই কেড়ে নিলেন—হৃদয়ের বুভুক্ষা মেট্‌বার আগেই, তখন আবার এই পরের শিশুকে কোলে এনে দিয়ে এ আবার কি কৌতুক! একবার ভাব্‌লে যে, সে একে রাখ্‌বে না। প্রশান্ত এলে বল্‌বে, একে নিয়ে যেতে। কেন দু' দিনের জন্যে মায়া বাড়ানো। নিজের ছেলেই যখন থাক্‌লো না, তখন পরের ছেলে, যাকে দু'দিন বাদে ছেড়ে দিতে হবে, তাকে নিয়ে কেন আর মায়ার মোহে জড়ানো। কিন্তু তখনই তার ভিতরকার মা বলে' উঠ্‌লো, ওরে না, তোর নিজের ছেলেকে ভগবান নিজের কাছে টেনে নিয়ে, তোকে এখন বিশ্বের শিশুর জননী করে দিয়েছেন। এখন তো আর আপন-পর ভেদ কর্‌লে চল্‌বে না। সব শিশুকেই তো তোর বুকে তুলে নিতে হ'বে। এই জন্যেই হয় তো ভগবান এককে নিয়ে বহুর মধ্যে তাকে বিলীন করে' দিয়েছেন। বিশ্বের শিশু যে আজ তো'কে মা বল্‌বার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে রয়েছে। এখন আর সেই একের দুঃখের বোঝা বইলে তো চল্‌বে না। এখন বহুর সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজের সুখ-দুঃখ মিলিয়ে দিতে হবে। তবেই তো তোর মা হওয়া সার্থক হবে।

সেই দিন হ'তে মায়া সেই তরুণ অতিথিকে বুকে করে' মানুষ কর্‌তে লাগ্‌লো। প্রশান্তকে ভুলেও কোনো দিন জিজ্ঞাসা কর্‌তো না যে, কেউ ছেলের সন্ধান কর্‌তে এসেছিল কি না। ভয়, পাছে প্রশান্ত বলে' যে, হ্যাঁ,

এসেছিল। প্রশান্ত বাড়ী এলে সে অন্য নানা কথায় তা'কে ভুলিয়ে রাখ্‌তো। শিশুর কথা মোটেই তুল্‌তো না।

ক্রমে মায়া জোর করে' নিজের মনকে ভোলালে যে, এ শিশু তা'র। অন্যের শিশু সে মানুষ করে নি। কাক-মাতা যেমন কোকিল-শিশুকে নিজের সন্তান ভেবে মানুষ করে, এও ঠিক সেই রকম। মায়া নিজের মনকে বোঝালে যে, এ তার শিশু না হ'লে, অন্যের কাছে না গিয়ে তা'র কাছেই বা আস্‌বে কেন। যদিই বা কেউ নিতে আসে, সে জোর করে' ধরে রাখ্‌বে। সে যে ছেলেকে মানুষ কর্‌ছে, এতে ছেলের উপর কি তার কোনো স্বত্ব জন্মায় নি? তাদের পায়ে ধরে কেঁদে বল্‌বে যে, ওগো, দোহাই তোমাদের, একে আমার কাছে থাক্‌তে দাও—কেড়ে নিও না।

মায়া নিজের মনের সঙ্গে এমনি করে লড়াই করে, স্নেহ-ক্ষুধাতুর হৃদয়ের আড়াল দিয়ে শিশুকে ঘিরে রাখ্‌লে। শেষকালে এমন হলো যে, সে প্রশান্তকে দেখ্‌লেই চম্‌কে উঠ্‌তো—বুঝি এখনি প্রশান্ত বল্‌বে যে, সে শিশুকে নিতে এসেছে। প্রশান্তর কাছ হ'তে সে দূরে দূরে থাক্‌তো। এমনি করে ভয় ও ভালবাসার দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে কিছু দিন কেটে গেল।

সেদিন দুপুরবেলা মায়া শিশুকে কোলে করে' চুপ করে' বসে ছিল, এমন সময় প্রশান্ত ঘরে ঢুকলো। মায়া অসময়ে প্রশান্তকে আস্‌তে দেখে চম্‌কে উঠ্‌লো। তার পর আরো বেশী চম্‌কে উঠ্‌লো, যখন প্রশান্ত বল্‌লে যে, আজ শিশুকে ছেড়ে দিতে হবে। যাদের ছেলে, তা'রা আজ খোঁজ পেয়েছে, এবং এখনি তাকে নিয়ে যেতে চায়—বাইরে তা'রা দাঁড়িয়ে আছে।

মায়া এই কথা শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠে, শিশুকে বুকের মধ্যে চেপে ধর্‌লে। এ কি বজ্র-হানা কথা আজ তা'র কাণের কাছে ধ্বনিত হলো! সে তো ভুলেই গিয়েছিল যে, একে ছাড়্‌তে হবে। আজ আবার এ কি কথা!

মায়া প্রথমে কিছুতেই রাজী হতে চায় না—ছেলেকে ছেড়ে দিতে। শেষে প্রশান্তর অনুনয় বিনয়ে সে শিশুকে তা'র কোলে দিতে যেতেই শিশু মায়াকে জড়িয়ে ধরে ডাক্‌লে—মা। দেওয়া আর হোলো না। মায়ার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়্‌লো। এক দিন এমনি করেই তা'র বুকের রত্ন ভগবান ছিঁড়ে নিয়েছেন,—আর আজ আবার মানুষ ছিঁড়ে নিতে এসেছে তার কুড়িয়ে-পাওয়া পথে-হারানো রত্ন। কিন্তু তখনি তা'র মনে হ'লো যে, একে ধরে রাখ্‌বার ক্ষমতা তো তার নেই। তবে কেন সে এ রকম অন্যায় জোর কর্‌ছে। ভগবান যখন তার উপর এই দুঃখের বজ্র হান্‌ছেন, তখন সেও দেখবে যে, তিনি তা'র উপর কত দুঃখের ঝড় বহাতে পারেন। মায়া দাঁতের উপর দাঁত চেপে শিশুকে জোর করে' বুক থেকে ছাড়িয়ে প্রশান্তর কোলে দিলে—নিজের হাতে নিজের হৃৎপিণ্ড উপ্‌ড়ে ফেলার মত।—তার পর মুখ ফিরিয়ে নিলে এ দৃশ্য দেখ্‌বে না বলে'। আর নিজের মনকে অসীম বলে' দৃঢ় করে' রাখ্‌লে এই স্নেহেব যুদ্ধের মাঝে।

বেশীক্ষণ কিন্তু মায়া এরকম করে' থাক্‌তে পার্‌লে না। তা'র কাণে এলো আবার অশ্রু-ভেজা সেই ডাক্—মা! সে চম্‌কে উঠে মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে যে, প্রশান্ত শিশুকে নিয়ে চলে গেছে—কেবল ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই শিশুকণ্ঠের ধ্বনি—মা! সে চীৎকার করে প্রশান্তকে ডেকে ফেরাতে গেল; কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বের হলো না—অশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। বুকের ভিতরকার সকল অশ্রু আজ উথলে উঠে সকল ব্যথার মুখ খুলে দিলে। আজ সে দ্বিতীয়বার সন্তান-হীনা হলো। সে নিজেকে আর সাম্‌লে রাখতে পার্‌লে না—মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লো অবশ শিথিল হ'য়ে। তা'র কাণের কাছে ও সমস্ত ঘরটার ভিতর তখনো সেই ধ্বনি কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো—মা!

ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা

(তৃতীয় স্তবক)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দিল্লীতে এবার কংগ্রেসের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যে কি রকম হাঁপিয়ে উঠেছিল, তা জানেন এক অন্তর্যামী।

ম্যাগেজিন গেট—দিল্লী

কংগ্রেসে বক্তৃতাদি দুচার দিন শুনেই, দেশোদ্ধারটা যে শক্ত কাজ, সে বিষয়ে সংশয় ঘুচে গেছিল। তাছাড়া, মনে হয়েছিল যে, সংসারে অতিমানুষ যদি কেউ থাকেন তবে, তাঁরা হচ্ছেন, যাঁরা কংগ্রেসের পালা শেষ করে আবার Subjects Committeeর (বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতি) পালা পূরোদমে চালাতে পারেন। সে যাই হোক্, এ অতিমানুষের সমস্যা ছেড়ে দিলেও, এ কংগ্রেসে আমাদের অনেকেরই শ্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জনের ওপর বড় ভক্তি হয়েছিল। কারণ একে গরম; তার ওপর উপ্‌রো-উপ্‌রি কংগ্রেসের মণ্ডপে অফুরন্ত তেজোগর্ভ, দেশোদ্ধারী বক্তৃতা শোনা; তাঁর ওপর প্রহরব্যাপী বিষয়-নির্ব্বাচনীর অশেষ কচকচি। দাশমহাশয়ের স্বাস্থ্যও তখন—সে আজ ন'মাস হবে—মোটেই ভাল ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে দিনের পর দিন ও রাতের পর রাত অক্লান্ত পরিশ্রম কর্ত্তে দেখে মনটা শ্রদ্ধায় অভিভূত না হয়েই পারত না। তখন স্বরাজ্য দলের অদৃষ্টও trembled in the balance। দিল্লীতে তখনও গয়া কংগ্রেসের জের চল্‌ছে। অধিকাংশ কংগ্রেস-নেতাদের মুখে এই কথা যে, যেহেতু মহাত্মা বলেছেন কাউন্সিল-প্রবেশ অসহযোগের পরিপন্থী, সেহেতু তা বিষবৎ পরিত্যজ্য। আমাকে দিল্লীতে একজন সামান্য বাঙালী স্কুলমাষ্টার যা বলেছিলেন, তাতে আমাকে ভাবিয়ে দিয়েছিল, মনে আছে, যে, এ সাদা কথাটা কংগ্রেসের বিদ্যাদিগ্‌গজদের মাথায় ঢুকতে এতই দেরি লাগে কেন? তিনি বলেছিলেন, "আচ্ছা ম'শায়! কাউন্সিল-প্রবেশ উচিত কি না, এ আলোচনা সঙ্গত, বুঝতে পারি। কিন্তু মহাত্মাজী এর বিরোধী, এটা যুক্তি হয় কেমন করে, তা ত

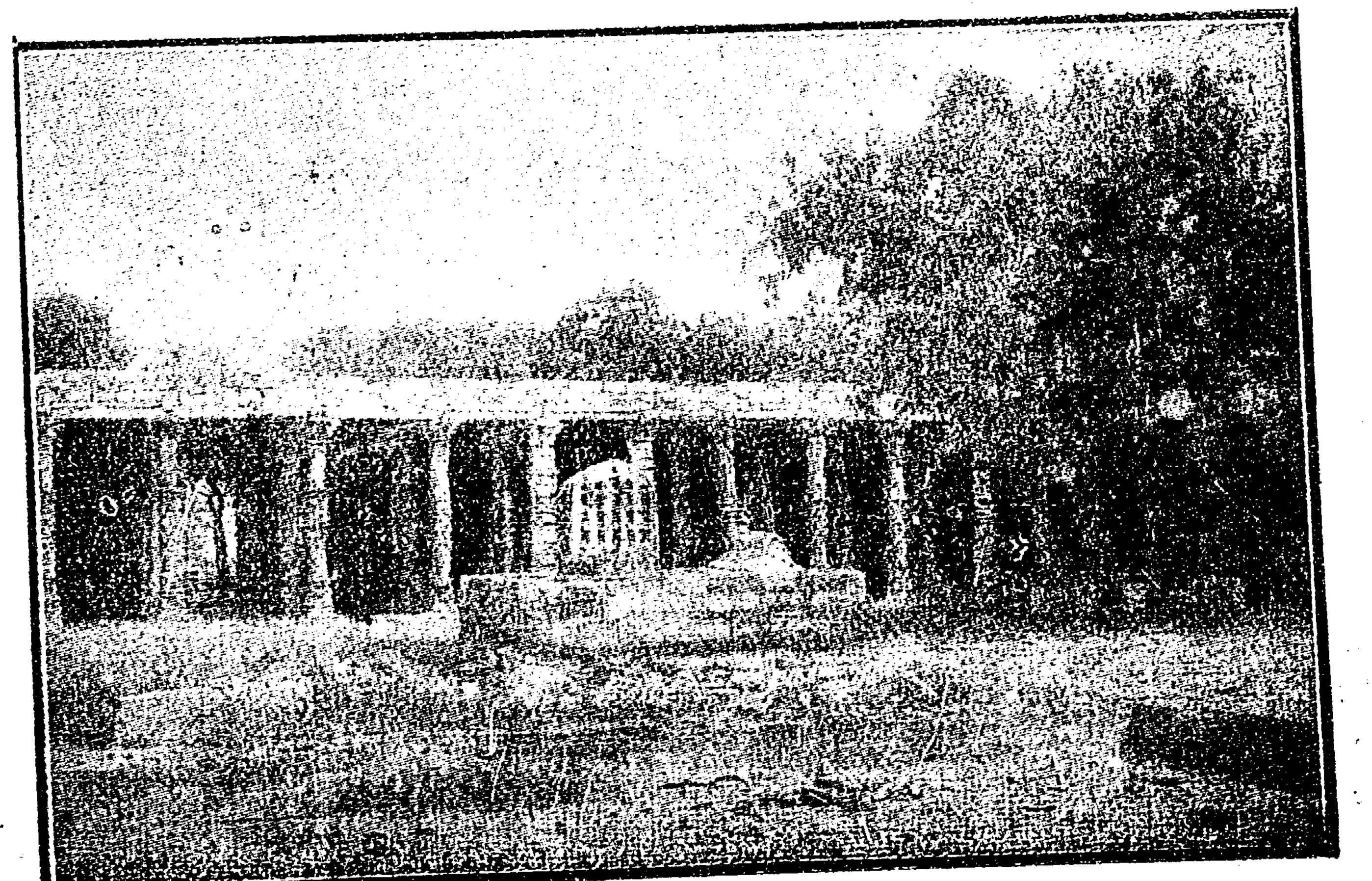

পৃথ্বীরাজ মন্দির—দিল্লী

আমার বুদ্ধিতে ঢোকে না। আমি কি এতই বোকা?" মনে আছে, একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম—যে, অন্ততঃ বাঙালী জাতির মধ্যে একজন সাধারণ লোকও এতটা স্বাধীন ভাবে ভাব্‌তে সাহস করেন, যেটা কংগ্রেসের বড় বড় পাণ্ডারা কল্পনায়ও আন্‌তে সাহস করেন না। স্বাধীন-চিন্তা ত দূরের কথা,—দেশের বড় বড় নেতা কংগ্রেসে বড় গলা ক'রে অম্লান বদনে বলে গেলেন, মহাত্মাজীর যখন এই মত, তখন আমাদেরও এই মত হ'তে বাধ্য। আমি নিজে কোনও পার্টিরই লোক নই; কিন্তু দাশমহাশয় তাঁর এই যে স্বাধীন বিশ্বাস অনুসারে স্বাধীন ভাবে কাজ কর্ত্তে চেয়েছিলেন, সেটা তখন আমার পক্ষে খুবই ভাল লেগে-ছিল—যদিও তখন কংগ্রেসে স্বরাজ্য পার্টির অদৃষ্ট অতি অনিশ্চিত ছিল। আমরা ভুল করি, ঠকি, পদস্খলিত হই বা না হই, জীবনে সেটাই সব চেয়ে বড় কথা নয়; কারণ, জীবন একটা নির্ভুল একরোখা পরিণতি নয়। আসল কথা হচ্ছে, জীবন-বিধাতার দানের দাম দিতে শেখা, যার মধ্যে স্বাধীন বিশ্বাস অনুসারে কাজ করার ক্ষমতা একটা মস্ত বড় জিনিষ। ফ্রান্সের একজন বড় লেখক জর্জ্জ ডুহামেল সেদিন সুইজরলণ্ডে আমাদের একটা বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, জগতের মুক্তি মিল্‌তে পারে এক তখনই, যখন প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন ভাবে ভাব্‌তে শিখ্‌বে;—শুধু জননায়কদের অন্ধ ভাবে অনুসরণ ক'রে গেলে হবে না। সে দিন অবশ্য সুদূর; কিন্তু বাস্তবিকই এ ছাড়া অন্য কোনও আদর্শেই কোনও স্থায়ী সমাধান মেল্‌বার সম্ভাবনা কম। তবে ভরসার কথা এই যে, 'শিক্ষা' বলে যে একটা কথা আছে, তার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমরা অনেক সময়ে ঘোর সংশয় পোষণ কর্লেও, সেটা মিথ্যা জিনিষ নয়। অর্থাৎ শিক্ষার একটা আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করা চলে, যার পরি-ণামে সমাজের এমন সব হিত সাধিত হ'তে পারে, যা এখন আমরা কল্পনা কর্ত্তেও সাহস পাই না। ঠিক্ এই কথাই আজ পাশ্চাত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ বল্‌ছেন (Wells-এর Salvaging of Civilization বা Russelএর Prospects of Industrial Civilization দ্রষ্টব্য)। আমরা এ বিষয়ে এখনও সম্পূর্ণ সজাগ হই নি; কারণ, আমরা একটু বেশি রকম গতানুগতিকতারই পক্ষপাতী।

দিল্লীতে এক দিন দাশ মহাশয়কে সমস্ত দিন কংগ্রেসের সভার পর কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের সঙ্গে সেই মোটা চাল ও ডাল খেতে দেখে মনে যুগপৎ দুঃখ ও আনন্দ হয়েছিল। তাঁর সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর আমাদের তাঁর জন্য একটু ভাল আহার্য্যের বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল, এই ভেবে কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অম্লানবদনে এত কষ্ট স্বীকার কর্ত্তে দেখে আনন্দও হয়েছিল। মনে আছে সে দিন চোখের সামনের সেই দৃশ্য দেখে মনটা আমাদের বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। খাঁটি ত্যাগ—অর্থাৎ জোর করে ত্যাগ নয়, আপনা-থেকেই আসে এমন ত্যাগ—একটা মহিমময় জিনিষ বটে, এটা যেন সে দিন বেশি করেই উপলব্ধি করেছিলাম। বাইরে থেকে দেখ্‌তে এ সব ঘটনা খুবই ছোট মনে হ'লেও, বস্তুতঃ এ সব ছোটখাট ঘটনার প্রভাব অনেক সময়ে আমাদের ব্যক্তিগত মনের ওপর হঠাৎ খুবই বেশি হয়ে ওঠে, যদিও তার কারণ সব সময়ে খুব সুবোধ্য নয়। নিবেদিতা একবার বড় সত্য কথাই লিখেছিলেন যে "Some of our deepest convictions spring from data which convince none but ourselves."

দিল্লীতে অত্যধিক গান করে ভগ্নপ্রায় গলা নিয়ে ও সেই বিপর্য্যয় ভিড়ের মধ্যে দিশেহারা হয়ে, যখন কোথাও কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না, তখন দেখি, আমাদের শ্রদ্ধেয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেশ একটি নির্জ্জন স্থানে বসে তাম্রকূটসেবন করতঃ কংগ্রেসের প্রতিনিধির যাবতীয় দুরূহ কর্ত্তব্য একাগ্রচিত্তে সাধন কর্চ্ছেন। তবে কথা উঠ্‌তে পারে যে তাঁর অত শান্তিতে বাস করা সাধারণ কংগ্রেসওয়ালার চেয়ে অনেক বেশি দরকার ছিল; কারণ, তিনি শুধু কংগ্রেস-প্রতিনিধি ছিলেন না, নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির সভ্যও ছিলেন। তবে অত নির্জ্জন স্থলেও অপ্রতিহত-প্রভাবে তাম্রকূট সেবনে ব্যাঘাত হওয়ার দরুণ বোধ হয় তাঁর কংগ্রেসের দুঃসাধ্য কর্ত্তব্য সাধনের কাজ সুচারু রূপে সম্পন্ন হওয়া মুস্কিল হয়ে পড়েছিল। কেন না, তিনি আমাকে বল্লেন যে, বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তত্রস্থ সন্ন্যাসীদের দ্বারা আধ্যাত্মিক ভাবে সেবিত না হ'লে, এ সব গুরুতর কাজ সুসম্পন্ন হবার নয়। আমিও সেখানে যেতে

রাজী কি না?—তা আর বল্‌তে! তার পর-দিনই আমরা সেই তীর্থ অভিমুখে যাত্রা কর্লাম।

দিল্লীর কুতবমিনারে চড়ে খুব বেশি আত্মপ্রসাদ লাভ না কর্লেও, তার দেওয়ানী খাস, দেওয়ানী আম প্রভৃতি

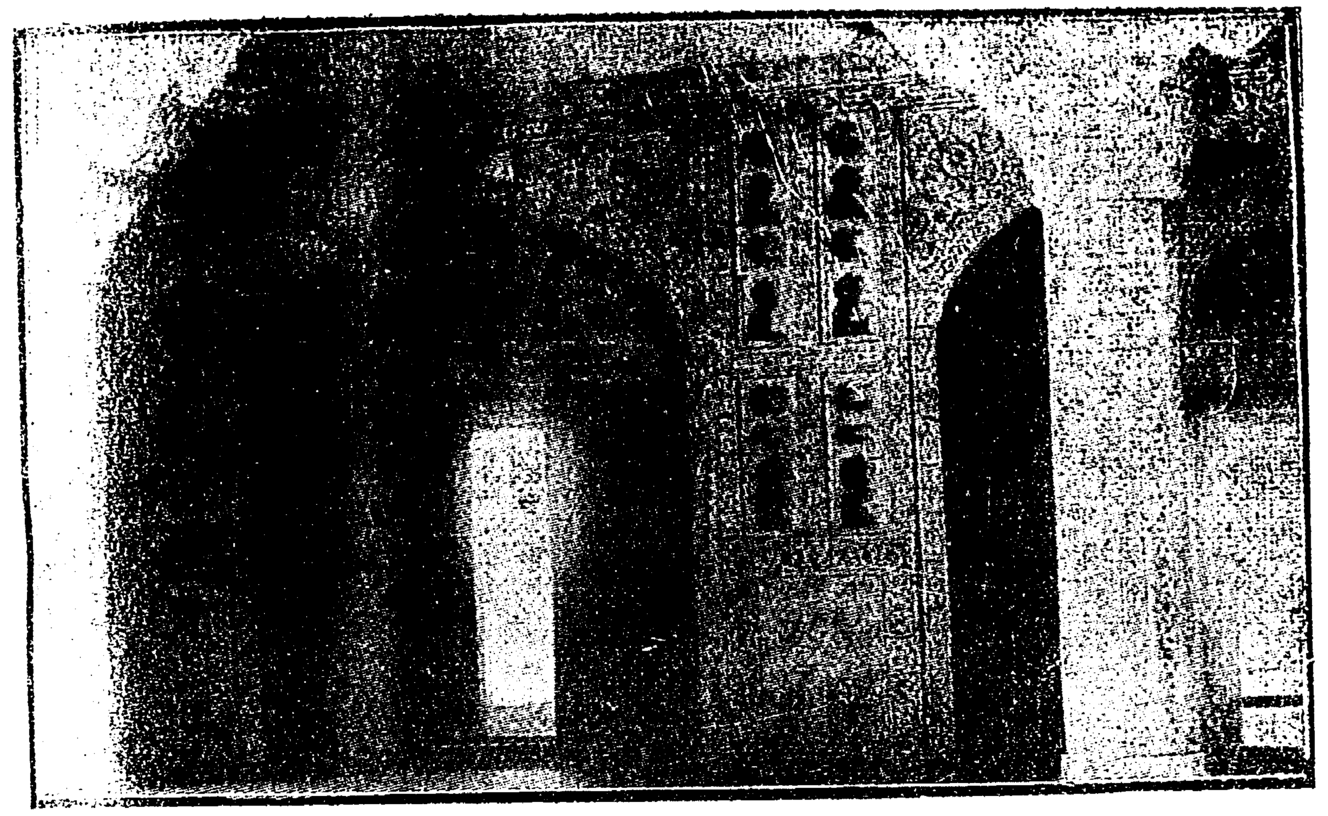

দেওয়ানী আম—আগ্রা ফোর্ট

মোগল-কীর্ত্তি বড় ভাল লেগেছিল। বন্ধুবর সুভাষ আমায় সহর্ষ পুলকে বলে উঠ্‌লেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধন কর্ত্তে হলে, মুসলমান-বিদ্বেষীদের একবার মাত্র দিল্লী-আগ্রাতে এই সব মুসলমান-কীর্ত্তি দেখালেই, তাদের মনে বিদ্বেষকে প্রেমে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। কথাটা হয় ত নিতান্ত ভুল নয়। বাস্তবিক ললিত-কলার সৌন্দর্য্যের বিশ্বজনীন আবেদনের ক্ষেত্রে এ মিলন-সাধন যেমন সহজসাধ্য ও সত্য হয়ে ওঠে, তেমন বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না। অন্ততঃ আমি নিজের দিক্ দিয়ে বল্‌তে পারি যে, মুসলমানদের ওপর আমার শ্রদ্ধার অনেকখানির মূলই—হিন্দু-সঙ্গীতে অপিচ স্থাপত্য-শিল্পে তাদের দানের জন্য কৃতজ্ঞতা। দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর-সিক্রি প্রভৃতি সহরে গেলে এ শ্রদ্ধা আরও দৃঢ়ভিত্তি হয়।

কিন্তু দিল্লীতে গান-বাজনা এবার শোনা গেল না মোটেই। অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল, সেখানে একজন গায়ক আছেন পিয়ারে খাঁ; কিন্তু তিনিও খুব বড় গায়ক নন। আমার এক গুজরাতী বন্ধু আমাকে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকার গান শোনাবেন বলে নিয়ে গেলেন এক দিন এমন এক অদ্ভুত গাইয়ের কাছে, যাঁর উচ্চসঙ্গীতের একমাত্র কৃতিত্বের প্রমাণ তাঁর বিরাট গোঁফজোড়া। নিরাশ হয়ে সুভাষকে বল্লাম, "কই সুভাষ, আমাকে দিল্লীতে যে বড় বড় গাইয়ের গান শোনাবে বলে ভরসা দিয়ে এইসাত সমুদ্র তের নদী পথ টেনে নিয়ে এলে, এখন কোথায় তোমার সে প্রতিজ্ঞা-পালন?"—কিন্তু সে কথা আর তখন কে শোনে? সুভাষ তখন দেশোদ্ধারে এতই ব্যস্ত যে তার নিঃশ্বাস ফেল্‌বারও অবকাশ ছিল না। কাজেই দিল্লী পরিত্যাগ কর্ত্তে কোনও কষ্টই হোল না—বিশেষতঃ শরৎবাবুর মত সজ্জনের সঙ্গে। তা ছাড়া, সে ভিড়ের হাত হতে নিষ্কৃতি পেয়ে মধু-বৃন্দাবন দেখ্‌ব, এ কথা ভেবে মনটা এক বিমল খুসিতে ভ'রে উঠ্‌ল।

দিল্লীতে একমাত্র স্বস্তি ছিল—কংগ্রেস-মণ্ডপ থেকে কোনও মতে অব্যাহতি পাওয়ার মধ্যে। যখন সেখান থেকে পালিয়ে বন্ধুবর বি—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মোটরে

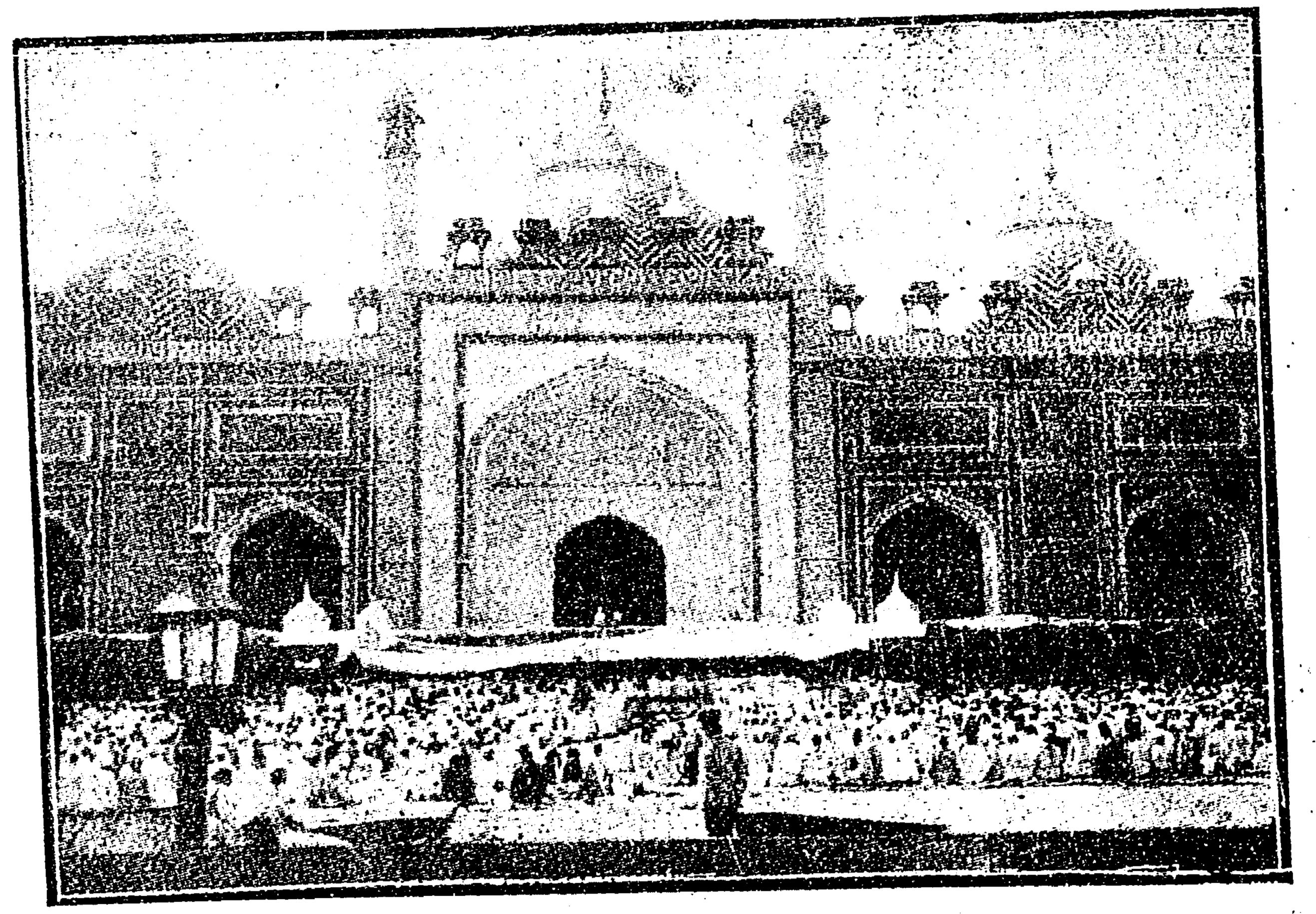

জুম্মা মস্‌জিদ—আগ্রা

করে শরৎবাবুকে নিয়ে দিল্লী সহর চক্র দিতাম, ও একত্রে নানারূপ "গাল-গল্প" করতাম, কেবল তখনই আমাদের আড্ডাপ্রিয় বাঙালী মনটা খানিকটা সুস্থ হ'ত। বিদেশে

বাঙালীর সাহচর্য্য আমাদের একটু বেশি ভাল না লেগেই পারে না—বিশেষতঃ যদি কংগ্রেসের নেতাদের অসার বক্তৃতা কিছু দিন ধরে রুদ্ধশ্বাসে শুন্‌তে বাধ্য হ'তে হয়।

বি—ভারী রসিক লোক ছিলেন। তিনি আমেরিকান মহিলাদের কেমন করে হিন্দু-মহিমা সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে স্তম্ভিত করে দিতেন, সে সব কথা বেশ কৌতুকপ্রদ ভাবে বল্‌তেন। সেই প্রবীণ গম্ভীর কংগ্রেস-নেতাদের গভীর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার চেয়ে বি—র বক্তৃতা কোনও অংশেই কম কৌতুকপ্রদ ছিল না, এ কথা আমি শপথ করে বল্‌তে পারি।

বৃন্দাবনেও বি—তাঁর মোটরযান নিয়ে হাজির হওয়াতে, আমরা একত্রে—অর্থাৎ আমি, তিনি, শরৎবাবু ও স্বামী বেদানন্দ (বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ)—গিরি গোবর্দ্ধন দেখ্‌তে গিয়েছিলাম।

গিরি গোবর্দ্ধন দেখে বিশ্বাসই হ'ল না যে, সেটা একটা গিরি। একটা পুকুরের মধ্যে খানকতক বড় বড় পাথর। তবে পাণ্ডারা যখন শপথ করে বল্‌ল যে, হাঁ, সেইটেই গিরি গোবর্দ্ধন, তখন বিশ্বাস কর্ত্তেই হ'ল। এবং তখন এক মুহূর্ত্তেই বুঝেছিলাম যে, কেমন করে বংশী-ধারী গোবর্দ্ধন-ধারণরূপ অসাধ্য সাধন করেছিলেন।

বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে শরৎবাবুর সঙ্গে তিন-রাত্রি অজস্র গল্পালাপের মধ্যে কাটানো গিয়েছিল। তার ওপর সে শান্তরসাস্পদ আশ্রমে প্রশান্ত ভাবে অতিথি-সৎকার গ্রহণ করাটা আমাদের কাছে যে কম উপাদেয় ঠেকে নি, সে কথা বোধ হয় সহজেই অনুমেয়। সুতরাং বৃন্দাবনধাম বড় ভাল লেগেছিল, এটা বলাই বেশি—বিশেষতঃ কাটখোট্টা দিল্লী-কংগ্রেসের অত্যাচারের পরে।

শ্রীবৃন্দাবনধাম শ্রীমন্দিরে-মন্দিরে একাকার। কত যে শ্রীমন্দির, কত যে শ্রীবৈষ্ণবী খরতাল নিয়ে গান করেন, কত যে শ্রীকচ্ছপ, তার আর কি বল্‌ব! (বৃন্দাবনে সবই শ্রী কি না!) শ্রীযমুনায় স্নান করার বিপুল ইচ্ছা শ্রীকচ্ছপের লীলা-খেলার দরুণ সংবরণ কর্ত্তে হ'ল।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে স্বামী বেদানন্দই একমাত্র কর্ম্মী বল্‌লেই চলে। ইনি শরৎবাবুর ভ্রাতা এবং একজন সত্যিকার কর্ম্মী। এক রকম একাই সেখানকার নানান্ হিতকর কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। তাঁর "দাদৃভক্তি"র দরুণ অতিথি-সৎকারের জেরটা আমাদের ওপরও এসে পড়েছিল। আমাদের মানে আমার ও আমাদের এক তরুণ বন্ধু শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্রের উপর। সুরেশচন্দ্র ছিলেন বাংলা-সাহিত্যের অনুরাগী ও বাঙালী-সুলভ আড্ডারসের একান্ত রসিক।

মথুরায়ও একদিন যাওয়া গেল। সেখানে শ্রীমন্দির বিশেষ দর্শন করা ঘটে ওঠে নি—যে শ্রীহনুমানের অত্যাচার। মথুরার বিশ্রাম-ঘাটে আমাদের এক পরিচিত ভদ্রলোকের চশমা নিয়ে জনৈক শ্রীহনুমান সটাং অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। তখন সুপক্ক কদলীর লোভ দেখিয়ে তাকে চশমা ফিরিয়ে দিতে রাজী করা গেল। শ্রীহনুমান ভাব্‌লেন "ক্ষতি কি? Fair exchange is no robbery" মথুরাবাসী পবননন্দন না কি এরূপ Strategy-তে খুবই অভ্যস্ত।

মথুরা ও বৃন্দাবনের মধ্যে বৃন্দাবনই আমার বেশি ভাল লেগেছিল, যদিও কেন যে ভাল লেগেছিল, তা খুব সুস্পষ্ট করে বলা কঠিন। কোনও স্থান ভাল-লাগাটা নির্ভর করে অনেকগুলি জিনিষের উপর; যথা—আমাদের তখনকার মনের ওপর, সঙ্গের বা নিঃসঙ্গত্বের ওপর, অনেক সময়ে সে স্থানটির সঙ্গে জড়িত নানান্ ছোটখাট স্মৃতির ওপর,—এমনই আরও কত কি জিনিষের ওপর, যেগুলির অস্তিত্ব বা আবেদন আমাদের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে খুবই প্রত্যক্ষ হ'লেও, অপরকে ঠিক্ সে আবেদনটির আভাষ দেওয়াটা অনেক সময়ে সুকঠিন হয়ে ওঠে। আমার সঙ্গী বা বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেরই বৃন্দাবন ভাল লাগেনি। তাঁরা আমার ভাল লাগার কথা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, কেমন করে অমন সহর আমার ভাল লাগ্‌ল! উত্তর আমি ঠিক্ মত দিতে পারি নি, কেন না, এ সব ভাল-লাগা না-লাগা সমস্যার সমাধান বড় সহজ-সাধ্য নয়। মনে আছে, বৃন্দাবনে এক দিন সূর্য্যাস্ত এত ভাল লেগেছিল যে, আমি আমার সঙ্গীদের দ্বারা পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হ'লেও, দ্রুতগতিতে দ্রষ্টব্য স্থান দর্শনের জন্য ছুটতে মনকে রাজী করাতে পারি নি। আমার সেদিন মনে হয়েছিল যে, আমরা sight-seeingটাকে অনেকটা কর্ত্তব্য বলে ধরে নেওয়ার দরুণ, অনেক সময়েই যে জন্য সেটা বড়, সে আসল জিনিষটাই হারিয়ে বসে থাকি।

যদি তীর্থ-দর্শন প্রভৃতি আনন্দের তাগিদে করা যায়, তবেই তার সার্থকতা আছে, নইলে মিছে কেন এত অশ্রান্ত চেষ্টা? মনে আছে, য়ুরোপে নানাস্থলে অনেক সময়ে এই কর্ত্তব্য-বোধের দরুণ নানান্ দ্রষ্টব্য ঐতিহাসিক স্থান দেখ্‌তে যেতাম। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ঐতিহাসিক ঘটনায় আমার মন বড়-একটা সাড়া দিত না ব'লে, সে সব স্থলে প্রায়ই দৃষ্ট স্থান বা বস্তু আনন্দের খোরাক না জুগিয়ে ঐকান্তিক ক্লান্তির গুরু ভার বহন করে এনে দিত। সংসারে কর্ত্তব্য ত আছেই—এবং দুঃখের বিষয়, জীবনে সহজ আনন্দ দানের বা মানসিক বিকাশের জন্য যতটুকু দরকার, তার চেয়ে অনেক বেশি আছে। তাই যখন মানুষ ভ্রমণে বাহির হয়, তখনও যদি কর্ত্তব্য-প্রভু অহরহ ঘাড়ে চেপে বসে থাকেন, তবে বোধ হয় জীবন সকলের কাছেই দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে—এক আমেরিকান touristদের কাছে ছাড়া। সে যাই হোক্, এই শেষ সম্প্রদায় য়ুরোপে তাঁদের "প্রতিহিংসার সহিত" নগর দর্শনের দৃষ্টান্তে আমাকে

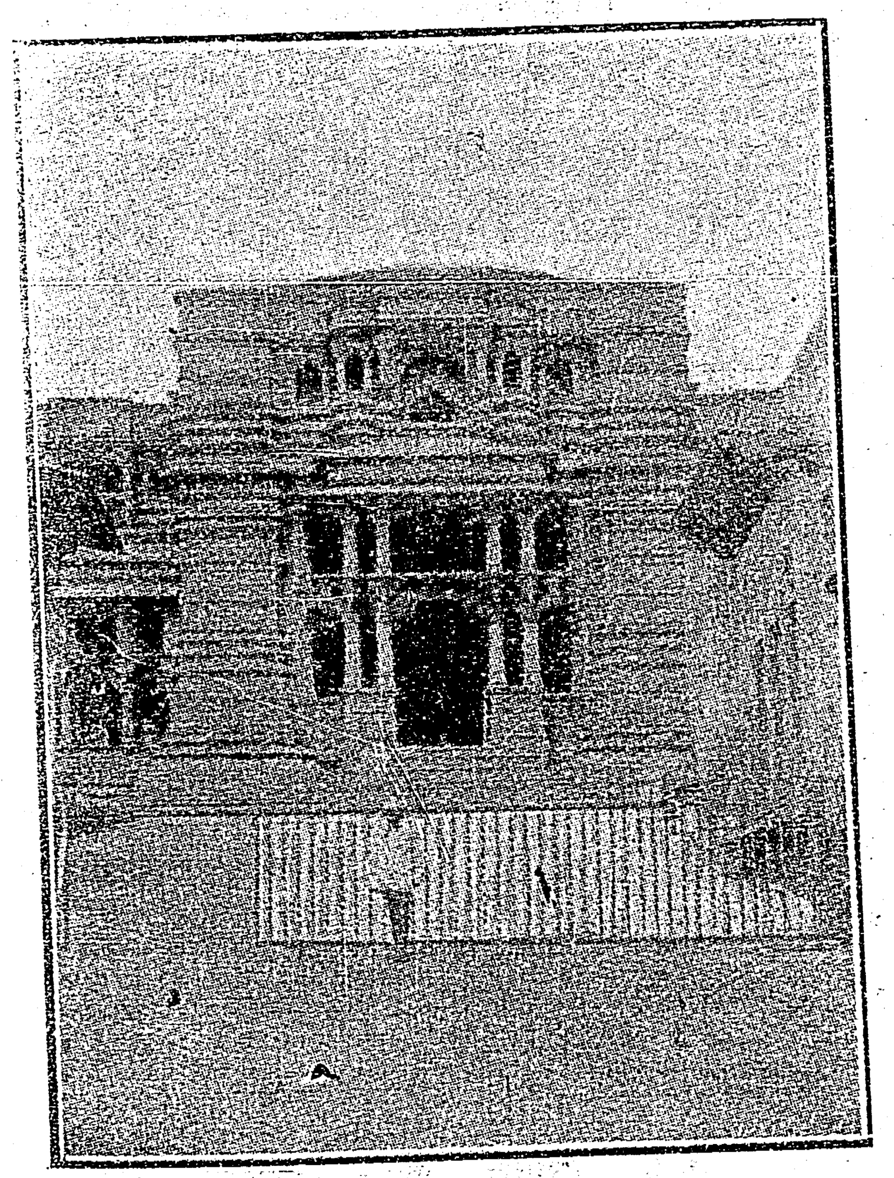

পুরাতন গোবিন্দজীর মন্দির—বৃন্দাবন

মস্ত একটা শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে এই যে, মানুষের আমোদ-আহ্লাদের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সতর্কতা, ব্যস্ততা প্রভৃতি গুণগুলি বিশেষ ক'রে খাপছাড়া হয়ে পড়ে।

যাই হোক্, মোটের ওপর বৃন্দাবনের জল-হাওয়া আমি শান্তিতেই ভোগ করেছিলাম। কাজেই বৃন্দাবনের স্মৃতি আমার মনে উপভোগ্য হিসেবেই বিরাজ করবে।

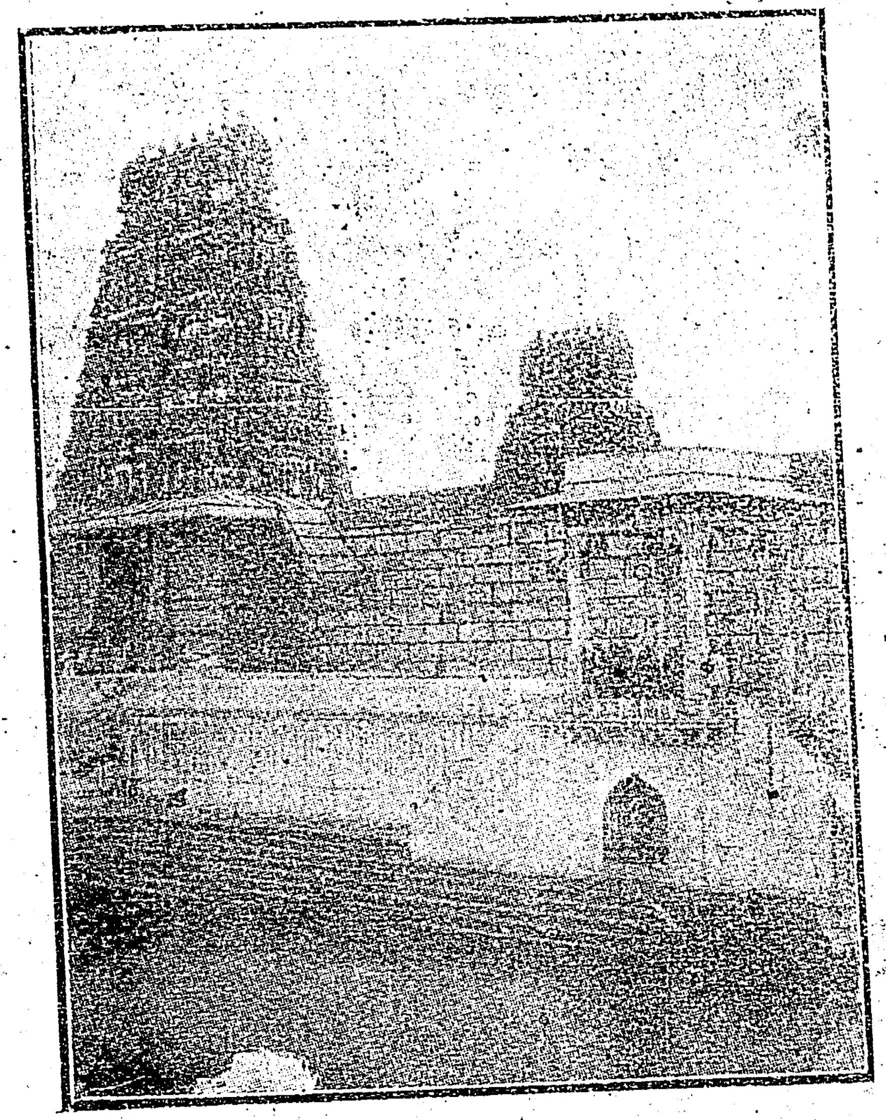

শেঠেদের মন্দির—বৃন্দাবন

মথুরায় শেঠজীর একটি বাগান আছে। যমুনার ঠিক্ উপরেই। বড় মনোরম স্থান। সেখানে একদিন সন্ধ্যার ম্লানিমা-ঘেরা একটি বাঁধানো ঘাটে বসেছিলাম। শরীর মন এক অপূর্ব্ব ক্লান্ত-উদাস-মধুর পরশের প্রলেপে স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।—এমন সময়ে "ব্যাণ্ড"! আওয়াজ ক্রমেই বিবর্দ্ধমান। সর্ব্বনাশ! এমন যমুনার তীর! এমন অস্ফুট চন্দ্রালোকিত ঘাট! এমন বাগান! এমন পৌরাণিক স্মৃতি-বিজড়িত মধুরতা! এখানে সানাই নয়, বাঁশি নয়, বীণা নয়, কীর্ত্তন নয়, বিহগকাকলি নয়, বিরহ-সঙ্গীত নয়—ব্যাণ্ড! শুনলাম কে এক রাজা এসেছেন। এক মুহূর্ত্তে বিস্ময় তিরোহিত হ'ল। রাজাতেই এমন রুচি সম্ভব।

দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন—কোথাও কিন্তু ভাল গান বাজনা শোনা গেল না। আগ্রায় গেলাম; ভাবলাম, সেখানে অন্ততঃ কিছু ভাল গান শোনা যাবে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কোথায় দিল্লী-আগ্রা, আর কোথায় সেখানকার বিখ্যাত গায়ক-গায়িকা! আগ্রায় একজন

বেশ ভাল গাইয়ে ছিলেন ফৈয়াস খাঁ,—কিন্তু তিনি বরোদার গাইকবাড়ের সভা-গায়ক হওয়ার দরুণ আগ্রায় তাঁর দর্শন পাওয়া যায় নি। পরে বরোদায় তাঁর গান শুন্‌বার সুযোগ হয়েছিল। সে কথা যথাস্থানে লেখা যাবে। আগ্রায় আর একজন গায়িকা ছিলেন, তাঁর নাম লড্ডন জান। নামটি ঠিক্ কবিত্বময় না হলেও তিনি শুন্‌লাম সুগায়িকা। কাজেই গান শোন্‌বার জন্য খুবই উৎসুক ছিলাম। আগ্রায় আমার host মহোদয় তাঁর গান শোনাবেনও বল্‌লেন; কিন্তু নানা কারণে সেটা হ'য়ে উঠ্‌ল না।

কাজেই মনো-দুঃখে গোয়ালিয়রে চলে গেলাম। গোয়ালিয়র সঙ্গীতের জন্য এক সময়ে প্রসিদ্ধ ছিল। কলিকাতার কাছে মেটেবুরুজে লক্ষ্ণৌয়ের সিংহাসনচ্যুত নবাব ওয়াজিদ আলি শা'র সভায় ১২১ জন গাইয়ে-বাজিয়ে ছিল। তাদের মধ্যে তাজ খাঁ, আলিবক্স খাঁ প্রভৃতি বিখ্যাত গাইয়েরা গোয়ালিয়রেরই গায়ক ছিলেন। ধ্রুপদে আলি বক্সখাঁর শিষ্য ছিলেন, বিখ্যাত ৺অঘোরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও খেয়ালে তাঁর একমাত্র বাঙালী শিষ্য হচ্ছেন বেয়ালার প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীবামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। এঁর কাছেই আমি গোয়ালিয়রের অপূর্ব্ব সঙ্গীতের চালের পরিচয় পাই। তাঁর কাছে ধ্রুপদে এত সুন্দর গোয়ালিয়রের চালের গমক ও মিড় এবং খেয়ালে এত সুন্দর মিড় ও হলক্ তান শুনেছি যে, গোয়ালিয়রের দিকে একবার তীর্থ-যাত্রা করার সাধ আমার বহুদিন থেকেই ছিল। কিন্তু গোয়ালিয়রে গিয়ে বড় গাইয়ে একজনও শুন্‌তে পেলাম না। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সেখানকার সঙ্গীত-রসিক লোক দু'-একজন আমাদের প্রশান্তভাবে জ্ঞাপন কর্লেন যে, এটা আমাদের অনর্থক বিলম্ব করে জন্মানোর ফল; কারণ, যাঁরা বড় বড় গাইয়ে ছিলেন, তাঁরা বহুদিন হ'ল গতাসু হয়েছেন। কথাটা বোধ হয় সত্য। কারণ, আমাদের বর্ত্তমান সঙ্গীতকে decadent (অধোগামী) বলা যেতে পারে এবং তার প্রধান হেতু এই যে, আজকাল ভাল গায়কেরা আর পৃষ্ঠপোষক পান না ব'লে পেটের দায়ে সঙ্গীত-চর্চ্চা ছেড়ে অন্য কাজে মন দিতে বাধ্য হ'ন। অথচ সুগায়ক হওয়া অনেক দিনের একাগ্র সাধনা বিনা সম্ভব নয়। কাজেই আজকাল ভাল গায়ক খুঁজে পাওয়া বড়ই কঠিন হয়ে উঠেছে। আমি প্রায় সারা ভারত খুঁজে এত কম ভাল গায়কের গান শুনেছি যে, ভাবলে মনটা বিস্ময় ও আক্ষেপে অভিভূত হয়ে না প'ড়েই পারে না। গোয়ালিয়রের মতন বিখ্যাত সঙ্গীতকেন্দ্রেও একজন ভাল গায়ক খুঁজে পেলাম না, এ দুঃখ রাখবার যায়গা কোথায়? হর্দ্দূ খাঁ, তাজ খাঁ, আলিবক্স খাঁ প্রমুখ গায়কের উত্তরাধিকারী আজ গোয়ালিয়রে একজনও নেই, এটা সঙ্গীতানুরাগীদের কাছে যে কত দুঃখের বিষয়, তা সঙ্গীতানুরাগীই জানেন। গোয়ালিয়রে শেষ বড় গায়ক ছিলেন না কি শঙ্কর পণ্ডিত ও বালা গুরু। এঁরা দুজনেই কয়েক বৎসর আগে গায়কলীলা সংবরণ ক'রে গোয়ালিয়রকে শূন্য করে গেছেন। শঙ্কর পণ্ডিতের পুত্র এখন গোয়ালিয়রে একমাত্র গায়ক বল্‌লেও হয়। তাঁর নাম কৃষ্ণ রাও। ইনি পিতার সঙ্গীত-বিদ্যালয়টিকে কোন প্রকারে জিইয়ে রেখেছেন। এঁর গান শোনা আমার হয় নি; কারণ, আমি যখন গোয়ালিয়রে গিয়েছিলাম, তখন তিনি সেখানে ছিলেন না।

সে যাই হোক্, কার কার গান শোনা হ'ল না সে কথা বেশি বাগাড়ম্বর সহকারে না ব'লে কার কার গান শুন্‌লাম, সেই কথা ব'লেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের শেষ করা বোধ হয় শ্রেয়ঃ।

গোয়ালিয়রে সব চেয়ে ভাল গুণী যিনি আছেন, তাঁর নাম হাফেজ আলি খাঁ। ইনি রামপুরের বিখ্যাত বীণকার উজীর খাঁর শিষ্য। উজীর খাঁর দুই শিষ্য বর্ত্তমান সময়ে শ্রেষ্ঠ। আলাউদ্দীন খাঁ ও হাফেজ আলি খাঁ। এঁরা দুজনেই অতি উৎকৃষ্ট বাজান। বৎসর কয়েক আগে কলিকাতায় আলাউদ্দীন্ খাঁর সেতার ও বেহালা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এত সুন্দর সেতার আমি এক ভাওনগরের বিখ্যাত বৃদ্ধ সেতারী রহিম খাঁর ছাড়া আর কারও শুনিনি যাঁর কথা যথাস্থানে লেখা যাবে। হাফেজ আলি খাঁ বোধ হয় সেতার বাজান না। কিন্তু শরদ এত সুন্দর আর আমি শুনি নি। কলিকাতার কেরামৎউল্লা খাঁ ও রামপুরের আমীর খাঁর শরদও আমার এত ভাল লাগেনি। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত পণ্ডিত ভাতখণ্ডেও হাফেজ খাঁর বাজনাকে কেরামৎউল্লা খাঁর ওপরে স্থান দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আমি তাঁর

সঙ্গে একমত। কারণ, কেরামৎউল্লা খাঁ সাহেবের মধ্যে ওস্তাদী অদ্ভুত হ'লেও, তাঁর বাজানোর মধ্যে যাকে বলে "দরদ", সেটা হাফেজ আলি খাঁর মত নেই। হাফেজ আলি খাঁ বাজান মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে—নিজেকে ফুটিয়ে

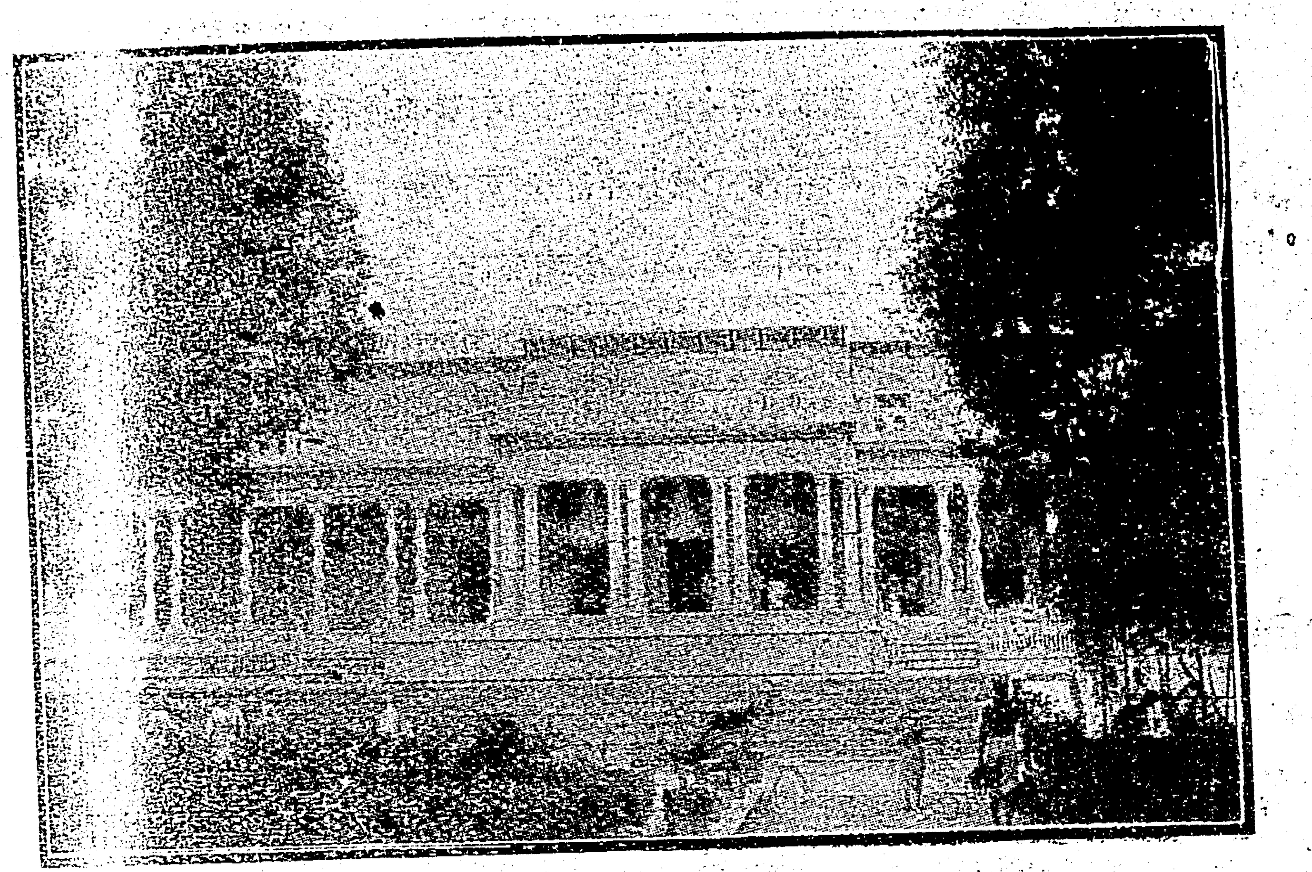

সাজীও মন্দির—বৃন্দাবন

তোলবার জন্য বা শ্রোতাকে স্তম্ভিত করবার জন্য নয়। কি সুন্দর এঁর মিড়ের হাত, আর কি চমৎকার ঝঙ্কারের বাহার! যাঁরা এঁর বাজনা শোনেন নি তাঁদের শোনা উচিত। ইনি মাঝে মাঝে কলিকাতায় এসে প্রসিদ্ধ গায়ক ৺লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের বাড়ীতে থাকেন। কাজেই এঁর বাজনা শোনা তত কঠিনও নয়।

গোয়ালিয়রে আর একজন মারাঠী বাজিয়ের তাউস বাজানো শুনেছিলাম। তাউস—এস্রাজের একটু ভাল সংস্করণ। বেশ লেগেছিল; তবে হাফেজ আলি খাঁও সেদিন বাজিয়েছিলেন। কাজেই তাঁর শরদের পাশে তাউস যেন নিভে গেল। ভাল গুণীর পাশে গান-বাজনা করার এই এক মহা বিপদ আছে।

গোয়ালিয়রে একজন মাত্র ভাল গায়িকার গান শুনেছিলাম। তাঁর নাম মঙ্গু বাই। বয়স ৬০ এর কাছাকাছি। মঙ্গু বাই এখন বাতে পঙ্গু। কিন্তু গান করেন সুন্দর। শুন্‌লাম এমন খেয়াল না কি এ অঞ্চলে খুব কম বাইজীতেই গাইতে পারে। খুব ভাল লেগেছিল, তবে কাশীতে বৃদ্ধা হুশ্‌নার গান যেন আরও ভাল লেগেছিল। হুশ্‌না মিড়ের কাজ বড় সুন্দর করে—যদিও মঙ্গু বাইয়ের গলা ও গলায় তানের কাজ হুশ্‌নার চেয়ে এখনও একটু ভাল অবস্থায় আছে। মঙ্গু বাই দুঃখ করে বল্‌ল, যে ১০।১৫ বছর আগে এলে সে এমন গান শোনাতে পারত যে ইত্যাদি ইত্যাদি। তার জরাজীর্ণ গলার গান শুনে মনে হ'ল কথাটা সে মিছে দম্ভ করে বলেনি।

গোয়ালিয়রে এখন একজন অতি উচ্চ দরের খেয়ালী আছেন। তাঁর নাম নাসির আলি। গোয়ালিয়রের মহারাজার ভাই বলবন্ত সিংহের কাছে থাকেন। বলবন্ত সিংহের সঙ্গে দেখা কর্লাম। অতি ধার্ম্মিক লোক এবং গানবাজনায় রাজারাজড়ার মতনই বোকার মতন কথা বলেন; যথা, এমন গান তিনি শুনেছেন যে, ঘর দুল্‌তে থাকে; কাজেই, যে গানে ঘরই না দুল্‌ল সে কি আর গান! ইত্যাদি ইত্যাদি। সঙ্গীতে এ রকম লম্বা লম্বা অসম্ভব কথা অনেকের কাছেই শোনা যায়। যথা, বনের বাঘ মুগ্ধ হ'য়ে চিত্রার্পিত হ'য়ে শুন্‌বে, তবে ত সে গান! গায়ক যে রাগের ছায়া দেয়ালের উপর ফেল্‌তে না পার্ব্বেন, সে গান ত ছেলেখেলা মাত্র! এ সব কথা লোককে গম্ভীর ভাবে

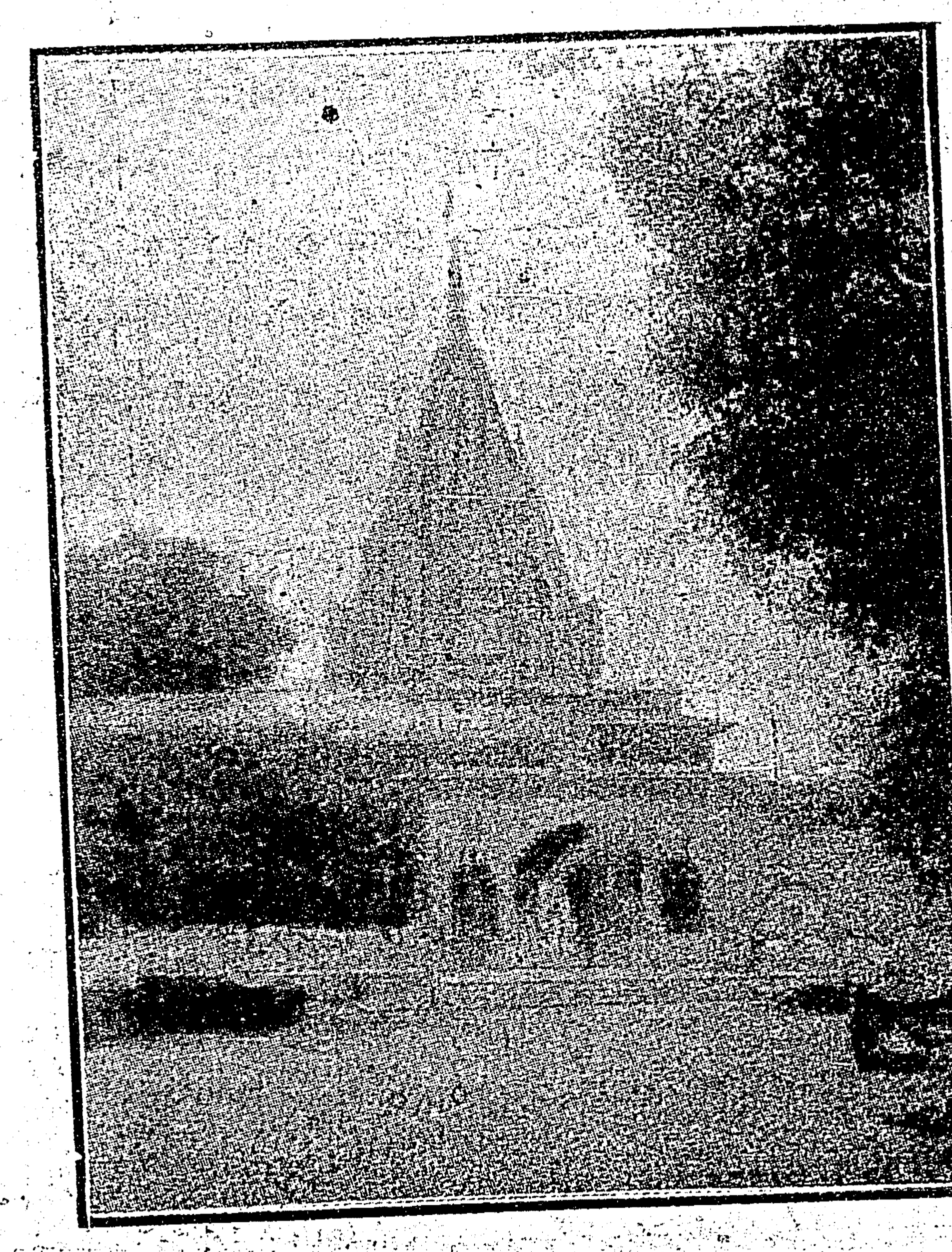

লালাবাবুর কুঞ্জ—বৃন্দাবন

বল্‌তে আমি শুনেছি। আমার পরিচিত একজন বুদ্ধিমান্ ওস্তাদ কোনও বক্তার কাছে এরকম কথা শুনে গম্ভীর ভাবে বলে ফেলেছিলেন যে, যে গান শুনে ছাদের কড়ি বরগা খসে না আসে, সে কি আর গান! এর কারণ আর কিছুই নয়—গান-বাজনা নিয়ে বুদ্ধিমান্ সুস্থমনা লোক আজ অবধি বড় একটা মাথা ঘামান নি, এইমাত্র।

সে যাই হোক্, বলবন্ত সিং অতি আদর করে বসালেন ও বল্‌লেন যে, হাঁ, আজকালকার দিনে গায় বটে এক নাসির আলি। কেবল তার গান শোনার একটু সামান্য মুস্কিল আছে। আমি সাগ্রহে ব'লে উঠ্‌লাম যে, মুস্কিলটা যদি সামান্য হয়, তবে 'সে ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়', যেহেতু আমি ভাল গান শুন্‌তে অনেক অসামান্য মুস্কিলকেও অতিক্রম করেছি। উত্তরে বলবন্ত সিং প্রভু সন্দিগ্ধভাবে শিরঃসঞ্চালন করে বল্লেন, "উঁহুঃ। কেন না—বুঝেছেন কি না—অর্থাৎ—এক কথায় মুস্কিলটা হচ্ছে ঠিক ওইখানে—যে নাসির আলি আর সবেই রাজি কেবল কিছুতেই কাউকে গান শোনায় না।" তখন মনে হল যে, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া যে শুধু অজাযুদ্ধে, ঋষিশ্রাদ্ধে ও দাম্পত্যকলহেই হয়, তাই নয়—রাজারাজড়ার নেকনজরের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে।

আমাদের দেশের গাইয়ে বাজিয়েরা প্রায়ই এই রকম খেয়ালী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে থাকেন, দেখা যায়। পাশ্চাত্যে কিন্তু গুণী গান করে নিজেকে ও অপরকে আনন্দ দেবার জন্য (সঙ্গে সঙ্গে অর্থোপার্জ্জনের জন্যও বটে) ; আমাদের ওস্তাদেরা কিন্তু প্রায়ই শ্রোতার প্রতি একটা গভীর অবজ্ঞা পোষণ করাটাই তাঁদের গান-বাজনা শেখার চরম সার্থকতা ব'লে মনে করে থাকেন। শুনেছি, দ্বারভাঙ্গার মহারাজার ওখানে বিখ্যাত ৺মৌলাবক্সের এক পুত্র সভাগায়ক হিসাবে নিযুক্ত আছেন। তিনি মহারাজার কোনও অতিথিদের গান শোনাতে হ'লে ধীরপদবিক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করেন ; কারুর দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে ঘণ্টা খানেক আলাপ করেন, কোনও তারিফের বড় তোয়াক্কা রাখেন না ও গান শেষ হলে বাক্যব্যয় না করে সোজা প্রস্থান করেন—যেন কাউকেই তিনি শোনাচ্ছিলেন না বা কেউই তাঁর গান বুঝবে এ প্রত্যাশা তিনি রাখেন না। আমাদের দেশের ওস্তাদদের এ দাম্ভিকতার আরও অনেক দৃষ্টান্ত আমি জানি। তবে নিরর্থক সে সব দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধের কলেবর স্ফীত করার কোনও প্রয়োজনীয়তা দেখি না।

গোয়ালিয়রের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম। পাহাড়ের উপর দুর্গটি চমৎকার স্থানে নির্ম্মিত। সেখান থেকে সহরটি অতি সুন্দর দেখায়। দেখ্‌বার মত মন্দির প্রভৃতিও বড় কম নেই। মান-মন্দির, সহস্রবাহু-মন্দির প্রভৃতি নানান স্থাপত্য-কীর্ত্তি আছে। মন্দিরগুলির কাজ কিন্তু বড়ই "জবড়জং"। সরলতার দিকে শিল্পের যে একটা স্বাধীন প্রবণতা আছে, তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার কর্লে সে শিল্প যে আমাদের নয়ন-মনকে কতটা ক্লান্ত করে দিতে পারে, সে প্রমাণ এখানকার মন্দিরগুলির অসংখ্য কারুকার্য্য দেখ্‌লে এক মুহূর্ত্তেই পাওয়া যায়।

গোয়ালিয়রে আমার খুব ভাল লেগেছিল—ভাতখণ্ডে মহোদয়ের স্কুল। এ স্কুলের কথা আমি পূর্ব্বে লিখেছি। ভাতখণ্ডে মহাশয় একা চেষ্টা করে এই স্কুলের স্থাপনা করেন। এখন তিনি মাঝে মাঝে এ স্কুল পরিদর্শন কর্ত্তে আসেন। স্কুলের অধ্যাপকগণ আমাকে তাঁদের ছাত্রদের গান শোনালেন। পাঁচ বৎসরের পাঠ সাঙ্গ কর্লে স্কুলের শিক্ষা সমাপন হয়। বম্বেতে ভাতখণ্ডে মহাশয় আমাকে বলেছিলেন "আমার স্কুলের উদ্দেশ্য—ছাত্রদের পাঁচ বৎসরে সঙ্গীতবিশারদ করে ছেড়ে দেওয়া নয়। সেটা আজীবনের সাধনার জিনিষ। যেমন কলেজের পড়ায় মানুষকে জ্ঞানী করে ছেড়ে দেওয়া যায় না। সঙ্গীত-স্কুলের উদ্দেশ্য ছাত্রদের মনে উচ্চ সঙ্গীতের রস ঢুকিয়ে দেওয়া মাত্র—যাতে পরে তারা স্বচেষ্টা ও সুবিধে মত আরও শিখ্‌তে পারে। স্কুলের শিক্ষা তাদের কেবল ভাল ও মন্দ সঙ্গীতের প্রভেদ বোঝাবার পক্ষে সহায়ক হতে পারে এই মাত্র।" কথাগুলি খুব ঠিক্। তবে ভাতখণ্ডে মহোদয়ের এ স্কুলের অনেকগুলি ছোট ছেলের মুখে যে সব গান শুন্‌লাম, তা বাস্তবিকই অদ্ভুত। তান লয় বিস্তারে তাদের গান আশ্চর্য্য রকম সমৃদ্ধ। পাঁচ বৎসরের শেষে না কি প্রত্যেক ছাত্রই ধ্রুপদ ছাড়া ৩০০।৪০০ খেয়াল বিশুদ্ধ ভাবে গাইতে পারে। তা ছাড়া তারা গান শোন্‌বামাত্র স্বরলিপি করে নিতে পারে। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে ভাতখণ্ডের অক্লান্ত সাধনা সার্থক হয়েছে বল্‌তে হবে। প্রথম-বার্ষিকী যে দুটি ছাত্র আমার কাছে

গাইল, তাদের বয়স হবে ৭।৮ বৎসর। দ্বিতীয়-বার্ষিকী ছাত্র সেদিন ছিল না। তৃতীয়-বার্ষিকী ছাত্র দুটির বয়স হবে ১০।১১ বৎসর। চতুর্থ-বার্ষিকীর ১৩।১৪ ও পঞ্চম-বার্ষিকীর ১৬।১৭ বৎসর। এর মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম-বার্ষিকী ছেলেদের গান আমার খুব ভাল লাগ্‌ল। কেবল শিক্ষকদের দোষ দেখ্‌লাম এই যে, তাঁরা ছাত্রদের বড় বেশি চড়া গলায় গাইতে বাধ্য করে থাকেন। এতে বালক-সুলভ মধুর কণ্ঠে মিষ্টত্বের একটু হানি হয় ; ও তা ছাড়া, এটা তরুণ কণ্ঠপেশীর পক্ষে বিপদ্‌জনকও বটে। এ কথা আমি তাঁদের বলে এসেছিলাম ও Visitor's book এ লিখেও এসেছিলাম।

গোয়ালিয়রের এ স্কুলটিতে শুন্‌লাম ২০০।৩০০ ছেলে গান শেখে। তা ছাড়া আরও দু তিনটি স্কুল আছে। গোয়ালিয়রের মতন ছোট সহরে বালকদের জন্য এতগুলি স্কুল আর আমাদের বাংলা দেশের রাজধানী কলিকাতায়

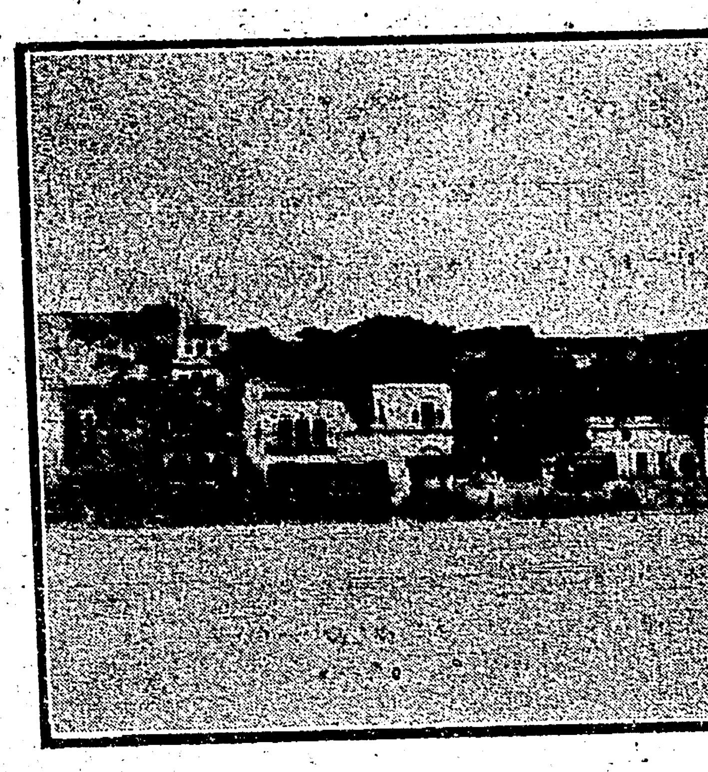

যমুনাতীর—মথুরা

ছেলেদের জন্য একটিও উল্লেখযোগ্য স্কুল নেই, এ কথা ভাবলে মনে দুঃখ না হয়েই পারে না। কারণ, এটা কি আক্ষেপের কথা নয় যে, উচ্চ সঙ্গীতের অধ্যাপনা-উৎসাহে আমাদের শিক্ষা-গর্ব্বিত বাংলা দেশ আজ এত পেছিয়ে পড়ে আছে? অবশ্য গোয়ালিয়রের স্কুলগুলি মহারাজা সিন্ধিয়ার অর্থ-সাহায্যেই চলে। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে কি এমন দু'চার জন বড়লোক নেই, যাঁদের চাঁদায় কল্‌কাতায় অন্ততঃ দু তিনটা স্কুলও ভাল চল্‌তে পারে? আসল কথা টাকা নয়, আসল কথা সঙ্গীতে আন্তরিক অনুরাগের অভাব। তবে culture এর গর্ব্বে গর্ব্বিত বাঙালী জাতির মধ্যে এ অনুরাগ মারাঠাদের চেয়ে যে অনেক কম, এ কথাটা প্রণিধান-যোগ্য। কথা উঠ্‌তে পারে যে, আমাদের বাংলা দেশে সঙ্গীতে অনুরাগের অভাব নেই, অভাব উদ্‌যোক্তার। তার উত্তর এই যে, সব গুণের ন্যায় অনুরাগের গভীরতারও কমবেশি আছে। আমাদের দেশে উচ্চ সঙ্গীতে অনুরাগ মহারাষ্ট্র দেশের চেয়ে কম। একটা জাতির শ্রেষ্ঠ মন বা মানুষ তাঁর নিজের জীবনে স্বজাতির বিশিষ্টতাটিকে উজ্জ্বল ভাবে বিকাশ করে চোখের সাম্‌নে ধরেন এই মাত্র। তার একটা প্রমাণ এই যে, উচ্চসঙ্গীতপ্রিয় মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যেই ভাতখণ্ডের মতন নিঃস্বার্থ সাধক ও উদ্‌যোক্তা জন্ম-গ্রহণ করে থাকেন—আমাদের বাঙালীর মধ্যে জন্মান না।

গোয়ালিয়র থেকে ঝাঁসি যাওয়া গেল। ঝাঁসিতে বীরনারী লক্ষ্মীবাইয়ের দুর্গপ্রাকার দেখ্‌লে মনটা কেমন একটা অপূর্ব্ব সম্ভ্রম ও আবেগে ভ'রে ওঠে। "ঝাঁসি কভি নহি দুঙ্গি" এমন কথা সে হীন যুগেও যে একজন

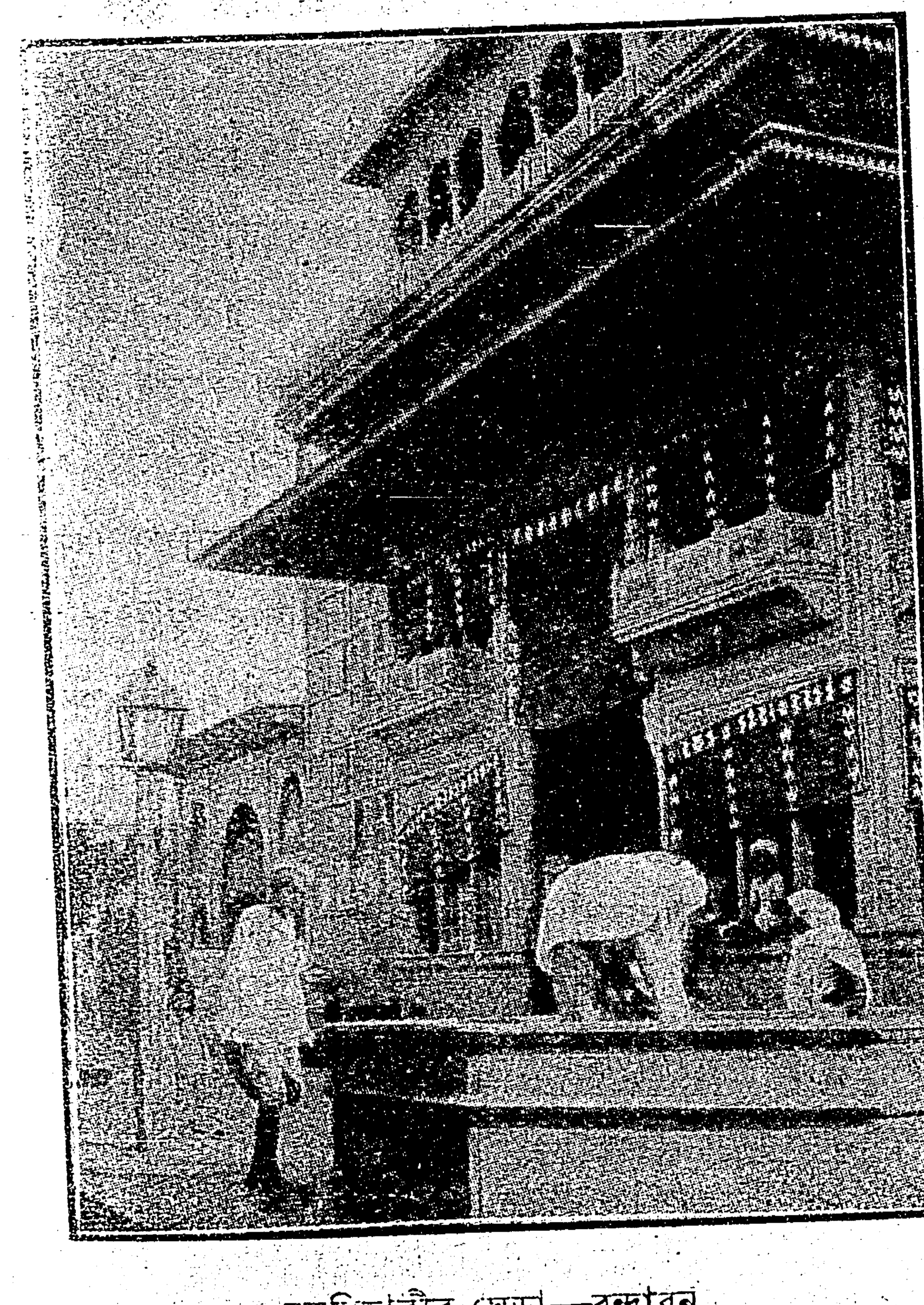

বঙ্কুবিহারীর ঘেড়া—বৃন্দাবন

নারীর মুখ হ'তে বাহির হয়েছিল, এই চিন্তাটাই একটা গর্ব্বের বিষয়। মনে হয়, যাই হোক্, একজন ভারতীয় রমণীই এ রকম তেজোগর্ভ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন ও প্রাণ দিয়ে নিজের কথার মর্য্যাদা রক্ষা করেছিলেন। লক্ষ্মীবাইয়ের প্রাসাদও বাইরে থেকে দেখা গেল। দুঃখ হ'ল এই মনে করে যে, দেশভক্ত স্বাধীন ইংরাজ জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেওয়াকে মনে মনে সম্মান কর্ত্তে বাধ্য হ'লেও, স্বার্থ এমনই জিনিষ যে, বাইরে সে তারিফের কোনও প্রকাশ কর্ত্তে একান্তই অনিচ্ছুক। নইলে কলিকাতার অন্ধকূপ ও কাণপুরের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি রক্ষা কর্ত্তে তাদের সতর্কতার অন্ত না থাক্‌লেও, লক্ষ্মী-বাইয়ের মত মহাপ্রাণের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি অঙ্গুলী উত্তোলন করাও তারা দরকার মনে করে না।

ঝাঁসিতে এক গানের আসর হ'য়েছিল। সেখানে এক-জন শ্রমজীবীর ১৭।১৮ বৎসরের একটি ছেলের মুখে খাম্বাজ বেহাগ প্রভৃতি রাগ রাগিনী এত মধুর ভাবে গীত হ'তে শুনেছিলাম, যে, মনে দুঃখ হ'য়েছিল যে, গানে এমন স্বাভাবিক ক্ষমতা কত সময়েই না শুধু শিক্ষা ও সুযোগ অভাবে ফুটে উঠ্‌তে পারে না! য়ূরোপে ললিতকলায় এ রকম অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা অনেক সময়ে পুরস্কৃত হ'তে দেখা যায়, যাতে তার বিকাশ সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের দেশে এজন্য অনুভব করে এমন লোকমত নেই বল্‌লেই হয়।

সেদিন ঝাঁসির গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা একটি ভিখারিণীকে ডাকিয়ে এনে আমাকে তার গান শুনিয়ে-ছিলেন। সে "নাহি পরত চৈন" বলে একটি পিলুবারোয়াঁ এমন মধুর তান সহকারে গাইল যে, আমি প্রথমটায় বিশ্বাসই কর্ত্তে পারি নি যে, একজন ভিখারিণী এমন সুন্দর তানলয়ের সঙ্গে গাইতে পারে। গান ভাল করে শিখ্‌তে পেলে সে নিশ্চয়ই একজন সুগায়িকা রূপে পরিণতি লাভ কর্ত্তে পার্ত্ত। মনে হ'ল, ললিতকলায় এমন কত talentই না আমাদের দেশে উৎসাহ অভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়! তবে জগতে ট্রাজিডি এত বেশি যে, শিল্পকলার দিক্ দিয়ে এ শক্তি-অপচয়ের জন্য আন্তরিক দুঃখ বোধ করাও বোধ হয় অনেক সময়ে আমাদের পক্ষে একটু কঠিন হ'য়ে ওঠে। কেন না, এ সহানুভূতি প্রকাশ কর্ব্বার আগেই আমাদের ক্ষুব্ধ মন বাধা দিয়ে বলে ওঠে যে, মানুষের অনাহার, দারিদ্র্য, রোগশোক প্রভৃতি শত শত গভীরতর দুঃখেরই ত আগে একটা স্থায়ী সমাধান করা যাক্—তার পর না হয় এ সব আর্টের বিকাশ-রূপ বিলাস-সমস্যার সমাধানে মনোনিবেশ করা যাবে। মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ বাস্তবিকই বড় দুঃখ, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই; সুতরাং, এ দুঃখ-মোচনের চেষ্টাকেও ছোট করে দেখা চলে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও মনে উদয় হয় যে, এজন্য জীবন-বিধাতার দানকে (অর্থাৎ শিল্পে প্রতিভা রূপ দানকে) এভাবে অমর্য্যাদা করাটা কি বাস্তবিকই সত্য, বা এ সব দুঃখ-কষ্ট মোচনের পক্ষেই অনুকূল? একটু ভেবে দেখ্‌তে গেলেই এ সম্বন্ধে ঘোর সংশয় জন্মায়। কারণ মানুষের ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখ্‌তে পাই যে, দুঃখ-কষ্ট মানুষ সুদূর আদিমকাল থেকে ভোগ করে এসেছে এবং এখনও অন্ততঃ বহুদিন ধ'রে করবে। তাই "এসব দুঃখ-কষ্ট মোচনের দাবীদাওয়াকে গ্রাহ্য করা সম্পূর্ণ শেষ হ'লে তবে ত শিল্পকলার দাবী!"—এ রকম কথাটাকে সত্য বলে মনে না করার কারণ আছে। কারণ, এ রকম সঙ্কল্প নিয়ে জীবনযাত্রার পথে অগ্রসর হ'লে, তার দরুণ বাস্তব জীবনের দুঃখ-কষ্টের বিশেষ লাঘব হবে বলে মনে হয় না; হ'তে পারে কেবল—যুগযুগব্যাপী সাধনার ফলে মানুষ অনেক অশ্রু ব্যথা দিয়ে যে দুচারটি সৌন্দর্য্যের মন্দির সৃষ্টি করেছে, তার চিহ্নও মুছে দেওয়া। কেন না, সংসারে অদৃষ্টের পরিহাস ও পদে পদে দুঃখ-দৈন্যকে জয় করে শিল্পে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কর্ত্তে সময় ও সাধনা লাগে—অজস্র; কিন্তু যুগার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যের ধ্বংস সাধন কর্ত্তে মুহূর্ত্তের বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না।

আমাদের সম্বন্ধে

শ্রীমনোরমা দেবী

কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী বাল্যবিবাহ ও অকাল মৃত্যু সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন, আমার বোধ হয় তাহার অর্থ, অর্থাৎ ভালর দিকটা, কেহই বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা করে দেখেন নাই; কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ করতে অনেকেই অগ্রসর হয়েছেন। আমি, অতি ক্ষুদ্র, মূর্খ ও সাধারণ পল্লীবাসিনী হইয়াও যে তাঁহারি সুরে সুর মিশায়ে আমাদের সম্বন্ধে দুটি কথা বল্‌তে বসেছি, সে কেবল শ্রদ্ধেয়া মহাশয়ার লেখনীতে আমার প্রাণের কথাগুলিই বেরিয়েছে বলে।

যাক্, আসল কথা এই যে, বালিকা বধূ না এসে বয়স্কা বধূ এসে যে শ্বাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া কোরবে বা আত্মীয়-স্বজন, বা, ননন্দার ভাত মার্‌বে, এ কথা তিনি বলেন নাই; তাঁর লেখার অর্থ—বালিকা-বধূর উপরে শ্বাশুড়ীর যে একটা অপত্যস্নেহ সঞ্জাত হতো, বয়স্কা বধূদের উপর তা হয় না। এটা বধূ বালিকা নয় বলে যে, তা নয়। এর কারণ হচ্চে, একটি ছোট্ট মেয়ে বাপ-মা'র স্নেহের কোল ছেড়ে ভীত সঙ্কুচিত ভাবে শ্বাশুড়ীর পাশে এসে দাঁড়াত, শ্বাশুড়ীও তাঁর মাতৃস্নেহের অনেকখানি ঢেলে দিয়ে তার আবাল্যের পরিচিত পিতৃ-গৃহ হতে বিচ্যুত হবার ব্যথাটুকু দূর কোর্‌তে চেষ্টা কর্‌তেন। নিজে হাতে কোরে বধূর নাওয়া-খাওয়া, সাজ-সজ্জা যতকিছু সব করে দিতেন, নিজে সঙ্গে করে ধীরে ধীরে ছোটখাট গৃহ-কাজগুলি করাতেন; আবার পুতুল বা নানাপ্রকার খেলার সামগ্রী দিয়ে খেলতেও দিতেন। ফলে এই হতো যে, বধূ একদিকে যেমন শ্বাশুড়ীর স্নেহ-যত্নে তাঁর বাধ্য, অনুগত হয়ে পড়তো, অন্যদিকে ক্রমে ক্রমে সংসারের চাল-চলন আদব-কায়দায় এমন অভ্যস্তা হতো, যাতে কালে বধূ সুগৃহিণী হবে বলে শ্বাশুড়ী গর্ব্ব অনুভব কোরতেন। এতে শ্বাশুড়ীরও সুখ ছিল, বধূদেরও সুখ ছিল।

শ্বাশুড়ী আর বধূ, এ ভাবটা ক্রমে তিরোহিত হয়ে, মাতা ও কন্যার যে ভাব, সেইটে স্থায়ী হয়ে যেত। কালে এমনি হতো যে, গৃহিণী হয়েও বধূরা শ্বাশুড়ীকে না বলে, না জানিয়ে, একটা তুচ্ছ কাজ করতেও অগ্রসর হতো না।

এখনকার বয়স্কা বধূ এসে শ্বাশুড়ীর অনেক কাজ কমে গিয়েছে। বধূদের নাইয়ে খাইয়ে দেওয়া হতে আরম্ভ কোরে চুল বাঁধা আল্‌তা পরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি অনেক কাজ হোতে তাঁরা রেহাই পেয়েছেন। ফলে এই দাঁড়িয়েছে

যে, শ্বাশুড়ীর সে উদ্দাম স্নেহ পুত্র-কন্যা ছেড়ে তেমন কোরে বধূর উপরে সঞ্জাত হয় না, আবার বধূরাও তেমন কোরে সর্ব্ব বিষয়ে শ্বাশুড়ীর উপরেই নির্ভর করতে পারে না ; শ্বাশুড়ী আর বধূ এ ভাবটাই থেকে যায়। যেন কেমন একটা পর-পর, দূরত্ব-সূচক প্রাচীর মাঝখানে তোলা থাকে, যা ভেঙ্গে ফেলে উভয়কে একত্র করবার মত মনের অবস্থা কারুই হয় না।

হয় ত শ্বাশুড়ী যে কাজ, যে চালচলন পছন্দ না করেন, সেটা তাঁর অপ্রিয় বলে বধূরা সংশোধন করতে চেষ্টা করে না। তারা ভাবে, কি আপদ! সর্ব্বদা এত খুঁটিনাটি নিয়ে কথা কহিলে কার সহ্য হয়? এগুলি মন্দ কিসে, যে, ওঁর মনের-মতন হয় না? শ্বাশুড়ী ভাবেন, আমি যা বলি, তা ভালর জন্যই বলি, কিন্তু ধেড়ে মেয়ে বাপের বাড়ীতে শিক্ষা তো পায়নিই—শিখালেও শিখবে না, মোটে কথাই গ্রাহ্য করে না। আজই আমার কথা শোনে না, আর দিন তো পড়েই আছে, এ বউ নিয়ে সংসারের সুখ আর আমার হবে না।

বধূ ভাবেন, আমার কাজ-কর্ম্ম চাল-চলন ওঁর পছন্দ না হলে উপায় কি! যাকৃগে, দুদিন পরে স্বামীর চাকুরি-স্থানে থাকবো, ঝি চাকরের উপর হুকুম চালাব। যে দুদিন আছি, আমার কাজ করা নিয়ে কথা, কোরে যাই,—ওঁদের পছন্দে অপছন্দে আমার কি। এইটুকুই হচ্চে শ্বাশুড়ী ও বধূর মনান্তরের মূল সূত্র। কিন্তু বালিকা বধূদের সময় এরকমটি ঘট্তো না। শ্বাশুড়ী দেখতেন, মার কোল ছেড়ে পুতুলখেলা ফেলে সবেমাত্র শ্বশুরঘরে এসেছে, এ কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না, একে সর্ব্ব বিষয়ে সুশিক্ষা দেওয়া আমারই কর্ত্তব্য। সুতরাং স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের চাইতেও শ্বাশুড়ী বধূদের সর্ব্ববিধ সুশিক্ষার জন্য অনেক অধিক পরিশ্রম করতেন। ফলে কর্ত্তব্যপরায়ণা সুগৃহিণীর অভাব ছিল না, সংসারও অশান্তির আগুনে দগ্ধ হতো না।

তাছাড়া, সমবয়স্ক দেবর-ননদগুলির সহিত বাল্য হোতে খেলা-ধূলায় আহারে-বিহারে মেশামিশিতে যে একটা ভাব জন্মাত, তাকে সখীত্ব ও বন্ধুত্ব বলা যায়। এখনকার দিনের বাল্যবিবাহের পরিবর্ত্তে যুবতী-বিবাহ আরম্ভ হওয়ায়, দেবর-ননদদের সঙ্গে সে মিষ্ট ভাবটুকুরও পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এমন কি পাড়া-প্রতিবাসিনী সমবয়স্কা বা ছোট বড় সবারই উপর যে একটা স্নেহ মমতার আকর্ষণ এসে পড়তো, আজ সেখানেও একটা অনাত্মীয়তার গভীর সূচনাই হচ্চে। এগুলিতে যে সুফল ফল্ছে, এ কথা হয় তো অনেকেই অস্বীকার করবেন। একটা কথা আছে 'কাঁচায় নয়না বাঁশ, পাকলে করে টাঁস্ টাঁস্।' কাঁচা বাঁশকে বাঁকান যায় যেমন সহজে, পাকা বাঁশকে তেমন সহজে কিছুতেই বাঁকান যায় না। ছোট থেকে পোষ মানালে বাঘের বাচ্চাও পোষ মানে, কিন্তু বুড়ধাড়ি মানুষের চিত্ত আয়ত্ত করা অসম্ভবই হয়।

এই জন্যই সংসারে সুগৃহিণীর অভাব এত পরিলক্ষিত হয়। একে পাশ্চাত্য শিক্ষার আবহাওয়ায় পড়ে মেয়েদের অনেকেই হয়েছে মেমসাহেবা, এরা স্কুল কলেজে যে সব শিক্ষয়িত্রীদের কাছে শিক্ষা পায়, তাঁরা বেশীর ভাগ শিক্ষাই দিয়ে থাকেন পরন-পরিচ্ছদ ও বিলাস ভোগের সম্বন্ধে। ফলে এই হয়েচে, মেয়েদের বিলাসিতা এতই চরমে উঠেছে যে, পরে ১০০ টাকার কেরানীজীবী স্বামী বেচারা স্ত্রীর শরীর সংস্কারের জন্যই মাসে খরচ করেন ৩০ খানি সাবান। কেশ প্রসাধনের জন্য ৩ শিশি কেশতৈল, পায়ে দেবার জন্য ২ শিশি আল্তা, আর এ ছাড়া এসেন্স্ ও হেজ্‌লিং প্রভৃতি তো আছেই। তাছাড়া, স্বাধীনতা অর্থে এরা বোঝে একা এক গৃহের গৃহিণী হওয়া, ঝি চাকরের উপর কর্ত্তৃত্ব করা। এরা ভুলে গেছে, অথবা জানেই না যে, নারীর কর্ম্ম গৃহধর্ম্ম পালন করা,—আত্মস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা, এবং সামাজিক অনুষ্ঠানাদির উপর একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা।

বালিকা-বধূ আসিয়া এ সকল শিক্ষা শ্বাশুড়ীর কাছে পেয়ে থাকে; কিন্তু পূর্ণযৌবনা শিক্ষিতা বধূর শুভাগমনে শ্বাশুড়ীও শিক্ষা দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, এবং বধূরাও এসব শিক্ষা নিতান্ত সেকেলে বলে শুধু উড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, এসব প্রথার কুৎসাও অনেকে কোরে থাকে। মোটের উপর সমাজ সংস্কারকগণ বাল্যবিবাহ প্রথা রহিত কোরে পারিবারিক সুশৃঙ্খলা ও সুখ সমৃদ্ধিরই মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিচ্চেন। আবার এর উপরেও যদি নারীর শিক্ষা, নারীর মত না থেকে পুরুষদের মত হয়, নারীর স্বাধীনতা পুরুষদের সমকক্ষ হয়, তাহলে বলতে হবে সেটুকু সংসারের

ও সমাজের মঙ্গলার্থ নয়; বরং সংসার-সুখ ও সমাজবন্ধন শিথিল করবারই উপাদান-সমষ্টি।

কারণ, একেই তো উচ্চ ইংরাজি শিক্ষার আদর্শে শিক্ষিতা ধনী বিলাসিনী সৌখিনা নারীদের দেখাদেখি সামান্য লেখাপড়া-জানা গরীব মেয়েরাও বাসন মাজিতে, ঘর নিকাইতে, জল তুলিতে, রান্না করিতে রাজি নয়। এর পরও যদি ঐ রকম উচ্চশিক্ষাই সর্ব্বসাধারণ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহলে দেখ্‌তে পাচ্চি, একটা বিপর্য্যয় ঘট্‌বেই ঘট্‌বে।

এই সকল আশঙ্কা কোরেই শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী অনুরূপা দেবী বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী হয়েছেন। নতুবা তিনি এ কথা বলেন নাই যে, আমরা চিরদিন পুরুষদের দাসী; সুতরাং আজীবন সেই দাসীত্ব কোরেই কাল কাটাব! বরং তিনি বলেছেন, আমাদের স্থান পুরুষদের নিম্নে তো নয়ই, বরং অনেক উচ্চে। কিন্তু আমরা বুদ্ধির দোষেই হোক, অথবা ভাগ্য-দোষেই হোক, নিজ স্থান হতে বিচ্যুত হয়েছি, কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের মতই ঘুরে মরছি,—এ দোষে পুরুষদের দোষী করলেই বা চল্‌বে কেন?

আর এই অন্দরে আমাদের স্থান বলেই যে আমরা অবরোধে আছি, বা এই অবরোধেই যে থাকা প্রয়োজন, এ কথা ও শ্রদ্ধেয়া মহাশয়া লেখেন নাই। তাঁর কথার অর্থ—নর ও নারী-সৃষ্টিও যে দেবতার কাজ, বিশ্ব-সংসারের কল্যাণের জন্য, লোক-সমাজের সুশৃঙ্খলার জন্য, স্ত্রী ও পুরুষদের অধিকার ও উপাদানও কার্য্যানুযায়ী, সেই ভগবদ্-দত্ত ধন। যদি কেহ বিধাতৃ-দত্ত এই অধিকার ও উপাদানের ব্যতিক্রম করিতে প্রয়াসী হন, তিনি যে শুধু মর্য্যাদারই অবহেলা করিবেন, তা নয়; ফলে আনিবেন সংসারে ও সমাজে স্বেচ্ছাচারিতা।

সীতা, সাবিত্রী, শর্ম্মিষ্ঠা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, রুক্মিণী প্রভৃতি পৌরাণিক নারীগণ অথবা ঐতিহাসিক পদ্মিনী, রুক্মাবাই, চাঁদবিবি, লক্ষ্মীবাই কেহই সংসারের অন্তঃভাগ ছেড়ে বিনা প্রয়োজনে বহির্ভাগে পুরুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন নাই—যতদিন না প্রয়োজন হয়েছে তাঁর। বেশ জান্‌তেন, নারীর একাধিপত্য বাহিরে নয়—ভিতরেও নারীর কর্ম্ম—গৃহকার্য্য; নারীর ধর্ম্ম—পতিপুত্রের সেবা ও পরিবারের সুখ-শান্তিবিধান করা। গৃহের একমাত্র অধিশ্বরী বা সম্রাজ্ঞীই হচ্চেন নারী; এবং এই সংসাররূপ বিরাট রাজ্যশাসনের একমাত্র বিদ্যা—কর্ম্মকুশলতা, কার্য্যে নিপুণতা।

এই রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় কোরতে হলে অস্ত্র চাই—প্রেম, প্রীতি, দৃঢ়তা ও একাগ্রতা। এ সংসার-যুদ্ধেও ক্ষত-বিক্ষত হোতে হয়। সেইজন্য যত্নের সঙ্গে অঙ্গে পর্‌তে হয়—নিঃস্বার্থপরতার বর্ম্ম। এ ইংরাজি সাহিত্য বা পাশ্চাত্য বিলাস-সম্ভোগের দিব্য শিক্ষার কাজ নয়। এতে চাই সংযম ও নিয়ম বা নীতি।

গত পৌষ মাসের 'ভারতবর্ষে' ভগিনী সফিয়া খাতুন যে প্রবন্ধটি লিখেছেন, তাহাও অমূল্য ও সারবান। তিনি ভিন্ন সমাজের মেয়ে হয়েও যে হিন্দুসমাজের সকল সংবাদ রাখেন, এবং হিন্দু বিধবাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী অবগত আছেন, এটি তাঁর পক্ষে গৌরবের কথা। কিন্তু আমরা এতই হেয়, আমরা এতই অপরিণামদর্শী, যে, আমাদের কথা নিয়ে, আমাদের সামাজিক ব্যবহার নিয়ে, আমাদের ব্যক্তিগত ব্যবহার নিয়ে অন্যে আলোচনা করে, দোষগুণ বিচার করে; আমরা কিন্তু দেখেও দেখি না, শুনেও শুনি না; অজ্ঞ উদাসীনের মত আমরা এমন ভাব দেখাই, যেন কিছুই জানি না। অজ্ঞ লোকে আমাদিগকে শত শত ধিক্কার দিচ্চে, তবু আমাদের ঘৃণা জন্মে না, ত্যাগ আসে না। আমরা এতদূর অধঃপতনের পিচ্ছিল পথে নেমে গিয়েছি যে, আর উঠ্‌বার উপায় রাখি নাই।

এটার কারণ একমাত্র স্বার্থসিদ্ধি ও শিথিলতা। ভগিনী খাতুন মহাশয়া যে লিখেছেন, গ্রাজুয়েট জামাইয়ের দল দীন দরিদ্র শ্বশুরের ভিটে-মাটী উচ্ছন্ন দিয়াও নিরস্ত হয় না, অবশেষে নিরপরাধা পত্নীকেও অকুণ্ঠিত চিত্তে ত্যাগের ভয় দেখিয়ে জব্দ করে থাকে। তারও মূলে শুধু পুরুষরা দায়ী নহেন, আমরা নারীরাই প্রকৃত দোষী।

এক দিন আমরাও বধূবেশেই সংসারে প্রবেশ করেছি। আমরা তো জানি, আমাদের বিয়ে দিতে বসে, আমাদের বাপ-মা কি রকম নাকালটা হয়েছিলেন। কিন্তু আজ আমরা ছেলের মা হয়ে সে সব কথা ভুলে গেছি। আমরাই যে অনেক সময় টাকার জন্য বধূর পিতাকে লাঞ্ছিত করি, এবং টাকা নেবার জন্য স্বামি-পুত্রকে উৎসাহিত করে থাকি ও দান-সামগ্রী অলঙ্কারাদির জন্য দীর্ঘ ফর্দ্দ দিয়ে থাকি, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তখন আমাদের

মনে হয় না, ফর্দ্দের অনুযায়ী দেবার ক্ষমতা মেয়ের বাপের আছে কি না।

আমাদের বিশ্বাস, আমরা যদি প্রতিজ্ঞা করি, ছেলের বিয়ের সময় দীন-দরিদ্র মেয়ের বাপের উপর টাকার জন্য উৎপীড়ন হতে দেব না, তা হলে ক্রমে এ প্রথা দেশ হতে উঠে যাবে।

ভগিনী খাতুন মহোদয়ার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—চরিত্রহীন স্বামীর অনাদৃতা পত্নী ও পল্লীর লাঞ্ছিতা বিধবা। এ বিষয়েও আমার মতে, সব দোষ আমাদের। পুরুষদের কি—তারা দেখছে, নারী দুর্ব্বল, নারী ভয়াতুরা। একে জব্দ করবার জন্য অধিক আয়াস স্বীকার করতে হয় না। তজ্জন্যই নানা রকমে তারা আমাদের লাঞ্ছনা করছে। কিন্তু আমরাও তো মানুষ, আমাদেরও রক্তমাংসের শরীর, আমাদেরও 'মন' বলে একটা জিনিস্ আছে, সুখ দুঃখ উত্তেজনা অবসাদ আছে।

আমরা কেন নির্ব্বিবাদে মদ্যপ চরিত্রহীন স্বামীর অনাদৃতা হয়েও বশ্যতা স্বীকার করি? কেন, স্বামী না হলে কি স্ত্রীলোকের চলে না? আর সেই স্বামী যদি একেবারে ত্যাগই করেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু দীন বাপের স্কন্ধে ভর না করে, ময়দা পিষে, কলাই ভেঙ্গে, ধান ভেনে, অথবা ভাল লেখাপড়া জানা থাকিলে মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হয়ে, বা দূরদেশে পরের বাড়ী জল তুলে দিয়ে, রান্না কোরে মাইনে নিয়ে, জীবন যাপন করতে কি পারি না? আমরা আসলে পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেই ভালবাসি। নতুবা, বিধবা হয়ে, ভাশুর দেবর যা-দের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সয়ে, অথবা ভাইয়ের সংসারে ভাইয়ের গালমন্দ খেয়ে, ভ্রাতৃবধূর নথ-নাড়া সয়ে কেন যে অনাহারে অর্দ্ধাহারে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে থাকি, তার অন্য কারণ কিছুই দেখি না।

শুধু চরকা কাটায় লাভ নাই। চরকা কেটে পৈতে কেটে,—অথবা সেবাপরায়ণা নারী জাতি আমরা—বিস্তৃত ভারতবর্ষে হস্‌পিটালের অভাব নাই, আমরা কেন নার্স হই না? প্রাণের সকল শক্তি-সামর্থ্য একত্র করে আমরা কেন সোজা হয়ে দাঁড়াইনে? তা হলেই আর পুরুষরা আমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে বা বিনা-মাইনের বাঁদিত্ব করাতে সাহস পাবে না।

পল্লীর শিক্ষিত পুরুষগণ কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স বা সভা সমিতিতে চীৎকার কোরে গলা ফাটাচ্ছেন—নারী সুশিক্ষিতা না হলে দেশ উচ্ছন্ন যাবে; সুমাতা ও সু-গৃহিণীর বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু ঘরে এসে বলবে ছি, ছি, কালে কালে হল কি,—সত্যি যদি মেয়েরা শিক্ষিতা হয়, দেশ টিকবে কি? আমরা যদি বুঝতে না পেরে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করি, অমনি বলে বস্‌বে, ওসব দেশের কথায়, দশের আলোচনায় তোমাদের কাজ কি,—তোমরা নারী, নারীর মত থাক।

অমনি আমরা চুপ। আমরাও ভাবলাম, তাই ত, আমরা নারী, আমাদের কাজ ঘর নিকানো, বাসন মাজা, জল তোলা; দেশের দশের অভাব-অভিযোগ, অধিকার-অনধিকারে আমাদের প্রয়োজন? আমাদের একচেটিয়া অধিকার—নির্ব্বিবাদে ওদের লাথি খাওয়া; আর পুণ্য কার্য্য—অবসর সময়টুকু পরনিন্দায় ক্ষেপণ করা। সুতরাং নারীর আজ এত লাঞ্ছনার কারণ নারীরাই।

এই যে বঙ্গের অধিকাংশ নারী বিধবা হয়ে অনবরত আত্মীয় ও আত্মীয়াদের কাছে লাঞ্ছনা পাচ্ছেন দেখেও, সধবা আত্মীয়ারা এক দিনও মনে করেন না—এক দিন এমন অবস্থা, ঈশ্বর না করুন, আমাদেরও ত হতে পারে! বিধবাদের প্রতি সধবা আত্মীয়াদের কারও মনে এতটুক সহানুভূতি জাগে না! বরং মনে করে, বেশ হয়েছে, আমরা মিনি-মাইনের বাঁদী পেয়েছি—দু'দশটা কথা শোনাবার লোক পেয়েছি। বঙ্গের হিন্দু বিধবার নির্জ্জলা একাদশী যে কতদূর কষ্টকর, সে ধারণাও এদের নাই। একাহার ও মাসে দুটা উপোস কোরেও এরা সংসারের খাটুনিতে একটু কশুর করলে আর রক্ষে নাই,—অমনি বলে বসবে, এক পাথর করে ভাত খাবে, কাজের বেলায় পাওয়া যাবে না। এ রকম ভাবে মামুলি লাথি খেয়ে মামুলি কাজগুলি করাই চাই।

দেবতা, বামুন, আত্মীয়স্বজন সাক্ষী রেখে বিবাহের মন্ত্র-পাঠ প্রভৃতি যতগুলো প্রতিজ্ঞা, অতি কঠোর কঠিন প্রতিজ্ঞা করে থাকেন স্বামী মহাশয়রাই; কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর, অথবা স্ত্রী বর্ত্তমান থাকতেই এঁদের অধিকাংশই হন যথেচ্ছাচারী, সংযমশূন্য, চরিত্রহীন। আর স্বামীর অভাবে যা কিছু কঠিন হতে কঠিনতর শাস্ত্রের ব্যবস্থাগুলি মানবে নারীরা! একবেলা হবিষ্যি নারীদের জন্য, নির্জ্জলা

একাদশী নারীদের জন্য, অম্বুবাচির উপবাস নারীদের জন্য,—তা সে অষ্টম বর্ষীয়া বালিকাই হউক, আর অশীতি বর্ষীয়া বৃদ্ধাই হউন। এদিকে যে ব্রহ্মচর্য্য সৃষ্টি হয়েছিল পুরুষদের জন্য, যে একাদশী কোরেছিল পুরাকালে শুধু পুরুষরাই, যে অম্বুবাচি ব্রাহ্মণ, যতি, ব্রহ্মচারীর জন্য,—সেগুলি অবাধে শাস্ত্রজ্ঞানহীনা দুর্ব্বলা বিধবাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এরা যথেচ্ছাচারে গা ভাসিয়ে দিয়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে; আর বল্‌ছে, যা কিছু আচার, যা কিছু নিয়ম যত শাস্ত্রের বিধান—সব সৃষ্টি হয়েছিল নারীদের জন্য। আমরা পুরুষজাতি—আমাদের কিছুতেই পাপ নাই, কিছুতেই জাতিনাশের ভয় নাই।

আমরা নারীরাও বলি,—তাই ত, পুরুষদের রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা যা কিছু—সবই বিধাতার অদ্ভুত উপাদানের সমষ্টি; আমরা সেগুলো হতে বঞ্চিত বলেই আমাদের সইতে হবে শাস্ত্রের লাঞ্ছনা, সমাজের লাঞ্ছনা, আত্মীয়-আত্মীয়াদের অত্যাচার ও গঞ্জনা। পৌরাণিক যুগের সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদীর কথা নাই বলিলাম,—কিন্তু রুক্ম্যা, পদ্মিনী, চাঁদবিবি, লক্ষ্মীবাইয়ের দেশেও কি আমাদের জন্ম নয়? এই নারীজাতি এক দিন অত্যাচারী শত্রুর বিরুদ্ধে কৃপাণ ধরিয়াছে,—নারীর সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়াছে; কিন্তু আজ আমরা সেই নারী,—অত্যাচারী পুরুষদের বিরুদ্ধে, পীড়নকারী সমাজের বিরুদ্ধে, জাতি-ধ্বংসকারী শাস্ত্রকারদের বিরুদ্ধে, লাঞ্ছনাকারী আত্মীয়-আত্মীয়াদের বিরুদ্ধে একটি কথাও মুখ ফুটে বলতে সাহস করি না,—লোক-নিন্দার ভয়ে অনাহারে আধমরা হয়েও মাথা তুলি না! এ দোষ কি পুরুষদের? দোষী আমরা নারীরা। নারী হয়ে আমরা নারীর দুঃখ বুঝি না। নারীকে সহানুভূতি দেখাইনে। বরং একটু ছুতা পেলে, নারী হয়ে নারীর মিথ্যা দুর্নাম করতে, নারীকে নিগৃহীত করতে ছাড়ি না। এ কথা বুঝি না,—আমাদের নারী-গৌরব, মায়ের গৌরব যে পদদলিত হচ্চে—শাস্ত্রকার পুরুষদের হাতে, সমাজনেতা পুরুষদের হাতে, ভাশুর-দেবর-ভাইয়ের হাতে, কত শত শত মূর্খ গোঁয়ার ছেলের হাতে! এর উপরেও আমরা কেন নারী হয়ে এই নারী-নির্য্যাতনে সাহায্য করি,—সমবেদনা না দেখায়ে পদে পদে দলিত করি!

এই সকল অত্যাচার লাঞ্ছনা সয়েও, ইহার বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ তো দূরের কথা—একটা প্রতিবাদও করতে আমরা সাহস পাই না। আর কিছু না পারি, যে কোন উপায়ে প্রাণটাও তো দিতে পারি। এই সকল শাস্ত্রের, সমাজের ও আত্মীয়াদের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে দলে দলে যদি প্রাণ দিই, তাহা হইলেই কিছু দিনের মধ্যে সব অত্যাচার থেমে যাবে—এ কথা আমি নিশ্চয় বলতে পারি। হাজার লাঞ্ছনা, হাজার গঞ্জনা সয়েও আমরা হাসিমুখে বেঁচেই থাকি। যদি অসহ্য হয়, নীরবে গোপনে দুফোঁটা চোখের জল ফেলি। এতে আর অত্যাচারীর ক্ষতি-বৃদ্ধি কি?

স্বামী স্ত্রীকে সাধারণতঃ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন না। বরং যা অধিকার স্বামী স্ত্রীকে দিয়া থাকেন, তা নিজের চাইতেও অধিক। কিন্তু যে মাতাল, চরিত্রহীন, তার কথা স্বতন্ত্র। নারীর প্রকৃত দুঃখ বৈধব্যে। তখন স্বামীর ভাই, ভাই-বৌ—তারাও বুঝে,—না এও এক দিন মানুষ ছিল, এও স্বামীর আদরের ছিল। নিজের ভাই, ভাই-বৌ তা বুঝে না। এমন কি শাস্ত্রকাররাও বুঝে না—এরা মানুষ,—এদেরও রক্ত মাংসের শরীর; এদেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, সুখ-দুঃখ বোধ আছে। সমাজপতিরাও তা বুঝে না। আমি বলি—দেশের নারীগণ, একবার এ অত্যাচার পীড়ন লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ কর। আর—যদি সাহসে না কুলোয়,—দেশে কেরোসিনের অভাব নাই—এস, সকলে একত্র হয়ে জহর-ব্রতের পুনরভিনয় করা যাক্,—দেখি, এদের চৈতন্য হয় কি না।

রণতরী। (১৭৫ ফুট লম্বা)

(শেষ)

বরণীয়র অধিবাসীদের ছ'টি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। যেমন কায়ান, কেণীয়া, ক্লেমেন্তান, মূরৎ পূনান্, ও দায়াক্। কিন্তু এদের সকলেরই বেশভূষা প্রায় এক রকমের। তবে ওরই মধ্যে কেউ হয়ত রঙীন জামা-কাপড় প'র্‌তে ভালবাসে, কারুর হয়ত ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে পোষাকের প্রতিই অধিক অনুরাগ। পুরুষেরা সেখানে সাধারণতঃ লুঙ্গীই পরে এবং অনেকে আবার বস্ত্রের উপরও একখানি ক'রে কটি-বাস ব্যবহার করে। বরণীয়র অধিবাসীরা কেউই শ্মশ্রু, গুম্ফ এমন কি ভ্রূদেশে ও আঁখি পল্লবের কেশ পর্য্যন্ত রক্ষা করে না, কেবল সমুদ্রতীরবর্ত্তী দায়াক্‌দের মধ্যেই কেউ কেউ ক্ষৌর-কার্য্যের বিরোধী লোক আছে বলে চক্ষে পড়ে।

কায়ান ও কেণীয়ার মেয়েরা পায়ের গাঁট পর্য্যন্ত ঝোলা একরকম ঘাগরা পরে। কিন্তু তাকে ঠিক ঘাগরা বলা চলে না, কারণ—তার মোটেই ঘের নেই, তা ছাড়া বাঁ-পাশটা একেবারে বরাবর কোমর পর্য্যন্ত খোলা; বরং সেগুলোকে

সুসজ্জিতা দায়াক্ সুন্দরী

অনেকটা পাশকাটা 'লুঙ্গী' বলা চলে। কাজ করবার সময় মেয়েরা তাদের—এই লুঙ্গীরূপের ঘাগরাকে আবার মালকোঁচা বেঁধে পরে।

কায়ান ও কেণীয়ারা ছেলে-মেয়েদের ছেলেবেলাতেই নাক কাণ ফুঁড়ে দেয়। মেয়েদের কাণ বিঁধিয়ে তারপর কাণের ফুটো ক্রমশঃ এমন বাড়িয়ে দেয় যে তাদের কাণ শেষ কাঁধের সীমাও ছাড়িয়ে কণ্ঠার উপর এসে পড়ে। শিশুর জন্মমৃত্যু নিয়ে তাদের মধ্যে নানারকম সংস্কার বা কুসংস্কার যাই বলুন, প্রচলিত আছে দেখা যায়। গর্ভবতী নারী কোনরূপ বীভৎস দৃশ্য অবলোকন করে না। দড়ী বা সূতায় গ্রন্থিবন্ধন করে না। প্রসবের সময় স্বামীর সূতিকাগারে প্রবেশ নিষেধ। মৃতপুত্র প্রসব ক'রলে বা প্রসবকালীন প্রসূতির মৃত্যু হ'লে সেটা তারা ভীষণ অলক্ষণ ব'লে ধরে নেয়। কেণীয়াদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবামাত্র ঢাক পিটিয়ে সেটা প্রতিবেশীদের বিজ্ঞাপিত করা হয়। পরিবারস্থ সকলকে একটিপ ক'রে লবণ উপহার দেওয়া হয়। কায়ানদের মধ্যে নিয়ম আছে—

কেণীয়ার কবর

সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সর্ব্বাগ্রে তাকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে স্পর্শ করে যাবেন, তবে অন্য কেউ তাকে ছুঁতে পাবে।

ক্লেমেন্তানদের মধ্যে একটা নিয়ম আছে যে, শৈশবাবস্থা থেকেই ছেলের মাথা চ্যাপ্টা ক'রে দেওয়া হয়। চ্যাপ্টা মাথা নাকি এদের চক্ষে ভারি সুন্দর লাগে! ছেলে এক মাসের হ'তে না হ'তেই তার মাথায় নিদ্রিতাবস্থায় শির চ্যাপ্টা করবার যন্ত্রটি পরিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু ছেলের ঘুম ভাঙলেই তৎক্ষণাৎ সেটি খুলে নেয়। আবার যতক্ষণ না ছেলে ঘুমিয়ে পড়ছে—ততক্ষণ আর সে যন্ত্রটী তাকে পরায় না। ছেলেমেয়েদের তিন চার্ বছর বয়স পর্য্যন্ত কোনও নামই দেওয়া হয় না। খোকা খুকী বলেই (থিঙ্-গুমায়বব্) ডাকা হয়। কারণ—তাদের বিশ্বাস যে তাড়াতাড়ি একটা নাম দিলে হয়ত ছেলেটা বা মেয়েটা না বাঁচতে পারে। তিন চার বছর পরে যখন ছেলের বা মেয়ের নামকরণ হয়, তখন প্রায়ই তাদের পিতামহ বা পিতামহী যারা জীবনের নানা সৌভাগ্য থেকে কখনও বঞ্চিত হয় নি, এমন লোকের নাম রাখা হয়। কিন্তু নাম রেখে যদি দেখা যায় যে, ছেলেটির বিশেষ কিছু মঙ্গল হওয়া দূরে থাক্ বরং বিপদের উপর বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তাহ'লে নামটি তারা অপয়া বিবেচনা ক'রে সে নাম তৎক্ষণাৎ বদলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

কায়ান্ ও কেণীয়ার ছেলে মেয়েরা পরস্পর নিজেদের মনোমতো পতি পত্নী নির্ব্বাচন ক'রে বিবাহ করে। বিবাহের আগে তাদের মধ্যে পূর্ব্বরাগ ও প্রেমের আদান-প্রদান চলে। দিবালোকে মেয়েদের নির্জ্জনে পাওয়ার সম্ভাবনা তাদের মধ্যে সুদূর-পরাহত বলে ছেলেরা রাত্রিকালে প্রেমাভিসারে বহির্গত হয়। পতিলাভের জন্য

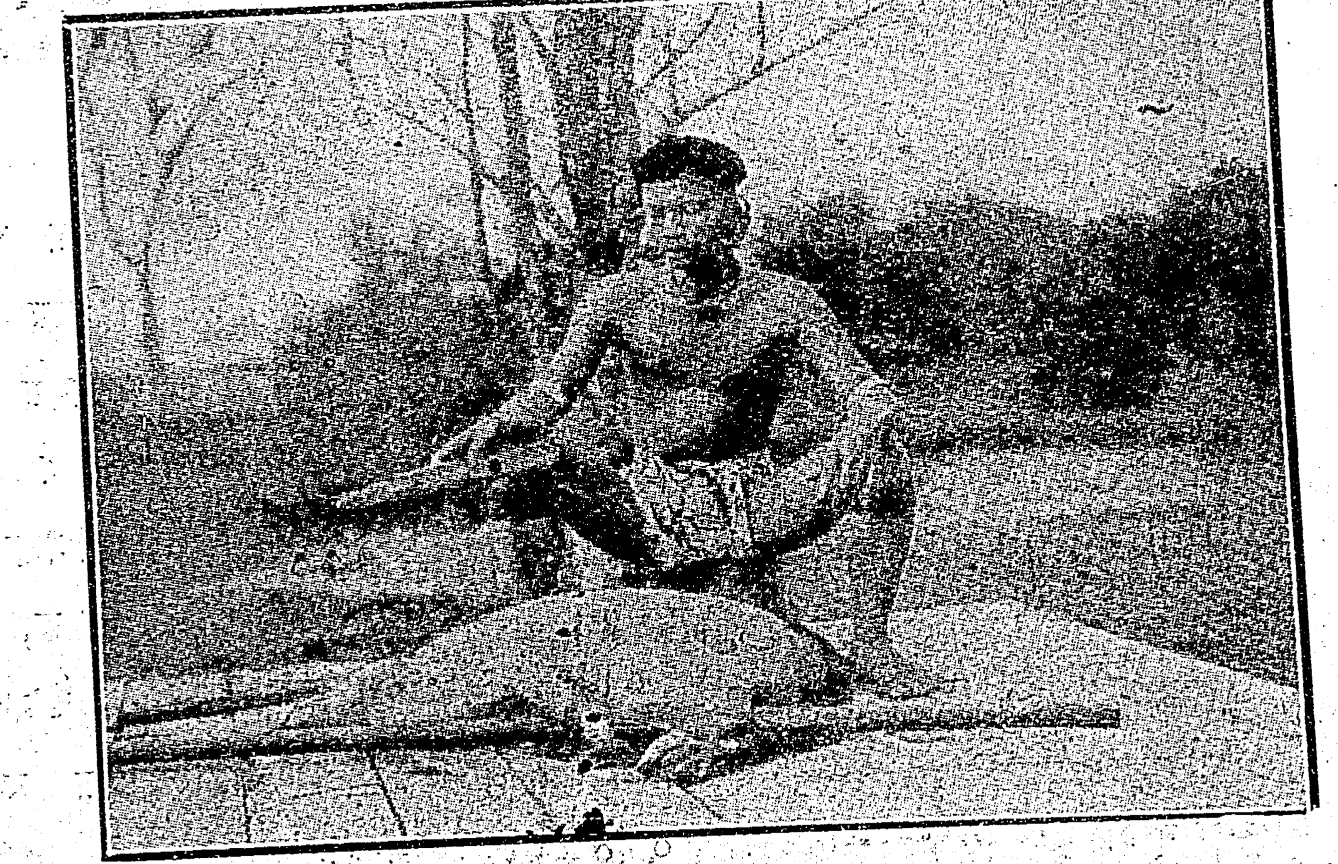

কায়ানের দেবপূজা (সম্মুখে বলির পশু রেখে, অগ্নিহস্তে কায়ান দেবারাধনা ক'রছে)

এই প্রেমাভিসার প্রয়োজনীয় ব'লে পিতা মাতা বা অভিভাবকেরা তাঁদের যুবতী কন্যাদের রাত্রিকালে পৃথক শয্যায় শয়নের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে পতি-নির্ব্বাচনে তাদের যথেষ্ট সহায়তা ও সুযোগ দেন। কোনও যুবক যদি কোনও যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হয়—তা'হলে সে রাত্রিকালে গোপনে তার নির্জ্জন শয্যাপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং তার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। যুবকের অভিভাবকেরা তার এই নৈশ ভ্রমণে কিছুমাত্র আপত্তি করেন না। এই সময় পুত্রের বন্ধু বান্ধবেরা পুত্রকে ডাক্‌তে এলে অভিভাবকেরা বলেন, সে "ধূমপান" ক'র্‌তে গেছে। এই "ধূমপান" করতে যাওয়া কথাটার গূঢ় অর্থ কি, সেটা তাদেরও মধ্যে সকলেরই জানা আছে; সুতরাং বন্ধুর দল এ সংবাদ শুনে আনন্দে উল্লাস ক'র্‌তে ক'র্‌তে ফিরে যায়।

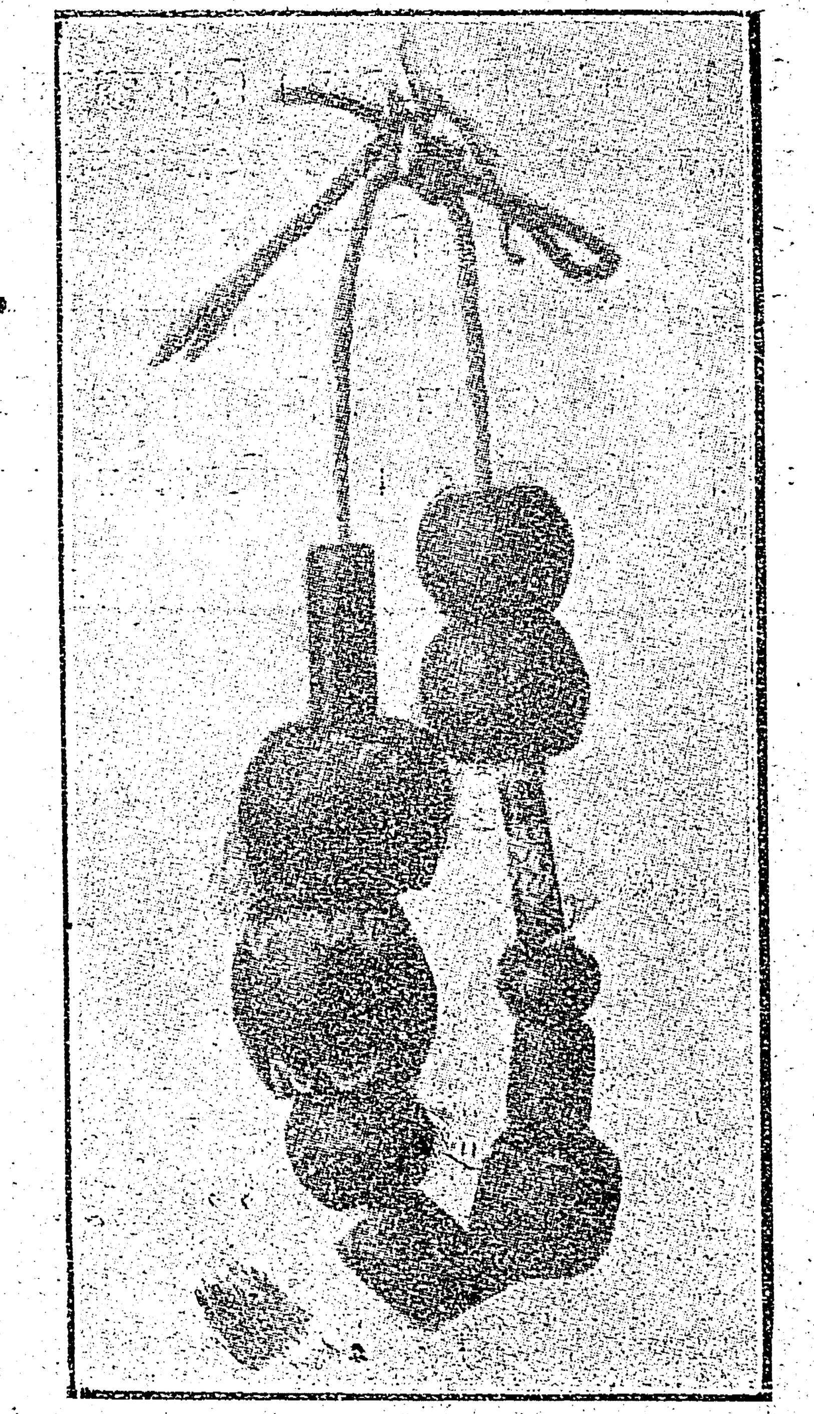

কায়ানদের মুদ্রা (স্ফটিক, কাঁচকড়া ও পুঁতি প্রভৃতি এখনও সেখানে অর্থের বিনিময়ে চলে।)

দায়াক্ বালক-বালিকা

প্রণয়িনীর শয্যাপ্রান্তে গিয়ে—যুবক তাকে অতি সন্তর্পণে ডেকে জাগিয়ে তোলে এবং তার হাতে এক দোনা পানের খিলি গুঁজে দেয়। যুবতী যদি সে উপহার গ্রহণ করে এবং সেই পানের দোনা থেকে একখিলি পান নিয়ে নিজে খায় ও আর এক খিলি আগন্তক যুবককে খেতে দেয়, তাহ'লেই বুঝ্‌তে হবে যে আশা আছে, এ বালিকা ধরা দিলেও দিতে পারে। বালিকার এই আচরণে উৎসাহিত হ'য়ে যুবক তার কাছে ঘেঁসে গিয়ে বসে এবং তার কাণে কাণে আপন প্রাণের প্রেম নিবেদন ক'রে দেয়। বালিকা যদি সেদিন কোনও উত্তর না দেয়, তাহ'লে, যুবক গৃহে ফিরে আসে বটে, কিন্তু নিরাশ হ'য়ে নয়;

শুভাশুভ নির্ণয়

পরের দিন রাত্রে আবার দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে সে সেই মেয়েটীর শয্যাপ্রান্তে প্রণয় ভিক্ষা ক'রতে উপস্থিত হয়। সেদিন হয়ত সে একগাছি ফুলের মালা বা লবঙ্গ ফুলের উগ্র সৌরভযুক্ত বীজের তৈরী একটি কণ্ঠহার—বা অন্য কোনও উপহার সঙ্গে নিয়ে যায়। উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপান্তে ফিরে আসবার সময় উপহারটি সে প্রণয়িনীর উপাধানের নিম্নে গোপনে রেখে চলে আসে। পরদিন রাত্রে গিয়ে যদি সে দেখে যে, সে ফুল-মালা ম্লান হ'লেও প্রিয়তমা তখনও তাকে কবরীচ্যুত করেনি, অথবা তার দেওয়া কণ্ঠহার তার হৃদয়-রাণীর কণ্ঠে শোভা পাচ্ছে, তাহ'লে পরমানন্দে বিহ্বল হ'য়ে সে তার প্রণয়িনীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে। যুবতী যদি সে আলিঙ্গনে বাধা না দিয়ে বরং ধরা দেয়, তাহ'লে অবিলম্বে তাদের বিবাহ প্রকাশ্য ভাবে ঘোষিত হয় এবং শুভকার্য্য শীঘ্রই সুসম্পন্ন হয়ে যায়।

এই অসভ্য বর্ব্বর জাতের মধ্যেও কন্যার পিতাকে বিবাহের পণ দিতে হয় না। যৌতুক যা কিছু দেওয়া হয় সে বরপক্ষই কন্যাপক্ষকে দেন এবং বিবাহ উপলক্ষে বর-যাত্রীদের পান ভোজনের ব্যবস্থাও বর-পক্ষই ক'রে থাকেন। এদের বিবাহে প্রথমটা পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। দেবতাকে সাক্ষী ক'রে মন্ত্র-তন্ত্রও কিছু প'ড়তে হয় না। এরা এখনও বীর্য্যশুল্কে নারী গ্রহণ করে। বিবাহের পূর্ব্বে বর সদলে কন্যাপক্ষকে আক্রমণ করে—এবং কিছুক্ষণ তাদের মধ্যে কৃত্রিম যুদ্ধ হবার পর কন্যাপক্ষ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে; তখন বরের দল জয়োল্লাস

ভূত-ছাড়াবার জন্য ওঝাদের বীভৎস বেশে নৃত্য

ক্লেমেন্তান্ তরুণীদ্বয় (নবান্ন উৎসবের জন্য এরা পুরুষবেশে সজ্জিতা হয়েছে ।)

কায়ান মেয়ে (জানু থেকে জঙ্ঘা ... ন্ত এবং হাতের কনুই পর্য্যন্ত চমৎ... র উল্‌কীর কাজ ।)

করতে করতে কন্যার পিতৃগৃহে প্রবেশ করে কন্যা যে কক্ষে লুকিয়ে থাকে, সেখান থেকে তাকে খুঁজে বার করে নিয়ে আসে। তখন পুরোহিতের ডাক পড়ে। শূকর বলিদান করা হয় এবং সেই বলি প্রদত্ত পশু-রক্তে বিবাহ-যাত্রীদের অভিষিক্ত ক'রে দেওয়া হয়। পুরোহিত বর-কন্যাকে দীর্ঘ জীবন ও বহু সন্তানসন্ততি লাভ ক'র্‌বে বলে আশীর্ব্বাদ করেন। তারপর বরকন্যাকে সাতবার বিবাহ বাটীর প্রাঙ্গণে উৎসব উপলক্ষে সজ্জিত সমস্ত ঘণ্টাগুলির উপর পা ফেলে ফেলে আনাগোনা ক'রতে হয়। এই সপ্তপদী যাত্রানুষ্ঠানের পর বিবাহ-কার্য্য শেষ হয়ে যায়। ঘণ্টাগুলির অধিকাংশই নিমন্ত্রিতেরা বিবাহের যৌতুক স্বরূপ সঙ্গে ক'রেই নিয়ে আসে।

বিবাহের পর অন্ততঃ এক বৎসরকাল জামাতাকে শ্বশুরগৃহে অবস্থান করতে হয়। এটা তাদের মধ্যে একটা একেবারে বাধ্যতামূলক প্রথা। এক বৎসর পরে জামাতা কন্যাকে নিয়ে—তার শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করে আপন

পিতৃগৃহে ... য়ে বসবাস ক'র্‌তে আরম্ভ করে। পুনান্‌রা কিন্তু কা...নদের মতো এক বৎসর পরে শ্বশুরালয় পরিত্যাগ ক'রে যা... না। তারা একেবারে বরাবরের জন্য কায়েমী হয়ে সে...নে আড্ডা গাড়ে। তা'ছাড়া পুনান্‌রা মেয়েকে কোন...যৌতুকও দেয় না। কেবলমাত্র গোটা কতক চুরুট উ...র দিয়েই পত্নী সংগ্রহ ক'রে নেয়।

কা... আর কেনীয়া...র অসুখ-বিসুখ ...'লে তারা বলে ...পেয়েছে! বিশে... যদি কেউ উন্মাদ ...গগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে ...'লে ভূতের আবি... সম্বন্ধে তাদে...র কোনও সন্দেহ থাকে না। সুতরা... তাদের রো... চিকিৎসা মানেই ...ত ছাড়ানো! রোগ ...সাজ্ঘাতিক হ'য়ে ওঠে, এবং রোগীর মৃত্যু যদি আসন্ন হ'লে বুঝতে পারা ...য়, তা' হ'লে ওরা ...লে রোগীর আত্মা আর তার দেহে ...াস ক'রতে চাইছে না বলেই তার অন্তিমকাল উপস্থিত হ'য়েছে। সুতরাং সেই বিদায়-উন্মুখ আত্মাকে পুনরায় সেই দেহেই ফিরে এসে বাস করবার জন্য বহু অনুরোধ উপরোধ ও কাকুতি-মিনতি করা হয়; এমন কি উৎকোচ প্রভৃতি প্রলোভনের দ্বারাও তাকে বশীভূত করবার বিধিমত চেষ্টা চলে। 'দায়োঙ্' অর্থাৎ ডাইনীর সাহায্যে এই কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা হয়। কারণ, তাদের বিশ্বাস যে, ডাইনীরা যখন দৈবশক্তির অধিকারিণী, তখন মৃত আত্মাকে ফিরিয়ে আনবার ক্ষমতাও তাদের নিশ্চয় আছে। এত সব কাণ্ড কারখানা করা সত্ত্বেও যদি কারুর মৃত্যু হয়, তাহ'লে ঢাক বাজিয়ে বা ঘণ্টাধ্বনি ক'রে সেটা প্রতিবেশীদের জানানো হয়। শবদেহটীকে তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেশভূষা ও অলঙ্কারে সজ্জিত করে, তার পূর্ব্ব পদমর্য্যাদা অনুসারে দু'দিন থেকে দশদিন পর্য্যন্ত রেখে দেওয়া হয়। তার পর মহাসমারোহে মৃতদেহটীকে একটি কফিনে পূরে কবর ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। শব সমাধিস্থ করবার সময় তার যাবতীয় মূল্যবান দ্রব্যাদি ও নিত্য ব্যবহার্য্য প্রিয় সামগ্রীগুলিও তার সঙ্গে সমাহিত করা হয়। আত্মীয় বন্ধুরা মৃতের আত্মার জন্য চুরুট ও এক এক চোঙা ভাত পাঠিয়ে দেয়। কবরের উপর সেগুলি সাজিয়ে দেওয়া হয়। পরলোকে প্রেতাত্মার পরিচর্য্যা করবার জন্য পুরাকালে প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃতদেহের সঙ্গে একজন ভৃত্য ও একজন পরিচারিকাকেও সমাধিস্থ করা হ'তো। কিন্তু নিরপরাধ দাসদাসীদের প্রতি এই নৃশংস অত্যাচার এখন বন্ধ হ'য়ে গেছে। জীবন্ত দাসদাসীর পরিবর্ত্তে এখন তাদের দুটী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে শব-

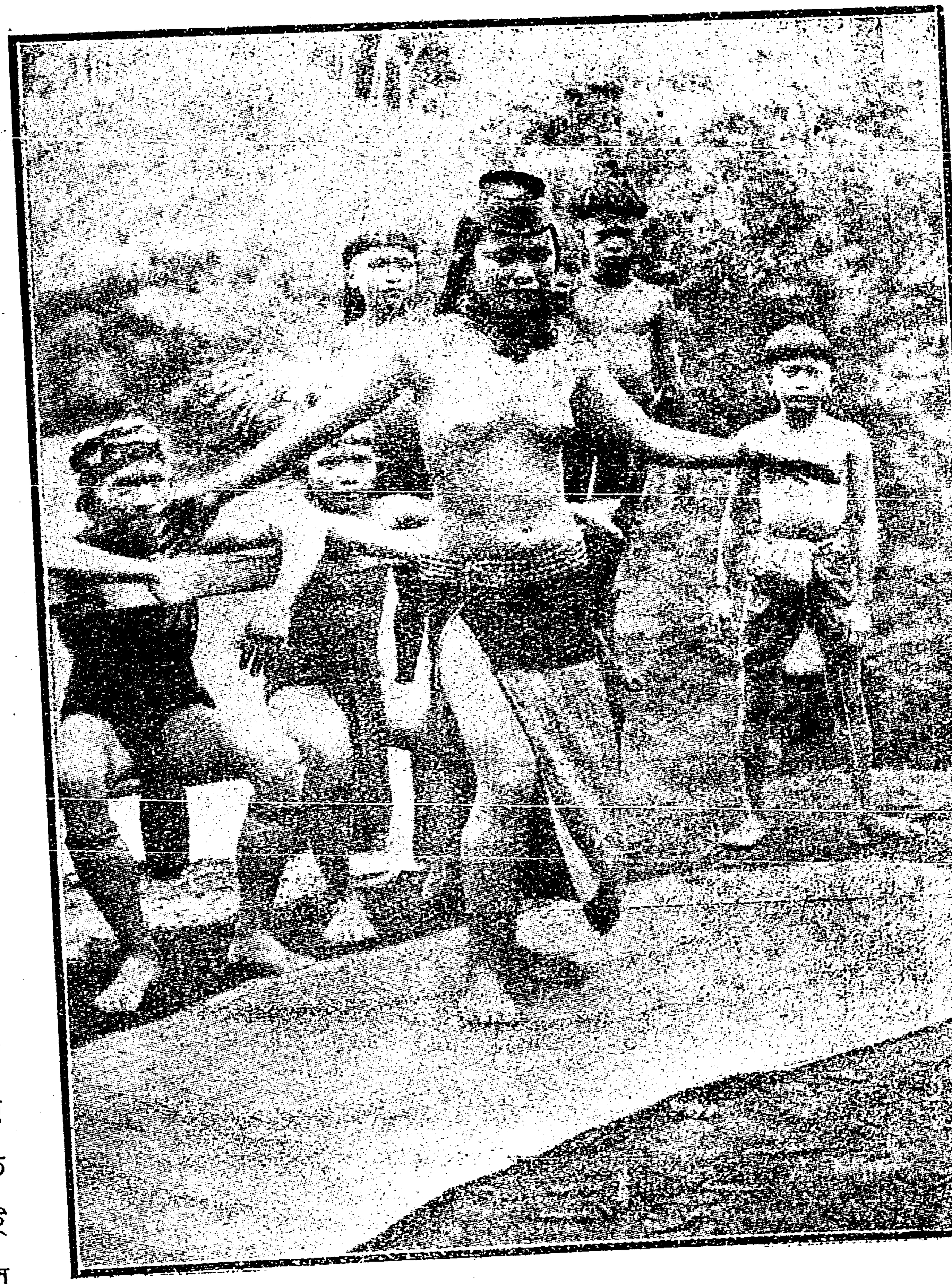

নবান্ন পর্ব্বে নৃত্যোৎসব

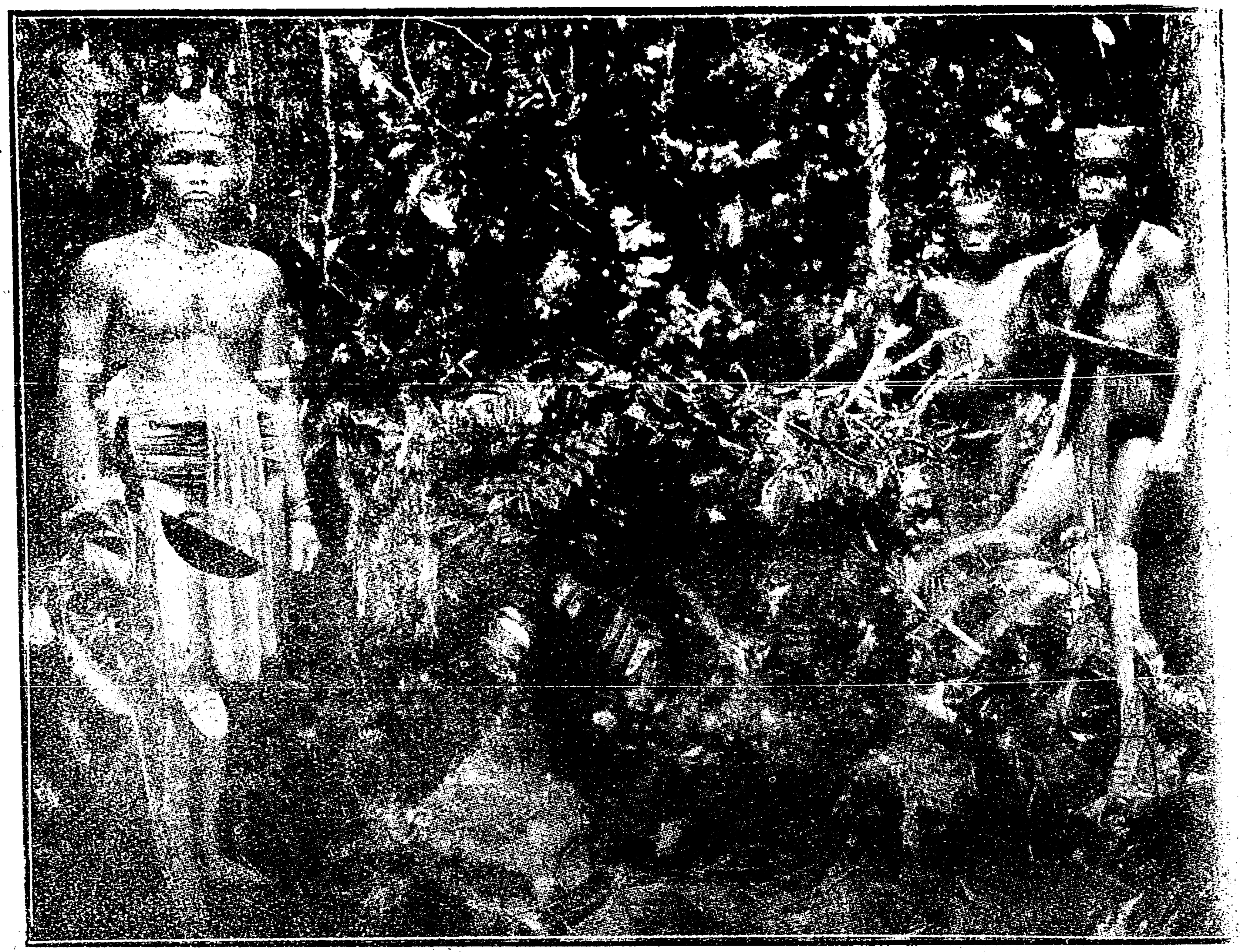

সুলক্ষণযুক্ত পাখীদের বাসস্থান !

শিশুর মাথা চ্যাপ্টা করা হ'চ্ছে।

দেহের ...ঙ্গ সমাধিস্থ করা হয়। একখানি নৌকা নানা বিচিত্র ...ঙের উজ্জ্বল রসনে ও নিশানে সুসজ্জিত করে তার উপর ...াধার সাজিয়ে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতের ...ীয় বন্ধুরা অন্যান্য নৌকায় আরোহণ করে নীরবে শববাহী ...নৌকার অনুসরণ করে। শবাধার তুলে নিয়ে যাবার ... ও সেখানে আগুন জ্বেলে একজন না একজন লোক ...স থাকে—যতক্ষণ না মৃতদেহ সমাধিস্থ ক'রে শবযাত্রী ফিরে আসে।

মৃ...হ সমাহিত হবার তিন দিন পরে তার পরিবার-বর্গ শো... পরিহার ক'রে মৃতের কক্ষে গিয়ে তার আত্মার উদ্দেশে ...াদ্যদ্রব্যাদি উপহার দেয়। এক বৎসর পরে একটা ...ার্ষিক স্মৃতি উৎসবের আয়োজন হয়। এই উৎসবে ...তের সমস্ত আত্মীয় বন্ধু নিমন্ত্রিত হয় এবং একটা বিরাট ...ভাজের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই এক বৎসর তাদে... কলকে মৃতের সম্মানের জন্য শোক-বেশ পরিধান ক'রে ...কৃতে হয়। ভোজ শেষ হ'লেই তারা শোক-বস্ত্রও ...ত্যাগ করে।

ক্লেমেন্তান কবর

কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে নিয়ম আছে যে, ছোট ছেলেমেয়ে মারা গেলে, তাদের একটা জারের মধ্যে ভ'রে সমাধিস্থলের বৃক্ষশাখায় ঝুলিয়ে রেখে আসে। ক্লেমেন্তানরা মৃত্যুর পরই শব সমাহিত করে না। মৃতদেহ সমেত শবাধারটি বন্ধ করে শোকান্ত কাল পর্য্যন্ত গৃহ-প্রাঙ্গণেই একটা মাচা বেঁধে তুলে রেখে দেয়। নির্দ্দিষ্ট কাল পরে সেই শবাধার উন্মোচন করে গলিত শবদেহের অস্থিগুলি বেছে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। এই দিনে

কেনীয়াদের পল্লীদেবতা (এর নাম "বালী আতপ" ইনি পল্লীবাসীর রক্ষণাবেক্ষণ করেন)

ক্লেমেন্তানদের মধ্যে খুব একটা বড় পান ভোজনের অনুষ্ঠান হয়। অস্থিগুলি সংগ্রহ করে একটী জারের মধ্যে ভ'রে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একটী প্রকাণ্ড কাষ্ঠের মঞ্চ তৈরী ক'রে তার উপরে কিম্বা একটী মোটা কাষ্ঠের স্তম্ভ শীর্ষের অভ্যন্তরে সেই জারটি রেখে দেওয়া হয়। 'ক্লেমেন্তান'দের মধ্যে কেউ কেউ এবং 'মূরৎ' সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেকেই আবার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই শবদেহটীকে একটী বড় জারের মধ্যে ভরে শোকান্ত

মহাকাম নদীতীরের সমাধিক্ষেত্র (নদীতীরস্থ পর্ব্বত গুহার মধ্যে সারি সারি শবাধার রক্ষিত)

দায়াকের ফুলকাটা দাঁত।

কাল পর্য্যন্ত **গৃহেই** রেখে দেয়। পরে কিন্তু তার অস্থি নিয়ে সমাধিস্থ **করবার** প্রথা ঐ একই রকম।

লক্ষণ বিচার (:বলি প্রদত্ত পশুর অন্ত্র পরীক্ষা ক'রে কায়ানরা পূজার ফলাফল স্থির করে)

এদের ধর্ম্মকর্ম্ম, ঈশ্বর বিশ্বাস, কুসংস্কার, যাদুবিদ্যা আর ডাইনীতন্ত্র সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে দিলেই এদের সম্বন্ধে সমস্তই একরকম বলা হবে। কায়ান্‌রা তিন রকম দৈব শক্তির অস্তিত্ব মেনে চলে। প্রথম হ'চ্ছে 'দেবাত্মা' বা দেবতার দল। এদের অসাধারণ শক্তি এবং মানুষের

দায়াকদের মুদ্রা (বড় মাটির জার হ'চ্ছে এদের মহামূল্যবান সামগ্রী। এক একটীর দাম পাঁচ দশ টাকা। এই জারের বিনিময়ে তারা মূল্যবান সম্পত্তি ক্রয় করে)

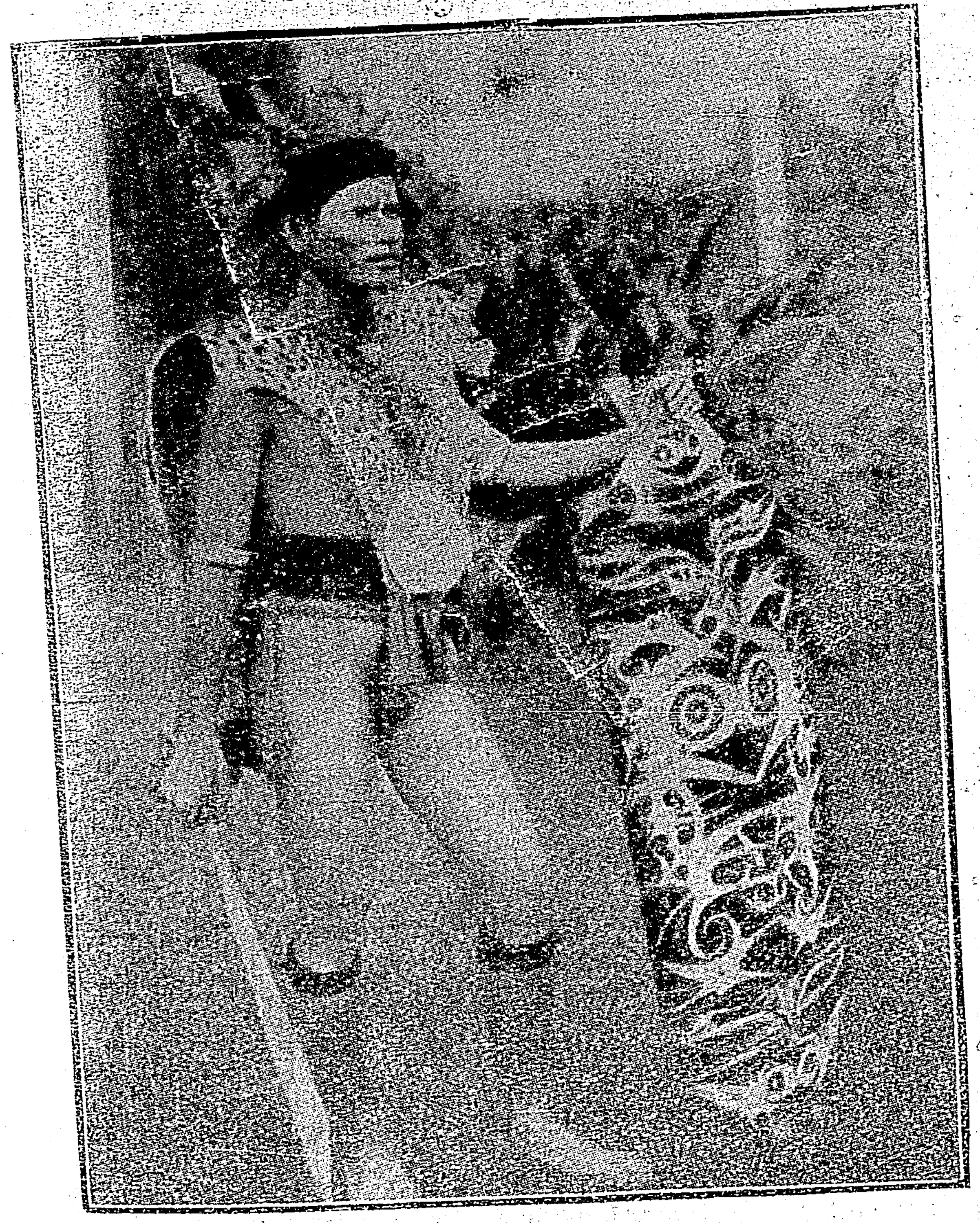

রণসাজে সজ্জিত বরণীয়বাসী

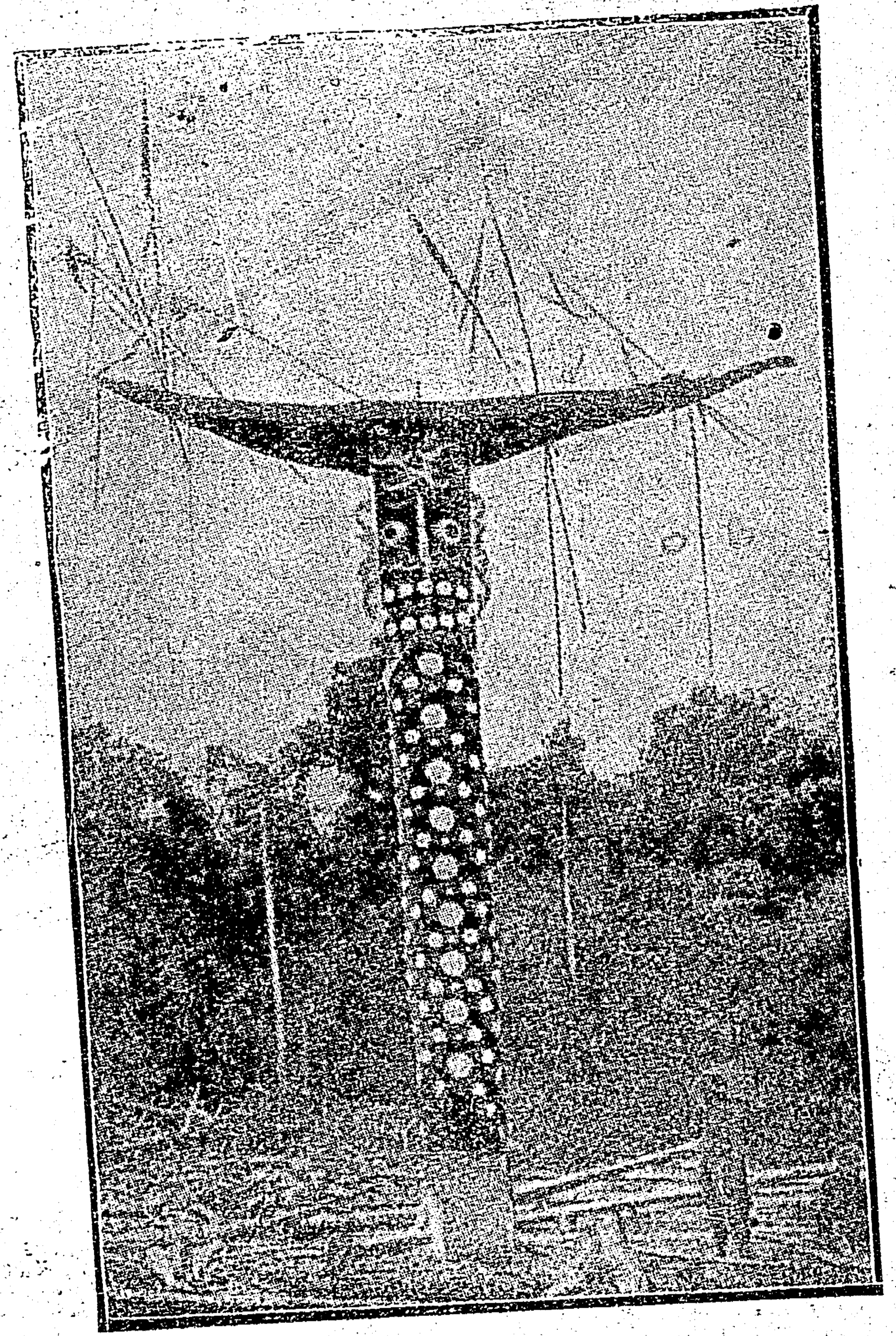

স্তূপাকৃতি ক্লেমেণ্ডান্ সমাধি স্তূপ

ভাগ্যচক্র ও **নিয়তির** এরাই না **কি** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়ন্তা— এই রকম তাদের বিশ্বাস। **দ্বিতীয়** দফায় তারা দৈবাধীন মৃত ও জীবিত ব্যক্তির আত্মা এবং কোনও কোনও পশুপক্ষীর দেবাবিষ্ট আত্মার অলৌকিক শক্তির উপরও

আস্থাবান। তৃতীয় দফায় তারা বিশ্বাস করে যে প্রত্যেক স্থাবর অস্থাবর জিনিষের মধ্যে সময় বিশেষে দেবতার অধিষ্ঠান হয়। তখন তারা সেই জড়পদার্থকেও দেবতার প্রাপ্য সম্মান দিয়ে পূজা করে। তাদের কয়েকটী বিশিষ্ট দেবতার নাম হ'চ্ছে 'তোবুলু' বা কার্ত্তিকেয়। আমাদের দেব সেনাপতির মতো, ইনি হ'চ্ছেন তাদের রণ-দেবতা, দেবদেবী। এঁরা সকলেই শুভগ্রহ। আবার জনকতক অপদেবতাও আছেন যাঁরা অশুভগ্রহের মতো মানুষের কেবল অনিষ্টই করে থাকেন। তাঁদের নাম হ'চ্ছে যথাক্রমে 'লেকাই বালারাই' আর 'ওবেঙ্‌দো'! এই দুই দেব দম্পতী হ'চ্ছেন বজ্র ও ঝঞ্ঝা! 'তোকীয়ো' হ'চ্ছেন 'ভয়ের ঠাকুর'। মানুষের মনে ভয় তরাসের ছাপটা ইনিই

ঋতু নির্ণয় (এই দণ্ডের ছায়া যখন ভূমিলগ্ন মাপকাঠির একটি নির্দ্দিষ্ট অঙ্কে এসে প্রত্যহ স্থির হ'য়ে যায়, সেইটেই তখন কৃষিকার্য্য আরম্ভ করবার প্রশস্ত সময় ব'লে ঘোষণা করা হয়।)

বরণীয় যোদ্ধা

'লেকাইজু উরীপ' 'লেকাই মাকাতান উরীপ', ও 'লেকাই কালীশাই উরীপ,' এঁরা হ'চ্ছেন 'জীবন দেবতা' বা বিধাতা পুরুষ-ত্রয়! তার পর 'লেকাই পেশঙ্‌' ইনি হ'চ্ছেন অগ্নি-দেবতা। তার পর 'আনাই লাবাঙ্‌' ও 'লেকাই আইভঙ্‌' এঁরা হচ্ছেন 'লক্ষ্মী-নারায়ণ'—কৃষকদের এঁকে দিয়ে যান। 'বালানান্‌' হচ্ছেন 'পাগ্‌লা ঠাকুর'— ইনি ভাল লোককে উন্মাদ করে তোলেন। এ ছাড়া আরও একদল দেবতা আছেন, তাঁরা নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করেন। কারুর ভালও করেন না, কারুর মন্দও করেন না। যেমন 'উরাই উকা'। ইনি হ'চ্ছেন বরুণ দেবতা,—নদী ও হ্রদ তড়াগ প্রভৃতিতে এঁর অধিষ্ঠান। আবার সকল দেবদেবীর শ্রেষ্ঠ দু'জন আছেন, যাঁদের ইন্দ্র ও শচীর আসন দেওয়া যেতে পারে। তাঁরা হচ্ছেন 'লেকাই তেনাঙ্‌গান' ও 'দো তেনাঙ্‌গান্‌।' লেকাই তেনাঙ্‌গান নিখিল পুরুষের অধীশ্বর এবং দো তেনাঙ্‌গান

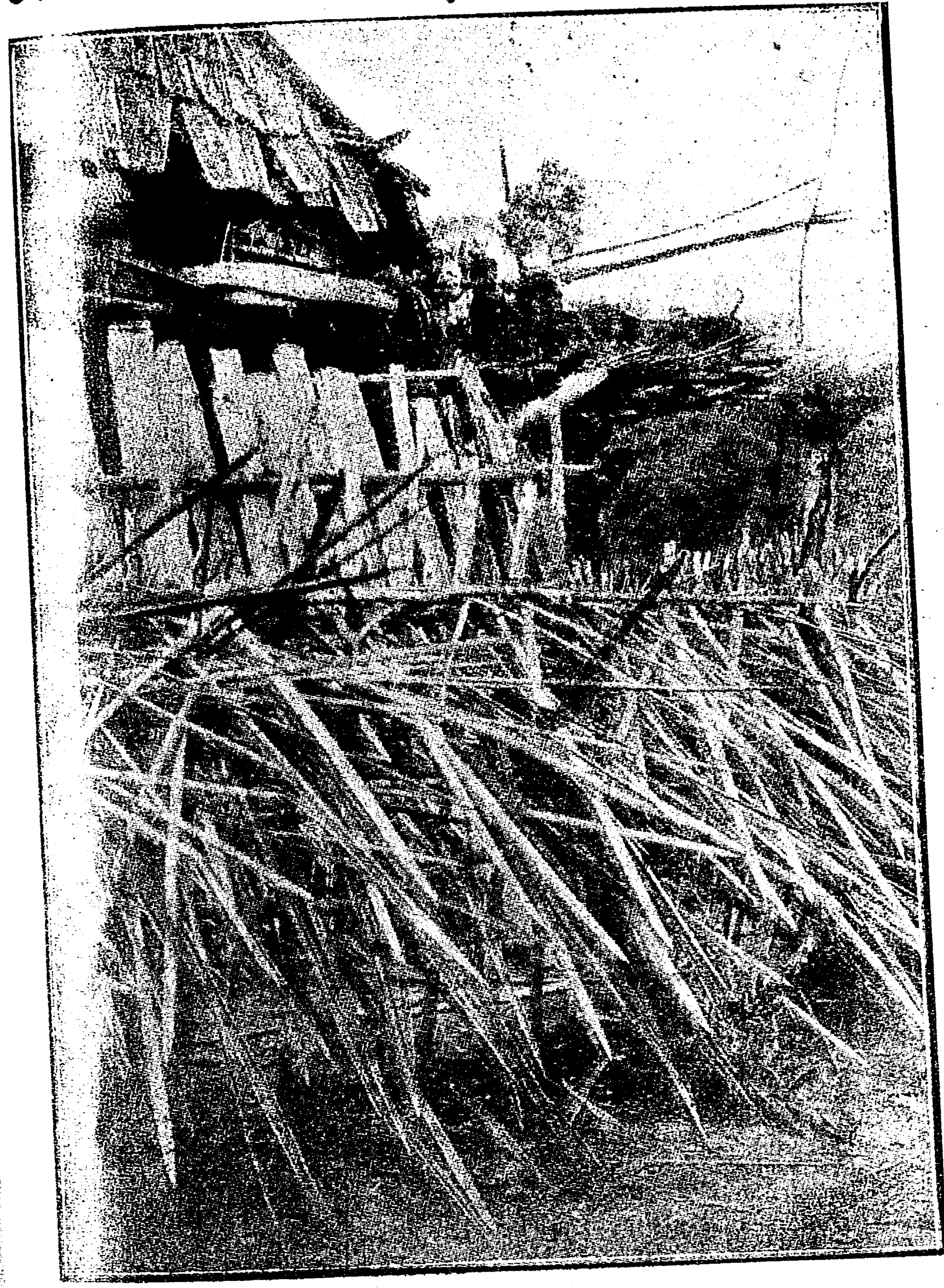

গৃহের রক্ষা প্রাকার (শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার অবসর পাওয়া যাবে বলে গৃহের চারিদিকে বাঁশের ও বেতের খোঁচা দিয়ে প্রাচীর তৈরি করা হয়ে থাকে)

হ'চ্ছেন নিখিল নারীর অধিশ্বরী! এঁদের পূজা ও উপাসনায় বলিদান একটা প্রধান অঙ্গ। একটী মুর্গী কিম্বা শূকর এদের পূজোপলক্ষে কাটতেই হয়। এ ছাড়া মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রীও দেবতার পূজায় নিবেদন ক'রে দেওয়া হয়। এমন কি অসুস্থ পুত্রের আরোগ্য কামনায় তরুণী জননী তাঁর মাথার কেশগুচ্ছও কেটে ফেলে দেবতার চরণে উৎসর্গ করেন।

কায়ানরা কোনও কোনও পশুপক্ষীর বিশেষ সমাদর করে এইজন্য যে, তারা না কি দেবদূতের মতো ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বহন ক'রে নিয়ে আসে। তাই কোনও কিছু শুভ কাজ করবার আগে তারা ওই বিহঙ্গ দূতের শরণাপন্ন হয়; কার্য্যসিদ্ধি হ'বে কি ব্যর্থ হবে, এইটুকু জান্‌বার জন্য তারা বনের মধ্যে তাদের ডাক শুন্‌তে যায়। পশু পক্ষীর ডাক বিশেষের একটা ভাল মন্দ অর্থ না কি তাদের জানা আছে। আমাদের দেশের 'কাকচরিত্র' যেরকম বোধ হয়।

এদের সামাজিক রীতিনীতিরও কতকগুলো বিশেষত্ব আছে, যার সঙ্গে আমাদের অনেকটা মেলে। এরা পাতপেড়ে বসে খায়। উঠে কুলকুচো ক'রে আঁচায়। ঢেঁকুর তোলে, পান খায়। অতিথি অভ্যাগত এলে তাদের আহারাদির পর মদ ও চুরুটও খেতে দেওয়া হয়, এবং নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি আমোদের ব্যবস্থাও হয়ে থাকে।

ধান রুইবার সময় ক্ষেতে গিয়ে মেয়েরা অনেকরকম তুক্‌তাক্‌ করে, যাতে ধান খুব বেশী জন্মায়, আর চড়ুই

পুনান্‌ মেয়েরা ছেলেকে পিঠে করে বহন ক'রে নিয়ে যায়।

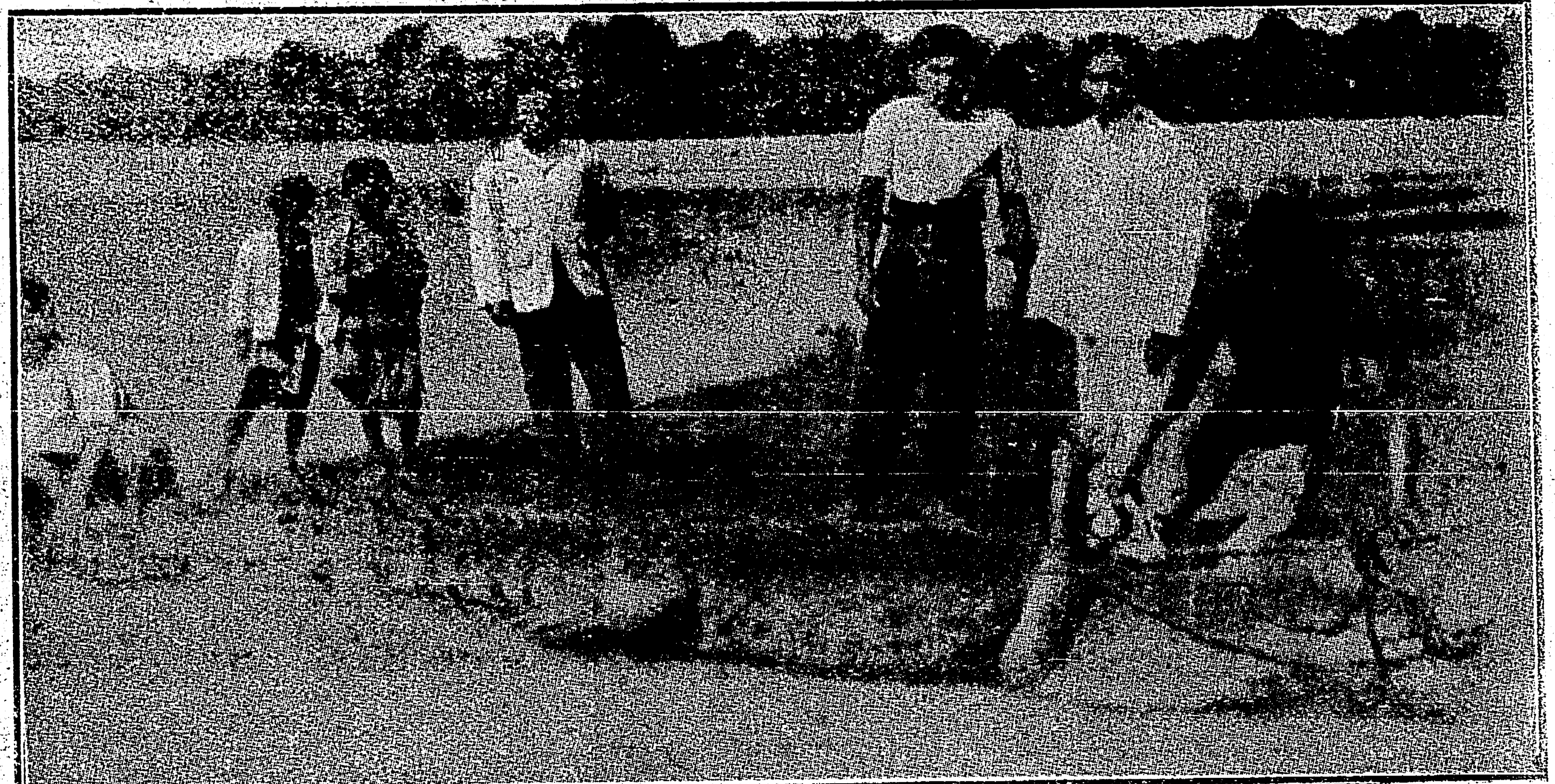

কুম্ভীর বন্ধু (কুমীরকে এরা বড় শ্রদ্ধার চ'ক্ষে দেখে, কখনও মারে না। কোনও কুমীর যদি মানুষ মারে তাহ'লে এরা সেই কুমীরটিকে ধ'রে হাত পা মুখ বেঁধে ডাঙায় ফেলে রেখে চলে যায়। যাবার সময় কুমীরের গায়ে হাত বুলিয়ে মাপ চেয়ে ব'লে যায়—"ঠাকুর্দ্দা, কিছু মনে কোর না ভাই,—যেমন কর্ম্ম করেছো তেমনি ফল ভোগো। এবারটা না খেয়ে শুথিয়েই ম'রতে হবে।)

মুর্গীর লড়াই (এটা এদের একটা প্রধান ব্যসন)

ইঁদুর প্রভৃতির উৎপাত না হয়। ধান কাটা হ'য়ে যাবার পর তাদের বাড়ীতে একটা উৎসবের আয়োজন হয়। এটাকে 'নবান্ন' পার্ব্বণী বলা যেতে পারে। এইটে ওদের দেশের মস্ত বড় পরব ! উৎসবের দিন মেয়েরা সব পুরুষ সাজে, আর পুরুষেরা সব উল্লুক বাঁদর প্রভৃতি জন্তু জানোয়ার সাজে। নতুন চালের আটা আটা ফ্যান মেয়েরা সেদিন

াট্টা ক'রে পুরুষদের গায়ে ঢেলে দেয়। খুব নাচ গান আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান হয় সেদিন। আর একটা বীভৎস কাণ্ডেরও অনুষ্ঠান হয়। এরা সেদিন দল বেঁধে বেরিয়ে মানুষের মাথা শিকার ক'রে আন্‌তে যায়। কোনও বিপক্ষদলকে বা শত্রুকে আক্রমণ করবার এই দিনটাই হ'চ্ছে তাদের পক্ষে প্রশস্ত। লড়ায়ে যে পক্ষ জেতে তারা পরাজিত দলের হত বা আহত ব্যক্তিদের মুণ্ড কেটে নিয়ে আসে। এবং পাছে অপর পক্ষের কেউ তাদের দলের হত বা আহতদের মাথা কেটে নিয়ে যায় এই ভয়ে নিজেরাই নিজেদের দলের হতাহতদের মাথা আগে থাকৃতে কেটে নিয়ে মাটীর মধ্যে পুতে ফেলে !

লাইরঙ যোদ্ধা (দেহে চর্ম্মাবরণ, শিরে অস্থি মুকুট, এক হাতে ঢাল; এক হাতে তরবাল, ঢালে শত্রু-শিরোৎপাটিত কেশাচ্ছাদন।)

রণজয়ী দায়াকবীর

উল্কী পরাটা বরণীয়বাসীদের একটা প্রধান বিশেষত্ব। কায়ানরা সাধারণতঃ উল্কী পরে অঙ্গ শোভা বৃদ্ধি করবার জন্য ; কিন্তু উল্কী পরার মধ্যে আবার নানারকম মারপ্যাঁচ আছে। এই উল্কীর কারুকার্য্যের সঙ্গে অনেকে তাদের বীরত্ব কাহিনী সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত করে রাখে। কেউ কেউ ব্যাধির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যও দেহে উল্কীর আবরণ দিয়ে নেয়। পশুপক্ষী বৃক্ষলতা ও মানুষের মূর্ত্তিও ওরা উল্কীর মধ্যে অতি সুন্দর ভাবে আঁকে। মেয়েরা সাধারণতঃ কুমারী অবস্থায় অঙ্গে উল্কী চিত্রণ করিয়ে নেয়। বিবাহের পর আর তারা কেউ উল্কী পরে না, কারণ তখন

মেয়েদের পক্ষে ওটা করা না কি নিতান্ত বেহায়াপনা বলে বিবেচিত হয়। আট বছর বয়স থেকেই মেয়েরা উল্কী প'রতে আরম্ভ ক'রে এবং বিবাহের পূর্ব্বে প্রায় তাদের সর্ব্বাঙ্গ উল্কীর বিচিত্র শোভায় চিত্রিত হ'য়ে ওঠে। যারা উল্কী পরায় তাদের প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হয়, তবে উল্কী পরানোটা তাদের মধ্যে এখনও কারুর বা কোনও শ্রেণী বিশেষের পেশা হ'য়ে ওঠেনি। ওটা এখনও তাদের মধ্যে একটা সখের কাজ হিসেবেই চলছে, প্রায়ই তাদের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধবেরা তাদের পরস্পরকে উল্কী পরিয়ে দেয়। যে ভাল উল্কীর কাজ জানে তার মেয়েদের মধ্যে ভারি খাতির। উল্কী পরবার জন্য সবাই তার খোসামোদ করে। তাদের বিশ্বাস যে সর্ব্বাঙ্গে উল্কী পরতে পারলে পরকালে স্বর্গ-নদী "তেলাঙ্ জুলান" অর্থাৎ মন্দাকিনী বা বৈতরণীতে স্নান করবার অধিকার পাওয়া যাবে। যাদের অঙ্গে এখনও উল্কীর কাজ সম্পূর্ণ হয়নি, তারা না কি "তেলাঙ্ জুলানের" তীর পর্য্যন্ত যেতে পারবে, কিন্তু জলে নাম্‌তে পাবে না ; আর যাদের মোটেই উল্কী নেই, তারা ত সেদিকই মাড়াতে পাবে না।

যুদ্ধে সংগৃহীত নরমুণ্ড

দায়াকের বিবাহ সভা।

স্বপ্ন

শ্রীমণীলাল বসু

১৭

অন্ধকার রাত্রি তারায় তারায় ছাইয়া গিয়াছে। ভগ্নস্তূপের মধ্যে আজ সকলে আসিয়া জুটিয়াছে—শঙ্কর ও জামেলা, আলি মহম্মদ ও যমুনা, রাজশেখর ও শিরিণ সকলে এখানে একত্র মিলিয়াছে। আজ রাত্রে ভ্রাতৃ-সম্প্রদায়ের শেষ সভা হইবে।

উন্মুক্ত আকাশের তলে একটি ভগ্ন পাথরের ওপর শঙ্কর ও আলি মহম্মদ বসিয়াছিল। আলি মহম্মদ ধীরে ডাকিল—গুরু!

না আলি, আমি আর কারুর গুরু নই, আমি নিজের পথ নিজে দেখতে পাচ্ছি না।

আপনি কি আমাদের ছেড়ে যাবেন ?

আমি বুঝতে পারছি না, না, আমি হার মানব না।

এই ত আমাদের দলের কাজ করার সময় এল।

তুমি ঠিক বলেছ, কিন্তু দেখ আলি, আমি নিজের মনে শক্তি পাচ্ছি না, সেটা বোধ হয় আমার শরীরের দুর্ব্বলতার জন্যে। কিন্তু তুমি কি করবে ?

আমি ? আমারও স্বপ্ন সব ভেঙ্গে গেছে ; কিন্তু আমি নতুন স্বপ্ন দেখছি—

কি দেখছ আলি বল আমায়—মনে পড়ে, প্রথম যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়, তোমায় বলেছিলুম, দিল্লীতে চিতানলশিখা জ্বলে উঠবে,—মোগলসাম্রাজ্যের শ্মশানশয্যায় প্রলয়ের লক্ষ লক্ষ অগ্নিশিখা জ্বলে উঠবে, এ রাজত্ব, এ সভ্যতা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে—কাল দিল্লীর পথে পথে ধ্বংসের সেই নিদারুণ রূপ দেখলুম—নরকঙ্কালে পথ ছেয়ে গেছে, শবদেহের বীভৎস দুর্গন্ধ উঠছে, মোগলসাম্রাজ্যের কঙ্কালের মত দিল্লী পড়ে আছে—এর পর অমানিশার অন্ধকার—শবলুব্ধ শকুনিদলের মত মারাঠী রাজপুত শিখ জাঠ সব ছুটে আসছে—

কিন্তু আমি যে স্বপ্ন দেখছি, তা কোন সাম্রাজ্যের নয়, শক্তির নয়,—তা প্রেমের জীবনের স্বপ্ন। কি হবে রাজ্য রাজধানীতে এ অশান্ত জীবনে, তার চেয়ে কোন স্নিগ্ধ নদীতীরে কোন শান্তিরসসিক্ত গ্রামে প্রেমের নীড় বেঁধে—

বুঝেছি আলি—আমারও তাই ইচ্ছা করে, সাধারণ লোকের মত সহজ সরল জীবন যাপন করি,—নারীকে ভালবাসার সুখ, নারীর ভালবাসা পাওয়ার আনন্দ—

আপনি যদি অনুমতি করেন—

দেখ, আমার কোন আপত্তি নেই—যমুনার যদি ইচ্ছে থাকে, তোমরা যদি সুখী হও, তোমাদের মিলনে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করব—যমুনাকে ডাক ত—

আলি ধীরে উঠিয়া গেল। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, তাহারও মনে বাসনা জাগিতেছে,—তাহারও ইচ্ছা করি-তেছে, কোন নারীকে লইয়া প্রেমের ঘর বাঁধে। মায়ের স্নেহ, ভগ্নির প্রীতি সে পাইয়াছে, কিন্তু প্রিয়ার প্রেম !

কে আসিয়া তাহার পাশে বসিল। শঙ্কর একটু চমকিয়া বলিল—কে !

আমি ! কেমন আছ তুমি ?

শঙ্কর একটু শিহরিয়া বলিল—তুমি, জামেলা ! দেখ জামেলা—

ভ্রাতৃসম্প্রদায়ের সবাই এসে জুটেছে—

ও, দেখ, আমি তোমার কথা ভাবছিলুম—

কি ভাবছিলে ?

ভাবছিলুম—কিন্তু ঠিক করতে পারছি না—সুখ, সুখের তৃষ্ণা, ভোগের ইচ্ছা আমাদের মধ্যে রয়েছে, তাকে জয় করে উঠতে আমরা পারি না—তুমি ত ভোগের জীবন শেষ করে এলে, কিন্তু কি করবে তুমি এবার—

আমায় যা আদেশ করবে—আমায় নেবে না তোমার সঙ্গে ?

তোমাকে, দেখ, হাঁ, তোমাকে ত আমি ডেকে নিয়ে এলুম, এস আমার সঙ্গে—আমায় মুক্তি দাও জামেলা—

আমি মুক্তি দেব ! মুক্তির আশায় ত তোমার কাছে এলুম—

না, আমায় লোভ দেখিয়ো না, এখনও বাসনা জয় করে উঠতে পারি নি—তুমি চলে যাও, ভুল করে তোমায় ডেকেছিলুম—

চলে যাওয়াই যদি তোমার আদেশ হয়, আমি চলে যাব—

না, আদেশ নয়, আচ্ছা আমায় ভাবতে দাও—

জামেলার সুন্দর মুখের দিকে শঙ্কর একবার চাহিল,—নারীর রূপ তাহাকে মুগ্ধ করিতেছে। নারীর রঙীন অঞ্চলের পাল ওড়াইয়া প্রেমের সাগরে জীবনতরণী ভাসাইয়া দিলে হয় ত সুখ আছে। সেই সুখ স্বপ্নের মোহে আলি মহম্মদ মুগ্ধ হইয়াছে। সেও কি এ প্রেমের আলেয়ায় দিশাহারা হইবে!

আপন মনের চিন্তা হইতে আপনাকে মুক্তি দিবার জন্য শঙ্কর ধীরে উঠিল, সুড়ঙ্গ পথ দিয়া গহ্বরের আলোছায়াময় প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোণে কোণে প্রদীপের শিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে,—মারাঠা, রাজপুত, শিখ, বাঙ্গালী বিভিন্ন প্রদেশের যুবকগুলির মুখ প্রদীপের শিখার মতনই একবার জ্বলজ্বল করিয়া উঠিয়া ম্লান হইতেছে। শঙ্কর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে কয়েকটি মারাঠা যুবক উঠিয়া অগ্রসর হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। তাহাদের আশাদীপ্ত মুখ দেখিয়া শঙ্কর অন্ধকার পথে যেন আলোর রেখা দেখিল। নাদির চলিয়া গেলে দিল্লীর সিংহাসন এবার মারাঠাদের শক্তির অধীনে আসিবে, এই তাহাদের আশা। তাহারা শঙ্করকে মারাঠাদের দলে আনিতে চায়! ভারতের বিভিন্ন রাজশক্তি এক করা অসম্ভব, শুধু যদি মারাঠাদের মধ্যে একতা আনিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহারাই নতুন হিন্দু সাম্রাজ্যের স্থাপনা করিতে পারিবে। তাহাদের আলিঙ্গন করিয়া শঙ্কর যেন নব শক্তি পাইল। তাহাদের মধ্যে একজন পেশোয়া বাজীরাওয়ের দূতরূপে আসিয়াছিল। সে জানাইল, পেশোয়া শঙ্করকে স্মরণ করিয়াছেন। হায়, সে নারীর প্রেম লইয়া লীলা করিবে ভাবিয়াছিল,—সে ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহাকে যে জ্যোতির্ম্ময় জাগরণের বাণী বলিতে হইবে,—সে সন্ন্যাসী তপস্বী।

সকলকে অভিবাদন করিয়া শঙ্কর ধীরে বলিল—ভাই সব, আজ তোমাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি—

বিদায়! শঙ্কর কি রাজনীতি ছাড়িয়া দিলেন! জামেলার বুক দুলিয়া উঠিল। শঙ্করের মুখ একটু করুণ হইয়া আসিল। সে করুণস্বরে বলিতে লাগিল—ভারতের যে মহামিলনের স্বপ্ন আমি দেখিছি, শিখ-জাঠ-রোহিলা-রাজপুত-মারাঠা-মোগলের যুক্ত অসির উপর স্থাপিত যে শান্তির সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিছি, সে স্বপ্ন অলীক মায়া! শক্তিতে শক্তিতে কেবল স্বার্থের সংঘাত হয়, রাজনীতির স্বার্থসঙ্কুল শক্তিমত্ত পথে ভারতের বিভিন্ন জাতি মিলবে না—তার পরিচয় কি আমরা পেলুম না—এ যে পারস্যদস্যু নাদির পাঞ্জাব জ্বালিয়ে দিল্লী শ্মশান করে সব ধন লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল—এ বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে ত ভারত এক হয়ে দাঁড়াল না— হীনবীর্য্য মোগল শক্তি যাতে একেবারে লুপ্ত হয় তাই হিন্দুশক্তি সব একটুও সাহায্য করল না—

মারাঠা যুবকেরা লজ্জিত ভাবে শঙ্করের করুণ মুখের দিকে চাহিল। শঙ্কর ধীরে বলিতে লাগিল—রাজনীতির পথ দিয়া নয়, ধর্ম্মের পথে প্রেমের পথে ভারতের মিলন-স্বপ্ন সত্য হবে। কবীর, নানক ভারতের সাধুরা যে বাণী প্রচার করে গেছেন, সেই বাণীর সূতায় ভারতের বিভিন্ন জাতিমালা গাঁথা যাবে—

সহসা শঙ্করের মুখ জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। সে দীপ্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল—তোমরা হয় ত ভাবছ, আমি তোমাদের অসি ছেড়ে ধর্ম্মের সাধনায় ডাকছি—তা নয় আমি যে ধর্ম্মের কথা বলছি, তা নানক তুকারামের নয়, তা গুরু গোবিন্দ রামদাসের—ভারতের আজ সৈনিক-সন্ন্যাসী চাই—প্রেমের মিলনমালা দিয়ে বিধাতা আমাদের পাঠান নাই, তাঁর হাতের বজ্র দিয়ে পাঠিয়েছেন—

নিমেষের জন্য শঙ্করের চোখ আলি মহম্মদের ওপর গিয়া পড়িল, তাহার চোখ দুইটি জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। আপনাকে সংযত করিয়া সে বলিতে লাগিল—প্রিয়ার চুম্বন নয়, নারীর নিবিড় আলিঙ্গন নয়, শান্তির সুখ-গৃহ নয়, আমাদের জন্য উন্মুক্ত শাণিত অসি, মৃত্যুময় রণক্ষেত্র, জাগরণের অগ্নিজ্বালা—আমরা প্রত্যেকে নবশক্তির প্রদীপ—আমরা যে ভারতের সকল জাতির মিলন ঘটাব বলে স্বপ্নে মেতেছিলুম, সে স্বপ্ন সহজে সফল হবে কি না জানি না; কিন্তু এখন সম্মুখে আমাদের কাজ হচ্ছে, প্রত্যেকে আপন আপন দলে জাতিতে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করা, আপন জাতিতে একতা স্থাপন করা। পেশোয়া বাজীরাও আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি যদি মারাঠাদের মধ্যে একতা এনে তাদের শক্তিশালী করে তুলতে পারি, তবে আপনাকে ধন্য মনে করব। তবে আমার আশা আছে, এক দিন শক্তির ক্ষেত্রে আমরা প্রেমে মিলব—

শঙ্কর স্তব্ধ হইলে মারাঠা যুবকগুলি তাহাকে আলিঙ্গন করিল। তার পর সকলে সকলকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া সভা শেষ হইল।

(১৮)

সভার শেষে শঙ্কর আসিয়া বাহিরে ভগ্নস্তূপের মধ্যে বসিল। সে যে কি করিবে তাহার একটা মীমাংসা হইয়া গেল বলিয়া তাহার মন শান্ত হইল।

কিন্তু আলি মহম্মদের মন আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে ঠিক করিয়াছিল, এ রাজনৈতিক জীবন ছাড়িয়া দিয়া, যমুনাকে লইয়া প্রেমের সংসার পাতিবে। কিন্তু সভায় শঙ্করের কথাগুলি শুনিয়া তাহার বীর সৈনিক পুরুষটি আবার জাগিয়া উঠিল, সে প্রেমিক মানুষটিকে দাবাইয়া রাখিল। দোটানায় পড়িয়া সে কি করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। ধীরে সে শিরিণের কাছে গেল।

দাদা, চলো!

কোথায় যাবো?

বাড়ী ফিরে চলো।

বাড়ী ত সব পুড়ে গেছে—

কিন্তু আমি যে সেই ছেলেমেয়ে দু'টিকে সেখানে রেখে এসেছি—

তুমি যাও বোন, আমি আর দিল্লী ফিরব না।

আজ দিল্লীর এ সবচেয়ে দুর্দ্দিনে তুমি তাকে ত্যাগ করবে!

তাহার কত সাধের কত স্বপ্নের দিল্লী, সেই দিল্লী অগ্নিদগ্ধ, দস্যুলুণ্ঠিত, নরকঙ্কালময় শ্মশান! আলির চোখে জল আসিল।

শিরিণ আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

আজ তোমাকে দিল্লীর সবচেয়ে দরকার—আজ তুমি তাকে ছেড়ে যেও না।

আর যে দিল্লীতে ফিরতে ইচ্ছে করে না বোন।

দাদা!

তাহার বিচলিত মনকে ঠিক করিবার জন্য আলি শিরিণের কাছ হইতে পলাইয়া যমুনার কাছে গেল।

যমুনা!

যমুনা ম্লান হাসিয়া তাহার দিকে চাহিল।

তোমার দাদাকে আমি বলেছি, তিনি মত দিয়েছেন।

কিন্তু আমার ত মত নেই।

কেন যমুনা?

তুমি আমায় ভুল বুঝো না। তুমি ত প্রতিজ্ঞা করেছ—চিরজীবন সন্ন্যাসী থাকবে—তোমার সে প্রতিজ্ঞা—

আমার সে জীবন ত্যাগ করব—

তুমি দেশকে ত্যাগ করবে—

হাঁ, তোমার জন্যে—

আমি তা করতে দেব না—

যমুনা, কেন আমায় বেদনা দিচ্ছ, তোমাকে যে ভালবাসি—

তোমার গুরুর কি আদেশ নয়—একমাত্র দেশকে তুমি ভালবাস—

যমুনা!

শোন আলি, তুমি আমার তরুণ প্রাণ জাগিয়েছ, তুমি আমায় প্রেমের স্বপ্নে ভুলিয়েছ, সে স্বপ্ন আমি ব্যর্থ হতে দেব না—তোমার জীবনের মহালক্ষ্য পথ হতে আমি তোমাকে বিচলিত হতে দেব না—

যমুনা!

তুমি আমার চিরজীবনের প্রিয় থাকবে—কিন্তু তোমার জীবনের ব্রত ত্যাগ করতে পারবে না।

দূরে দিল্লীর দিকে চাহিয়া, ধীরে যমুনার হাত ধরিয়া, আলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

শিরিণ কোথায়, চলো দাদার কাছে।

সকলে গিয়া শঙ্করের কাছে উপস্থিত হইল। আলি ধীরে বলিল—আমি ভেবে দেখলুম, আমার দিল্লীতে ফিরে যাওয়াই দরকার,—এ অরাজকতায় অশান্তি অত্যাচার আরও বাড়বে।

বেশ তাই যাও। আর যমুনা?

দাদা, আমি তোমার সঙ্গেই থাকব, আমি না থাকলে তোমায় দেখবে কে—

তাহলে তোমাদের মিলন—

সে মিলনও স্বপ্ন!

শিরিণের দিকে চাহিয়া শঙ্কর ধীরে বলিল—বোন, তোমার এই ভাইটিকে ভাল করে দেখো,—ভারতে আজ ওর মত বীরের দরকার।

শিরিণ বলিল—দেখব প্রভু, আশীর্ব্বাদ করুন, দাদা যেন জয়যুক্ত হন।

কিন্তু রাজশেখর কৈ?

এই যে আমি।

তুমি কোথা যাবে?

প্রভু—মাটির ঢেলা ছিলুম, যাঁর স্পর্শে মাণিক হয়েছি, সেই পুণ্যবতী সাধ্বীর সেবার কাজে আমি যাব। দিল্লীর মাতৃহারা অনাথ বালকবালিকাদের সেবার ভার আমার ওপর পড়েছে।

বেশ, বোন, এই ভাইটিকে আমি তোমায় দিলুম।

শিরিণ শঙ্করের পদধূলি লইল। তাহার বুক ক্ষণিকের জন্য দুলিয়া উঠিল। শঙ্কর আলি ও রাজশেখরকে প্রেম-আলিঙ্গন করিলেন। বিদায়ের পালা শেষ হইল।

সে রাতে শঙ্কর ঘুমাইল না। বাহিরে ভগ্নস্তূপের মধ্যে বসিয়া রহিল। গভীর রাতে অশ্রুসিক্ত স্বরে জামেলা আসিয়া বলিল—প্রভু, আমার প্রতি কি আদেশ?

কি আদেশ দেব জামেলা!

আমি কি করব, কোথায় যাবো?

যাও, দিল্লীতে ফিরে যাও, শিরিণের কাজে যোগ দাও।

আলি মহম্মদের কাছে!

পারবে না যেতে?

পারব!

জামেলা!

জামেলা ধীরে মাথা নত করিয়া পথের দিকে চলিল।

শোন জামেলা!

রাত্রের অন্ধকারে জামেলা কোথায় চলিয়া গেল, শঙ্কর খুঁজিয়া পাইল না। বহুক্ষণ ভগ্নস্তূপের মধ্যে ঘুরিয়া সে ভাঙা মসজিদের প্রাঙ্গণে বসিয়া আকাশের তারাদলের প্রতি চাহিয়া রহিল।

(১৯)

বাইশ বছর পরে।

পাণিপথের শেষ যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। হিন্দুর সাম্রাজ্য-স্বপ্ন চিরদিনের মত শেষ হইয়াছে। দুইলক্ষ সৈনিক-শবাকীর্ণ মৃত্যুর মত স্তব্ধ, পাণিপথের বৃহৎ যুদ্ধক্ষেত্রে তিনটি নারী ঘুরিয়া তাহাদের প্রিয়জনকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। এই বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রে কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব, তবু সমস্ত দিন অনাহারে তাহারা সমস্ত মাঠ প্রদক্ষিণ করিয়াছে। দুইজন হিন্দুর সাজপরা মৃতদেহ দেখিতেছে আর একজন মুসলমানের সাজ-পরা মৃতদেহ খুঁজিতেছে—একজন জামেলা, একজন শিরিণ, আর একজন যমুনা।

চলিতে চলিতে জামেলা থামিল,—করুণ চক্ষে ইঙ্গিত করিল। যমুনা তাহার পাশে টলিতে টলিতে আসিয়া দাঁড়াইল। পাশাপাশি দুইটি মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে,—একটি মারাঠা সেনাপতির সাজ-পরা, আর একটি রাজপুত সর্দ্দারের। আর তাহাদের সম্মুখে বাঙ্গালীর সাজপরা একটি মৃতদেহ। বেশ বোঝা যায় এ বাঙ্গালীটি পশ্চাতের দুই যোদ্ধাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রথমে প্রাণ দিয়াছে। সে রাজশেখর। তাহার পিছনে পাশাপাশি শঙ্কর ও আলি মহম্মদ মৃত ঘোড়ার ওপর স্থির পড়িয়া রহিয়াছে। শিরিণ যমুনার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। যমুনা একবার আলির রাজপুত সজ্জার দিকে, আর একবার শিরিণের মুখের দিকে চাহিল। বস্তুতঃ আলি মহম্মদ রোহিলার সর্দ্দার হইয়া মুসলমানের পক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল। তার পর শোনা গেল, আলি মহম্মদকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, সে তাহার সৈন্যদল ছাড়িয়া চলিয়া গেছে। যমুনা বুঝিল, সে হিন্দু সাজিয়া, তাহার দাদার পাশাপাশি হিন্দুর হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে।

আলির রক্তমাখা মুখের দিকে চাহিয়া যমুনা স্থির থাকিতে পারিল না,—সে এ বীর হিন্দুর সাজপরা দেহ আলিঙ্গন করিয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। জামেলাও শঙ্করের অসি-বিক্ষত মুখখানি চুল দিয়া মুছিয়া দিয়া, আর্ত্তনাদ করিয়া পাগলিনীর মত মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিল। শুধু শিরিণ রাজশেখরের মৃতদেহের পাশে স্থির নতজানু হইয়া বসিল। তাহার দুইচক্ষে অশ্রুর বান ডাকিয়া আসিল। পরম স্নেহের সহিত রাজশেখরের মুখের ওপর হাত বুলাইয়া, অশ্রুসিক্ত নয়নে চারিদিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিল। তার পর নমাজ পড়িতে লাগিল।

পাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্র অন্ধকার করিয়া ধীরে ধীরে সূর্য্য অস্ত গেল। ভারতের গৌরবসূর্য্য চিরদিনের মত অস্ত গেল।

শেষ

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

৭। শ্রীরাধিকাতত্ত্ব

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীশ্রীব্রজলীলার প্রামাণিক গ্রন্থ; কিন্তু ইহাতে শ্রীমতীর বা শ্রীরাধার কোন উল্লেখ নাই, ইহার কারণ কি? "প্রধানা গোপী" বলিতে কি শ্রীরাধাকে বোঝায়? যদি তাহাই হয়, তবে শ্রীরাধার নামের উল্লেখ না করার তাৎপর্য্য কি? শ্রীমতী বা শ্রীরাধার নাম প্রথমে কোন্ প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়—দয়া করিয়া কেহ জানাইলে বড় বাধিত হইব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৮। জ্যোতিষিক সমস্যা

প্রচলিত পঞ্জিকাতে রবিশুদ্ধি ও চন্দ্রশুদ্ধির শ্লোক দেওয়া হইয়া থাকে। রবিশুদ্ধির শ্লোক বলিতেছেন—

জন্মরাশেঃ শুভঃ সূর্য্যস্ত্রিষষ্ঠ দশলাভগঃ।
দ্বিপঞ্চ নবগোহপীষ্ট স্ত্রয়োদশ দিনাৎপরং ॥

চন্দ্রশুদ্ধির শ্লোকে লিখিত আছে—

সপ্তমোপচয়াদ্যস্থঃ শশী সর্ব্বত্র শোভনঃ।
শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়স্তু পঞ্চমোনবমস্তথা ॥

এই শ্লোক দুইটী কোন্ গ্রন্থের এবং কাহা কর্ত্তৃক লিখিত? বড় বড় পঞ্জিকার গণকের নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। কিন্তু কেহ উত্তর দেন নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন যে জানিয়া লিখিব। কিন্তু বৎসরাবধি অপেক্ষা করিয়াও তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারি নাই। মহাশয় এই দুইটী প্রশ্ন সংক্ষেপে লিখিয়া আপনার সম্পাদকের বৈঠকে উঠাইয়া দিলে বাধিত হইব।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

৯। রাজা-গণেশ

"রাজা গণেশের" কোন বিশদ ইতিবৃত্ত আছে কি না? ইনি দিনাজপুরের রাজা গণেশ। ইনি কিছুদিনের জন্য বাঙ্গলায় স্বাধীন নরপতি হন। ইঁহার পুত্র মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জলালউদ্দিন নাম গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করেন। সাধারণতঃ এইটুকু শুনা যায়। ইহার বৃত্তান্ত কিছু "বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস" নামক পুস্তকে বাহির হইয়াছিল। পুস্তক out of print। উক্ত পুস্তক ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে ইহার বিবরণ কিছু পাওয়া যায় কি না? রাজা গণেশ নামক উপন্যাস প্রণেতার পুস্তকে উহার ঐতিহাসিকতার মূল্য আছে কি না? যদি কেহ রাজা গণেশের সম্বন্ধে কিছু তথ্য প্রকাশ করেন তাহা হইলে তাঁহার নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ হইব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

১০। শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ

বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের কোন্ কোন্ প্রদেশে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ বাস করেন? তাঁহাদের আচার ব্যবহার কিরূপ? ভাস্করাচার্য্য, বরাহ, মিহির, খনা, শ্রীধরাচার্য্য, লীলাবতী—ইঁহারা শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ (আচার্য্য ব্রাহ্মণ) বংশ সম্ভূত; এ কথার অনুকূলে বা প্রতিকূলে কি কি ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক যুক্তি আছে? উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর পাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীদীনবন্ধু আচার্য্য

১১। পুরাতন তাম্র-মুদ্রা

একটি পুরাতন তাম্র মুদ্রা পাইয়াছি, তাহাতে দেবনাগরি অক্ষরে একদিকে লেখা আছে—"পাব" "আণাংস" '১৯৪৩'। অপর দিকে একটি উপবিষ্টা গাভী; তাহার চতুর্দ্দিকে লেখা "শ্রীমৎ মহারাজ...... ...সরকার, ইদোর'। মহারাজের নামটা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট, পড়িতে পারা যায় নাই। সুধীবৃন্দের প্রতি অনুনয় এই যে দয়া করিয়া কেহ যদি ১৯৪৩ আণাংসে ইদোরে কে রাজা ছিল, এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করেন, বড়ই উপকৃত হইব। আমরা জানি ইদোরের রাজার উপাধি "হোলকার" তবে 'সরকার' লেখা থাকারই বা কারণ কি?

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীশ্রীপদ ভট্টাচার্য্য

১২। বরিশাল গান্

আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে ঘন বর্ষার ক্ষণিক অবসরে, বাকরগঞ্জ জেলার প্রায় সর্ব্বত্র এক রকম গুড়ুম গুড়ুম কামানের আওয়াজের মত শব্দ শুনা যায়, ইহাকে "বরিশাল গান্" বলে। এইরূপ শব্দ হওয়ার কোন প্রাকৃতিক কারণ আছে কি?

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

১৩। বৈয়াকরণিক সমস্যা

যস্তব্যাকরণে বরেণ্য-ঘটনাস্ফীতাঃ প্রবন্ধাদশ
প্রখ্যাতানববৈদ্য কেহপি তিথিনির্দ্ধারার্থমেকোহদ্ভূতঃ।
সাহিত্যে ত্রয়এব ভাগবততত্ত্বোক্তৌত্রয়স্তস্যভূ—
-ব্যন্তর্ব্বাণিশিরোমণেরিহগুণাঃকে কেন লোকান্তরাঃ ॥
(মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ শেষে বোপদেব প্রশংসা শ্লোক)

উপরিউক্ত শ্লোকটীর ঐতিহাসিক বিবরণ সহ ফলিতার্থ কি?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত কবিরত্ন কবিরাজ

উত্তর

ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র

বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক সঙ্গীতকল্পতরু শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বহু হস্তলিখিত সঙ্গীতগ্রন্থ আছে। ১৩ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট অথবা ১৭ নং লালমাধব মুখোপাধ্যায়ের লেনে (জোড়াসাঁকো) শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করিলে বিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যাইবে।

চশমার ব্যবহার

আজকাল ছেলেদের ভিতর অতিরিক্ত চশমার ব্যবহারের কারণ এই ঃ—

(১) শারীরিক ব্যায়াম ও ব্রহ্মচর্য্যের অভাব।

(২) ছোট ছোট অক্ষরে লিখিত পুস্তকপাঠ।

(৩) বাবুয়ানী ও বিলাসিতা।

(৪) ছাতা ব্যবহার না করা।

(৫) বিশুদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব।

(৬) পুকুরের শামুক গুগ্‌লির ঝোল না খাওয়া।

(৭) পায়ের বুড়া আঙ্গুলের নখে সরিষার তৈল না দেওয়া।

শ্রীউমাকান্ত পাল

ভুয়ো কাঁঠাল

"বীজ হইতে কাঁঠাল গাছ হইলে সেই গাছের ফল ভুয়ো হয়" বলিয়া একটী প্রবাদ আছে, কিন্তু তাহা সত্য নহে। কারণ বেশীর ভাগ কাঁঠাল গাছই বীজ হইতে হয় এবং তাহাতে ভালই ফল হয়। কিন্তু জমী ভাল না হইলে বীজের গাছ কেন কলমের গাছেও ভাল ফল হয় না, এমন কি অনেক সময় মোটেই হয় না।

শ্রীকরুণা সরকার
শ্রীরণজিৎলাল কর

ইষ্টক

ইষ্টক বা ইট বলিলে সাধারণতঃ রক্তবর্ণ আয়াত ক্ষেত্রাকার মৃন্ময় জিনিস বুঝায়। এই ইট হইতে গৃহ নির্ম্মিত হয়, তাহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু সেই ইট কিরূপ মাটীতে তৈয়ারী করিলে ভাল হয়. ইট ভাল কি মন্দ কিরূপে চেনা যায়, ইত্যাদি তথ্য আমরা অনেকেই জানি না। দেওয়াল তৈয়ারী সম্বন্ধেও অনেক বিষয় জানিবার আছে। তাহা সম্প্রতি স্থগিত রাখিয়া এই সাধারণ ইট সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মাটী নির্ণয়—মাটী সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(১) বেলে, যাহাতে বালির ভাগ বেশী। (২) এঁটেল, যাহাতে আঁটা মত জিনিষের ভাগ বেশী এবং (৩) দোআঁশা, যাহাতে সকল জিনিস সমভাগে আছে। এই শেষোক্ত মাটীই ইঁট তৈয়ারী কার্য্যে প্রশস্ত। কারণ বেলে মাটীর ইট পোড়াইলে শক্ত না হইয়া ফাটিয়া যায় ; আর এঁটেল মাটীর ইট কাঁচাতেই ফাটিয়া যায়। পলি পড়া মাটীতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইট হয়।

রং নির্ণয়—দেশী ইটের রং সাধারণতঃ তিনপ্রকার হইয়া থাকে যথা (১) পিঙ্গল বর্ণ (২) রক্তবর্ণ (৩) কৃষ্ণবর্ণ। ভাটার নীচের ইট কম উত্তাপ হেতু ভাল পোড়ে না, কাজেই পিঙ্গলবর্ণ হয় এবং উপরের ইট তাপের আধিক্য বশতঃ অনেক সময় পুড়িয়া ঝামা হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হয়। এতদুভয়ের মধ্যে কোনটীই কার্য্যোপযোগী নয়। রক্তবর্ণ ইট উৎকৃষ্ট।

পরীক্ষা—ভাল ইট চ নতে হইলে কেবল রং ব্যতীত আরও দুইটী উপায় আছে। (১) একখানি ইটকে আর একখানি ইটের দ্বারা ঘা দিলে যদি খং খং (metallic) শব্দ উঠে, তবেই বুঝিতে হইবে সেইটী ভাল ইট। (২) দুই খানি ইট পৃথক ভাবে ওজন করিয়া ঘণ্টা কয়েক জলে ডুবাইয়া রাখিয়া পুনরায় তদ্রূপ ওজন করিলে, যাহার ওজন কম হইবে সেই ইট ভাল বুঝিতে হইবে। অন্যটী বহুছিদ্রযুক্ত (Porous)।

প্রতীকার—তৈয়ারী করিবার সময় ছাঁচে উত্তমরূপে গাদিলে ইট তত Porous হয় না। ভিতর নিরেট হয়।

মসৃণ ইট—আমাদের এই সাধারণ ইট খসখসে (Rough)। কিন্তু এক প্রকার ইট আছে যাহার চতুঃপার্শ্ব বেশ মসৃণ (Polished)। ইহাকে Wirecut ইট বলে। এই ইট রাণীগঞ্জে তৈয়ারী হয় বলিয়া অনেকে ইহাকে রাণীগঞ্জ ইটও বলে। কারুকার্য্যের জন্য (decoration) এই ইট বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রকার ভেদে এই তো গেল সাধারণ ইটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কিন্তু অনেকে হয় তো জানেন না যে, এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকারের ইট আছে, যাহা মৃত্তিকা ব্যতীত অন্য উপাদানে গঠিত হয় এবং পোড়াইলে সাদা থাকে। ইহাদের নাম (১) চূণবালি ইট (Sand-lime Brick). (২) ফায়ার ইট (Fire Brick) ও (৩) সিলিকা ইট (Silica Brick)।

চূণবালি ইট—চূণ ও বালি একত্রে মিশ্রিত করিয়া চাকিতে (Grinding mill) পিষিয়া এই ইট তৈয়ারী হয়। ইহা অপেক্ষাকৃত মূল্যবান ও স্থায়ী।

ফায়ার ব্রিক—একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর মাটীর নীচে পাওয়া যায়। ইহাকে ফায়ার ক্লে (Fire Clay) বলে। ইহা সাধারণ প্রস্তরের ন্যায় শক্ত নয়। বৃষ্টির জলে কিয়দংশ গলিয়া পাঁকের মত দৃষ্ট হয়। বরাকর অঞ্চলে এই প্রকার প্রস্তর প্রচুর আছে শুনিয়াছি। এই প্রস্তর চাকিতে পিষিয়া বস্তাবন্দী করিয়া (Fire clay dust) ফায়ার ক্লে গুঁড়া বলিয়া বিক্রীত হয়। এই গুঁড়া জল সংযোগে কাদা তৈয়ারী করিয়া ইট প্রস্তুত করা হয়। দুই প্রকারে এই শ্রেণীর ইট প্রস্তুত করা হইয়া থাকে (১) হাতে ফর্ম্মার সাহায্যে (Hand-mould) এবং (২) Pressed কলের সাহায্যে লোহার ছাঁচে চাপিয়া। শেষোক্ত ইট সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। এই উভয় বিধ ইটই ভাটায় পোড়ান হয়। তবে এ ভাটা আমাদের সাধারণ ইট পোড়ান ভাটা হইতে স্বতন্ত্র। মাটীর ইট পোড়াইতে হইলে কয়লা ও ইট স্তরে স্তরে সাজান হয়, পরে উপরে মাটী লেপিয়া দেওয়া হয় ; কিন্তু এই পাথরের ইট পোড়াইবার জন্য ইটের তৈয়ারী ভাটা স্থায়ী ভাবে প্রস্তুত থাকে। ইট ও কয়লার সংস্পর্শ হয় না। চতুঃপার্শ্বের চুলা (Fire place) সংযুক্ত থাকে। ভাটার নীচে জালি (Flue) থাকে এবং ঐ ফ্লু একটী উচ্চ বিউনীর সহিত সংযুক্ত থাকে। চুলোর আগুনের তাপ ইটের স্তরের মধ্য দিয়া জালি হইয়া বিউনী পথে নিষ্ক্রান্ত হয়।

আকৃতি—সাধারণতঃ আমরা আয়াত ক্ষেত্রাকার ইটই দেখিয়াছি।

কিন্তু এই ইট, জ্যামিতিতে যত প্রকারের ক্ষেত্র আছে, সেই সর্ব্ব-প্রকারেরই হইয়া থাকে। এই সব ইট ষ্টিল ফার্ণিস, ব্লাষ্ট ফার্ণিস ও কোক্‌ওভেন্স ফার্ণিসে ব্যবহৃত হয়। ইহার বিশেষ আলোচনা সম্প্রতি করা নিষ্প্রয়োজন।

সিলিকাইট—এই ইট একপ্রকার শ্বেতবর্ণ প্রস্তর হইতে তৈয়ারী হয়। ইহা খুব শক্ত। ভাঙ্গিলে ভিতরে নীলাভ একপ্রকার জিনিষ দেখা যায়। (Crusher machine) চূর্ণ করা যন্ত্রে প্রথমতঃ এই পাথরকে টুকরা টুকরা করা হয়। পরে চাকিতে (Grinding mill) পিষিয়া চূর্ণ করা হয়। তার পর লোহার চালনিতে চালা হয়। তৎপর পুনরায় চাকিতে চূণ ও জলের সহিত উত্তমরূপে পেষাই করা হয়। তাহার পর পগ্‌ মিলে নাড়াচাড়া করিলে তবে কতকটা কাদার মত মোলায়েম হয়। ইহা হইতেও পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারে (Hand-mould) ও (Pressed) ইট প্রস্তুত করা হয় এবং উক্তরূপ ভাটায় পোড়ান হয়। কিন্তু এই শ্রেণীর ইট হাতের ফর্ম্মাতেই ভাল হয়।

ম্যাগ্নিসাইট—উক্ত দুইপ্রকার ব্যতীত আর একপ্রকার ইট আছে। তাহাকে ম্যাগ্নিসাইট ইট (magnisite) বলে। ইহা ঘুটিংএর ন্যায় একপ্রকার শ্বেত প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়। এই পাথর প্রথমতঃ পোড়ান হয়। তখন ইহা চূণের মত সাদা ও শিথিল দেখায়। তাহা হইতে ইট প্রস্তুত করিয়া ভাটায় পোড়ান হয়। সেই ইট আবার চূর্ণ করিয়া কাদা প্রস্তুত করিয়া আরও কয়েকটী জিনিসের সংমিশ্রণে ইট প্রস্তুত হয়। তৎপর অতি যত্নে ইহাকে পোড়ান হয়। এই ইট দেখিতে কতকটা লাল ও কালর মাঝামাঝি রং। ইহাকে ইটের রাজা বলা চলে। কারণ, ওজন, মূল্য ও কার্য্যকারিতা সকল বিষয়েই ইহা শ্রেষ্ঠ।

ইট ও উত্তাপ—শেষোক্ত তিন প্রকারের অর্থাৎ ফায়ার, সিলিকা এবং ম্যাগ্নিসাইট ইট প্রচণ্ড আগুনের তাপ সহ্য করিতে পারে। অন্য ইট অগ্নিসংযোগে ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ষ্টিল ফার্ণিসের প্রধান জিনিস গ্যাস (কার্ব্বনমনক্‌সাইড C.O.) এবং বায়ু। এই গ্যাস, প্রোডিউসার (Producer) হইতে যতই ফার্ণিসের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই উত্তপ্ত হয়। ক্রমশঃ ফার্ণিসের মধ্যস্থলে (Bed) ইহার উত্তাপ সর্ব্বোচ্চ হয়। সুতরাং এই ফার্ণিসের বিভিন্ন স্থানের জন্য তাপ সহনের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ইট আবশ্যক হয়। লোহা সম্পূর্ণরূপে গলিলে তাহার উত্তাপ (1500°C.) ১৫০০ ডিক্রী সেণ্টিগ্রেড বা ২৭০০ ডিগ্রী ফারেনহীট (2700°F) হয় (melting point of Fe)। সুতরাং মধ্যস্থলে যতদূর পর্য্যন্ত লোহা পৌঁছে ততদূর পর্য্যন্ত ম্যাগ্নিসাইট দিতে হয়।

বৈরীভাব—বৈরীভাব চিরদিনই নর জগতে আছে। কিন্তু জড়ের মধ্যেও যে বৈরীভাব আছে, তাহা আমরা সকলে জানি না। সিলিকা ও ম্যাগ্নিসাইট পরস্পর চিরশত্রু।

উপসংহার—যদি এ শুষ্ক বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কাহারও কৌতূহল জন্মে, তবে কিরূপে উহাদের শত্রুতা বুঝা যায় এবং তাহার প্রতীকার কি, অতঃপর গাথনি ও আকৃতি বিভাগ সহ সানন্দে তাহা জানাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীহরিসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

শিরিশের কারখানা

কিছুদিন যাবৎ মান্দ্রাজ প্রদেশের Department of Industries-এর তত্ত্বাবধানে শিং ক্ষুর নখ চুল প্রভৃতি জান্তব পদার্থ (অথবা অপদার্থ) হইতে শিরিশের আঠা প্রস্তুত বিষয়ক গবেষণা হইতেছিল। এই পরীক্ষার ফলে Madras Glue Factory স্থাপিত হইয়াছে, এবং উহাকে রীতিমত ব্যবসায়ে পরিণত করা হইয়াছে। উক্ত কারখানায় এখন প্রচুর পরিমাণে নানারূপ শিরিশ তৈয়ারী হইতেছে। এতৎ সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্যের জন্য Director of Industries, Madras এই ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

শিরিশ প্রস্তুত প্রণালী

শিরিশ তৈয়ারীর কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে। পরিত্যক্ত হাড়, শিং, প্রভৃতি লইয়া drumএর মত লৌহ পাত্রে কিয়ৎ পরিমাণ জল দিয়া ভিজাও। তার পর উহাকে উষ্ণ জলীয় বাষ্প দ্বারা ফুটাও। বহুক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ হইলে যে ক্বাথ নির্গত হইবে, তাহা কটাহের তলদেশস্থিত ছিদ্র দিয়া বাহির করিয়া লও। ঐ জলে শিরিশ দ্রবীভূত হইয়া আসিবে ; কিন্তু চর্ব্বি ভাসিয়া থাকিবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া উপর হইতে চর্ব্বিগুলি ছাঁকিয়া তুলিয়া লও। অবশিষ্ট ক্বাথটুকু একটী কাঠের ছাঁচে ঢাল (উহা প্রথমে একটুক্‌রা ভিজা কাপড় দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া লইতে হইবে, নচেৎ শিরিশ আটকাইয়া যাইবে)। কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে উহা জমিয়া যাইবে। তখন বাহির করিয়া লইয়া চৌকা চৌকা করিয়া কাট। টুকরাগুলি একটী তারের জালের উপর করিয়া একটী dry chamber রাখ, এবং উহার মধ্যে গরম হাওয়া পরিচালনা কর। এইরূপে শুষ্ক হইলে যদি মেচেতা পড়ে, তবে পুনরায় ঘষিয়া ধুইয়া উপরিউক্ত উপায়ে শুষ্ক কর।

শিরিশ প্রস্তুত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। উহার জন্য অনেক সাজসরঞ্জাম আবশ্যক। তবে উহার সহিত Gelatine ও Size করিতে পারিলে বেশ লাভ জনক বটে।

যাঁহারা পাঁঠার ঠ্যাং হইতে টেংরীর যুষ বাহির করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকটা আভাস পাইবেন। কারণ উহা এক প্রকার Gelatine ভিন্ন আর কিছুই নয়।

শ্রীজীবনতারা হালদার

অবগুণ্ঠন

মহাকবি কালিদাসেব অভিজ্ঞান শকুন্তলা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দুষ্মন্ত রাজার সময় হইতে বা তৎপূর্ব্ব হইতে এদেশে নারীদিগের অবগুণ্ঠন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। অন্তঃসত্ত্বা শাপগ্রস্তা শকুন্তলা রাজ সভায় আগমন করিলে রাজা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেয়মবগুণ্ঠনবতী ধৃতপরিস্ফুট শরীর লাবণ্যা" ইত্যাদি। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই সময়

অবগুণ্ঠন প্রথা প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত কাব্য পরীক্ষার প্রশ্নেও এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ডাক্তার—শ্রীরাজেন্দ্রকুমার সেন, বিদ্যাভূষণ, ভিষকরত্ন, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রী

আগুনে পোড়ার প্রতিকার

বৈশাখের ভারতবর্ষে শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবী জানিতে চাহিয়াছেন—'আগুনে পুড়ে গায়ের চামড়া সাদা ও জড়ানো ভাব হইলে তাহা সহজে ও শীঘ্র কিরূপে পূর্ব্বের মত স্বাভাবিক হয়।'

আগুনে পুড়ে গিয়ে গায়ের চামড়া সাদা হইলে তাতে কাঁচা তিন্দুকের রস দিনে ৩।৪ বার করে প্রলেপ দিলে কিম্বা কেশরাজ পাতার রস দিলে চামড়ার বর্ণ স্বাভাবিক হয়। তিন্দুককে সাধারণ ভাষায় গাব বলে। বুচ্‌কী দানাও (বেনের দোকানে পাওয়া যায়) দৈয়ের সঙ্গে বেটে দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে ভাল হয়। টক জিনিস ভিন্ন বুচ্‌কীদানা প্রয়োগে গা জালা করে।

পুড়ে গেলে যে মাংস তন্তর (muscular tissue) জড়ানো ভাব হয়, সেগুলোকে আবার স্বাভাবিক হতে দেখা যায় না। তবে কোন ক্ষার (Soda-like substance) দিয়ে কিম্বা Acid দিয়ে পুড়িয়ে আয়ুর্ব্বেদীয় সোমরাজ তৈল প্রয়োগে উপকার দর্শিতে পারে। তবে সেটা Experiment করার উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা ভাল।

উপরে যে ঔষধগুলির কথা বলা হলো সবই সহজ প্রাপ্য।

শ্রীসরোজকুমার মহলানবিশ

সিংহলের ভূগোল

Ceylon বা সিংহলের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত এবং অন্যান্য বিবরণ—Jack's Reference B:ok for home & office An Encyclopaedia BY T. C. & G. C. Jack, LTD, London. নামক পুস্তকে Page 869তে পাইবেন। শ্রীকালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর তিরোভাব

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বিষয়ক যে সকল পুরাতন ও আধুনিক গ্রন্থ সাধারণতঃ সমাজে পঠিত ও আলোচিত হয়, তন্মধ্যে প্রায় সকল গুলিতেই তাঁহার বিগ্রহ-দেহে বিলীন হইয়া যাইবার কথাই বর্ণিত হইয়াছে;—কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল নামক একখানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে যে একদিন কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রভুর পদ ইষ্টক-বিদ্ধ হয়। সেই ইষ্টক-বিদ্ধ স্থানের যন্ত্রণা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি শয্যাশায়ী হন এবং দুই দিন পরে ইহলোক ত্যাগ করেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য তৃতীয় সংস্করণ পৃঃ ৩৪২) কিন্তু গোঁড়া বৈষ্ণব সমাজে এই মত গৃহীত হয় নাই এবং সাধারণে ঐ গ্রন্থের বহুল প্রচার এবং আলোচনা না হওয়ায় উহার মতও অনেকের অজ্ঞাত এবং সর্ব্ববাদিসম্মত নয়। শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ রায়

ভারতে অবগুণ্ঠন-প্রথা

ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের অবগুণ্ঠন-প্রথা বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। পূর্ব্বকালে ভারতরমণীগণ যুগল বস্ত্র পরিধান করিতেন। একখানি বস্ত্রের দ্বারা দেহের সর্ব্বাংশ আবৃত থাকিত, অপরটী উত্তরীয় রূপে ব্যবহৃত হইত। এই যুগল বস্ত্রের উল্লেখ প্রাচীন পুস্তকে বহু স্থানে পাওয়া যায়। মহাভারতে দুঃশাসন যখন বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে, তখন দ্রৌপদী বলিয়াছিলেন, "আমি রজস্বলা হইয়াছি; একমাত্র বসন ধারণ করিয়াছি; এ অবস্থায় আমাকে সভায় লইয়া যাওয়া উচিত নহে।" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দেখা যায়, শঙ্খচূড় তুলসীকে যুগ্মবস্ত্র প্রদান করিতেছেন। ঐ পুস্তকে আরও অনেক স্থলে অভিলষিতা রমণীকে যুগ্মবস্ত্র প্রদানের উল্লেখ আছে। রামায়ণে যখন রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া যাইতেছিল, তখন সীতা পথে কয়েকটী বানরকে দেখিয়া স্বীয় উত্তরীয়খানি তাহাদিগের নিকট নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই যুগ্মবস্ত্রের একখানি দ্বারা অবগুণ্ঠনকার্য্য সাধিত হইত। রামায়ণে মন্দোদরী রাবণের মৃতদেহ লইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন "আমি অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া নগরদ্বার হইতে নির্গত হইয়া পদব্রজেই এস্থানে আসিয়াছি দেখিয়াও কেন ক্রুদ্ধ হইতেছ না? হা দারপ্রিয়! এই দেখ, তোমার দারগণ লজ্জা ও অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করত বহির্দেশে আগমন করিয়াছে...।" এখানে অবগুণ্ঠনের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শঙ্খচূড় তুলসীর দিকে অগ্রসর হইলে তুলসী মুখ আবৃত করিয়াছিল,—

"সা দৃষ্ট্বা সন্নিধানে তং মুখমাচ্ছাদ্য বসনা।
সস্মিতা তং নিরীক্ষন্তী সকটাক্ষং পুনঃপুনঃ॥"

উভয়ে বিবাহ হইয়া গেলে,

"স চ তাঞ্চ সমাকৃষ্য চকার বক্ষসি প্রিয়াম্।
সস্মিতং বসনাচ্ছন্নং দদর্শ মুখপঙ্কজম্॥"

এই একই পুস্তকে দেখা যায়—তিলোত্তমা বলিপুত্রকে দেখিয়া বস্ত্রের দ্বারা মুখ ঢাকাইয়াছিল। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকেও অবগুণ্ঠনের উল্লেখ আছে। ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব অনুমান করেন খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই নাটকখানি লিখিত হইয়াছিল।

কেকয়

কেকয় দেশ কোথায় ছিল, তাহা সুনিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। কেহ Cacasiaর নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশকে, কেহবা পাঞ্জাবে বিপাশার উত্তর তীরস্থ কাংড়া প্রদেশকে কেকয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বাবু সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁহার Students' Bengali English Dictionaryতে কেকয় দেশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "A Mountaineous tract on the west of the Bipasa (the Beas) in the Punjab." কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে পাঞ্জাবের কোন স্থান বা কাংড়া প্রদেশ কেকয় হইতে পারে না। বিপাশা নদী উত্তীর্ণ হইয়া অযোধ্যাপ্রেরিত দূতসকল কেকয় দেশে উপস্থিত হইয়াছিল, এইরূপ রামায়ণে উল্লিখিত থাকায় অনেকেই পাঞ্জাবের বিপাশা তীরস্থ স্থানকে কেকয় বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। একই নামের একাধিক নদীর বা নগরের অভাব নাই। অর্জ্জুন দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইয়া কাশ্মীর প্রদেশ অধিকার করিয়া সুধাদেশ জয় করেন—এ দিকে আবার ভীম পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া বিদেহ প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া সুধা জয় করেন। এখানে দুইটী সুধার অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। সেইরূপ দুইটী গিরিব্রজপুর ছিল। একটী মগধের গিরিব্রজপুর, আর একটী রামায়ণে উল্লিখিত কেকয় দেশের রাজধানী গিরিব্রজপুর। বিপাশা নদীও দুইটী ছিল বলিয়া বোধ হয়, কেন না রামায়ণে উল্লিখিত বিপাশা পাঞ্জাবের বিপাশা হইতে পারে না। দূতগণ বাহ্লীক দেশ অতিক্রম করিয়া বহু স্থান দিয়া গমন করিয়া পরে বিপাশা উত্তীর্ণ হয়। এই বাহ্লীক দেশ কোথায়? সকলেই স্বীকার করেন, বর্ত্তমান Balkh বা প্রাচীন Bacteriaই বাহ্লীক দেশ। সুবলবাবুও তাঁহার অভিধানে বাহ্লীক দেশকে "The Country Balkh" বলিয়াছেন। কোথায় Balkh, আর কোথায় বিপাশা! আরও দুই একটী বিষয় হইতে Balkhকেই বাহ্লীক বলিয়া বোধ হয়। অর্জ্জুনের বিজয়-যাত্রায় দেখা যায়, তিনি কয়েকটী স্থান অধিকার করিয়া শাকল দ্বীপ ও বিন্ধ্য ভূধরের সন্নিহিত ভূপতিদিগকে জয় করেন। তৎপরে তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের ভগদত্তকে পরাজিত করিয়া উত্তর দিকে গমন করেন ও অন্তর্গিরি, বহির্গিরি প্রভৃতি স্থান হস্তগত করেন। বামনপুরাণে দেখা যায় অঙ্গ, বঙ্গ, প্রভৃতি এই অন্তর্গিরি, বহির্গিরির অন্তর্গত। অর্জ্জুন ক্রমে উত্তর দিকস্থ প্রদেশসকল জয় করিতে করিতে কাশ্মীরে আসিয়া উপস্থিত হন। অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়ের এই direction লক্ষ্য করিয়া আমরা যখন মহাভারতে পাঠ করি, তিনি কাশ্মীর জয় করিবার পর সুধা ও সুমালা নাম্নী নগরী মর্দ্দিত করিয়া বাহ্লীক দেশ জয় করেন, তখন আমাদের মনে হয়, কাশ্মীরের কিছু পশ্চিমে বাহ্লীক দেশ; এবং তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা এই Balkh দেশে আসিয়া পড়ি। রামায়ণে দেখা যায়, ইক্ষুমতীর পর বাহ্লীক দেশ। Oxus নদীকে ইক্ষুমতী মনে করিলে Balkhই বাহ্লীক। বামনপুরাণে সিন্ধু, গান্ধার, যবনের সহিত কেকয় দেশকে পশ্চিমস্থ বলা হইয়াছে। বিপাশা তীরস্থ কাংড়াকে পশ্চিম বলা যায় না। ঐ পুরাণে আরও বলা হইয়াছে যে, বাহ্লীক, কৌশিক, পাঞ্চাল, শক, বর্ব্বর, অঙ্গ, বঙ্গ, প্রভৃতি মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত। এই দেশ বিভাগ হইতে মনে হয়, পুরাণকার হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যস্থ সমস্ত দেশকে এক সাধারণ মধ্যপ্রদেশ বলিয়াছেন। কেকয় যদি পশ্চিমস্থ দেশ হয় এবং Balkh বা বাহ্লীক মধ্যপ্রদেশস্থ হয়, তাহা হইলে Caucasiaকে কেকয় মনে করিতে পারা যায়। শ্রীগোকুলবিহারী দাস

ভুয়ো কাঁঠাল

বীজ হইতে যে কাঁঠালগাছ উৎপন্ন হয়, তাহার ফল ভুয়ো হয় না। এর প্রমাণ আমি অনেক ক্ষেত্রে পেয়েছি। ফল ভূয়ো হওয়া প্রবাদটি মিথ্যা।

দৃষ্টিশক্তি

আজকাল এত অল্প বয়সে ছেলেমেয়েদের চোখের দোষ নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ যাহা চোখ খারাপ দেখি তাহা চক্ষুগোলকের আবরণের অযথা হ্রাসবৃদ্ধির ফলে ঘটে; স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের জন্য নয়।

পুষ্টির অভাব—গরীব লোকের ছেলেমেয়েদের ত কথাই নাই, বড়লোকের ছেলেমেয়েদেরও পুষ্টির অভাব হইয়া থাকে, কারণ তাহারা যে পরিমাণে পানাহার করিয়া থাকে, তাহা পরিশ্রমের অভাবে ও অতি-প্রাচুর্য্যের জন্য পরিপাক করিতে পারে না, এবং তাহা অব্যবহার্য্য অবস্থায় শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়; অধিকন্তু দৈহিক শক্তি হ্রাস করিয়া দেয়।

বংশ পরম্পরাগত দৃষ্টি দোষ—দেখা যায়, যা'র বাপঠাকুরদাদার চোখ খারাপ, তাহারও সাধারণতঃ চোখ খারাপ হইয়া থাকে।

চক্ষুর অব্যবহারের জন্য দৃষ্টিশক্তির হ্রাস। এটি সাধারণতঃ সহরে হইয়া থাকে। সহরে আমরা যে দিকেই চাই, প্রায় সেই দিকেই ঘর বাড়ীতে আমাদের দৃষ্টি বাধা প্রাপ্ত হয়; দূরে দেখিবার অবসর পায় না। তাহাতে আমাদের দূরে দেখিবার ক্ষমতা কমে যায়। চক্ষের সহজ অবস্থায় আমরা দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাই; সহরে থাকিতে হইলে প্রায় সব সময়েই সেই সহজ অবস্থাকে অসহজ অবস্থায় আনিতে হয়; সুতরাং ক্রমে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইয়া পড়ে। গ্রাম্যজীবনে এটি ঘটিতে পারে না।

সহরে অতিমাত্রায় ধূলাবালি প্রভৃতি ময়লা চক্ষে নিক্ষিপ্ত হইয়া দৃষ্টিশক্তি হ্রাস করে। গ্রামে সাধারণতঃ এটি হয় না।

ইন্দ্রিয়ের কুব্যবহার।

চক্ষের তৃপ্তিদায়ক বর্ণের অভাবও দৃষ্টিহানিকর, যদিও তাহা অতি অল্পমাত্রায়।

শ্রীরণজিৎলাল কর

পাঁচু পরামাণিক

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী

পর পর চারিটী সন্তান নষ্ট হইবার পর পঞ্চমবারে নারাণ পরামাণিক গ্রাম্য দেবতা পঞ্চানন ঠাকুরের অনেক পূজা মানত করিয়া একটী পুত্র লাভ করিল। ৮ পঞ্চাননের কৃপায় এবার তাহার স্ত্রীর কোল-আলো-করা নবীন অতিথি তাহাদের দুঃখের সংসারে সুখের আলোক জ্বালিল। ছয় মাসে শিশুর মুখে ভাত দিয়া নায়াণ পুত্রের নাম রাখিল পঞ্চানন। শিশুর হাসি খেলায়, স্বামী-স্ত্রীর বিপুল আনন্দে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। নারাণ পুত্রের হাতে খড়ি দিয়া গ্রামের পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিল। পাঠশালায় পঞ্চানন শীঘ্রই মেধাবী বলিয়া বেশ সুনাম অর্জ্জন করিল; এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও ধারাপাত শেষ করিল.। এইবার নারাণ তাহাদের বংশানুসৃত প্রথামত পাঠশালা ছাড়াইয়া তাহাকে তাহার নিজের কার্য্যে দীক্ষিত করিবে স্থির করিল; সেও পঞ্চাননের মত ৬।৭ বৎসর বয়সে দ্বিতীয় ভাগ ও ধারাপাত শেষ করিয়া, তাহার পিতার নিকট কাঁচি ধরিতে শিখিয়াছিল। নারাণের মনোভাব অবগত হইয়া পাঠশালার বৃদ্ধ গুরু মহাশয় এক দিন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ত্যাখ্ নারাণ, তোর এই ছেলেটা দেখতে শুনতেও যেমন, পড়াশুনায়ও তেমনি। ওকে এর মধ্যে তোর কাঁচি ধরা বিদ্যে শেখাস নে। এই বয়সে ও যে রকম বুদ্ধিমান হয়েছে, আমার মনে হয়, ওর ভাল হবে। আমার ইচ্ছে, ওকে লেখা পড়া শেখা।" প্রত্যুত্তরে নারাণ বলিল, "তুমি ত বলছো ঠাকুর, কিন্তু যতই হোক নাপতের ছেলে ত।" গুরুমহাশয়—"তা হলই বা, নাপিতের ছেলে কি মানুষের ছেলে নয়! তোর ওসব পাগলামী ছেড়ে দে,—আমি কিছুতেই ওকে পাঠশালা ছাড়াতে দেব না।" পুত্রের সুখ্যাতিতে পিতার হৃদয় উৎফুল্ল হইল। গুরুমহাশয়ের কথা অমান্য করা দূরের কথা—নারাণ তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল, "তাই হ'ক ঠাকুর, পাঁচুকে তোমার হাতেই দিলাম। তোমার আশীর্ব্বাদে ও যদি মানুষ হতে পারে ত চোদ্দ পুরুষের মুখ উজ্জ্বল হবে।" বলিতে বলিতে নারাণের চোখের কোণ ভিজিয়া উঠিল।

পঞ্চাননকে আর কাঁচি ধরিতে হইল না; সে পাঠেই রত রহিল। গুরুমহাশয়ের চেষ্টা ও যত্নে পঞ্চানন অতি অল্পকালের মধ্যেই সুখ্যাতির সহিত পাঠশালার পড়া সাঙ্গ করিয়া গ্রামের মধ্যইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইল। মেধাবী ছাত্র দেখিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে বিনা বেতনে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। পঞ্চাননের পড়ার জন্য নারাণকে এক পয়সা খরচ করিতে হইল না। দেখিতে দেখিতে চার বৎসর কাটিয়া গেল, পঞ্চানন মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইল। নারাণের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। গুরু-মহাশয় তাঁহার ভবিষ্যদ্‌বাণী কতকটা সফল হইয়াছে দেখিয়া, এক দিন নারাণকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখলি রে নারাণ, আমার কথা ফল্‌ল কি না! আর তুই আহাম্মক কি না ঐ ছেলের মাথাটা খেতে বসেছিলি। খুঁজে বের কর দেখি গ্রামের মধ্যে পাঁচুর মত একটা ছেলে!" নারাণ আনন্দাতিশয্যে শুধু মাথা নীচু করিয়া রহিল।

মাইনর পাস করিয়া পঞ্চানন উচ্চ ইংরাজী স্কুলে পড়িবে স্থির হইল। তাহাতে নারাণের স্ত্রী ঘোর আপত্তি তুলিয়া বলিল, "আর কেন, নাপতের ছেলের আর লেখাপড়ার দরকার কি! ঐ যা হয়েছে ঢের হয়েছে। আমার বাবা বলতো, তাদের পুরুত ঠাকুরের ছেলের তিনটে পাস করে মাথা খারাপ হয়ে গিছিলো। বামনের ছেলে সকাল বেলা পূজো আহ্নিক না করে, দুধ বাতাসা দিয়ে কিসের পাতা সেদ্ধ করে খেয়ে, বাডসাই মুখে দিয়ে বই নিয়ে বসতো। গরীবের ঐ একটা ছাঁ, শেষে কি মাথা খারাপ হ'য়ে বসবে? তোমার ঐ শরীর আর কদ্দিন বইবে, এই বেলা থেকে না শেখালে অতগুলো ঘর সামলাতে পারবে কেন।" নারাণ তিরস্কারের স্বরে বলিল, "দূর পাগলী! তোরই দেখচি মাথা খারাপ হয়েছে! আর চারটে বছর রে পাগলী, আর চারটে বছর! ছেলে এন্‌টেন্স্ পাস কল্লে কি আর তোর

এ হাল থাকবে, না, আমি নরুন কাঁচি নিয়ে লোকের দোর দোর ঘুরবো? ও কি তোর সোজা ছেলে যে মানষের পায়ের নোখ খুঁটে খাবে! জজ ম্যাজিষ্ট্রেট একটা কিছু নিশ্চয়ই হবে।" স্বামীর তিরস্কারে বৃদ্ধা আর কোন কথা কহিল না। পঞ্চানন বাটী হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী মহকুমার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইল। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার পূরা ইংরাজীনবিশ। পঞ্চানন পরামাণিক নামটা তাঁহার ভাল লাগিল না; পরামাণিক কাটিয়া তিনি প্রামাণিক করিয়া দিলেন।

কাঁচি-ধরা নাপিতের পো মাইনর পাস করিয়া উচ্চ ইংরাজী স্কুলে পড়িতেছে—অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা না জুটিলেও, আশপাশের গ্রামের অনেক পরামাণিকই নারাণের বাড়ীর পথ ধরিল। ঘটক ঘটকী আর বড় আমল পাইল না; কন্যাকর্ত্তারা স্বয়ং আসিয়া নারাণের কুঁড়ে ঘরের দোরে হত্যা দিতে লাগিল। শেষ অনেক দেখা শুনার পর পাশের গ্রামের পরাণ পরামাণিকের—সুন্দরী না হইলেও সুশ্রী—কন্যা তুলসীর সহিত পঞ্চানন প্রামাণিকের বিবাহ হইল। বৃদ্ধ বৃদ্ধার নানা সুখ-স্বপ্নের মধ্য দিয়া তিন বৎসর কাটিয়া গেল,—পঞ্চানন ম্যাট্রিকুলেসন্ ক্লাসে উন্নীত হইল। সেই সময় তুলসীর-কোল-আলো-করা পৌত্র-মুখ দর্শন করিয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সন্ধ্যার সময় উঠানে মাদুর বিছাইয়া পরিশ্রান্ত দেহটাকে এলাইয়া দিয়া বৃদ্ধ নারাণ তাহার পৌত্রকে বুকে লইয়া কত সুখ-স্বপ্নই দেখিত—পঞ্চানন পাস করিয়া চাকরী করিবে, তখন তাহাকে আর নরুন কাঁচি লইয়া উদয়াস্ত লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে হইবে না—সে কেবল দুবেলা দুমুঠা খাইবে আর নাতিটীকে কোলে করিয়া বেড়াইবে। বিপুল আনন্দে ও বিমল শান্তিতে বৃদ্ধ কর্ম্মক্লান্ত সন্ধ্যা-গুলিকে এই ভাবে অতিবাহিত করিত। আর বৃদ্ধা পার্শ্বে বসিয়া সংসারের দুই প্রান্তের এই মধুর সম্মিলন অবাক হইয়া দেখিত। ক্রমে পঞ্চাননের পরীক্ষার দিন আসিল। পিতা মাতার পদধূলি লইয়া পঞ্চানন তাহাদের স্কুলের একজন শিক্ষকের সহিত পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় যাত্রা করিল।

নির্ব্বিঘ্নে পরীক্ষা দিয়া বাটী ফিরিয়া পঞ্চানন দেখিল, নারাণ অসুস্থ। ডাক্তার ডাকিতে চাহিলে নারাণ বলিল, "ভয় কি বাবা, সামান্য জ্বর বই ত নয়।" ক্রমে এই সামান্য জ্বর অসামান্য হইয়া দাঁড়াইল। পঞ্চাননের মুখ শুকাইয়া গেল। এক মাস পিতা শয্যাগত—এক পয়সা রোজগার নাই; গ্রামে ভাল ডাক্তার নাই—মহকুমা হইতে ডাক্তার আনিতে বিস্তর খরচ। জননীর নিকট পরামর্শ চাহিলে, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বিদেশ থেকে ডাক্তার আনবার পয়সা কোথায় বাবা, যা করেন বাবা পঞ্চানন।"

পঞ্চানন কিন্তু সে কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিল না,—স্ত্রীর গহনা বাঁধা দিয়া মহকুমা হইতে ডাক্তার আনাইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না;—বৃদ্ধ নারাণ অনন্ত বাসনা ও অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরপারের পথে যাত্রা করিল।

ভিটা ভদ্রাসন বন্ধক রাখিয়া পিতৃদায় হইতে উদ্ধার হইয়া, পঞ্চানন সংসারের দিকে চাহিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিল। ঘরে একটী পয়সা নাই, খাইবার একটী দানা নাই। সে ত সংসারের কিছুই জানে না,—কোন খবরই রাখে নাই। জ্ঞান হওয়া অবধি তৈরি ভাতের থালা কোলের সামনে পাইয়া আসিয়াছে। কোথা হইতে আসিল—কি করিয়া কি হইল, সে ত কোন খবরই রাখে নাই; রাখিবার প্রয়োজনও হয় নাই। বৃদ্ধা জননী, যুবতী স্ত্রী ও শিশু পুত্র—এতগুলি প্রাণীর পেট সে কি করিয়া চালাইবে! নিরাশার আঁধারে পঞ্চানন ক্ষীণ আশার আলোক দেখিতে পাইল—সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, চাকরী একটা মিলিতে পারে।

সংসারের শেষ সম্বল, নারাণের বড় আদরের ধন, একটী দুগ্ধবতী গাভী ছিল,—জননীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেটীকে বিক্রয় করিয়া, জননীর হাতে দিন পনেরর মত খরচ দিয়া, পঞ্চানন চাকরীর সন্ধানে কলিকাতায় যাত্রা করিল। পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে অনেক মুরুব্বীই তাহাকে চাকরী করিয়া দিবে বলিয়া আশা দিয়াছিল, কিন্তু আজ সকলেই সরিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের ২।৪ জন বিশিষ্ট চাকুরীয়া ভদ্রলোক কলিকাতায় থাকিতেন। পঞ্চানন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াও বিশেষ কোন সদুত্তর পাইল না। সকলের নিকট হইতে একই জবাব পাইল—"কোথায় চাকরী হে বাপু, যে দিন কাল পড়েছে! আচ্ছা দেখি, একটা দরখাস্ত রেখে যাও।" দরখাস্ত লিখিয়া লিখিয়া পঞ্চাননের হাত ব্যথা হইয়া গেল; কিন্তু সে কোথাও আশার কোন চিহ্ন মাত্র

দেখিল না। দেখিতে দেখিতে পক্ষকাল অতীত হইল,—হাতের পয়সা কটাও ফুরাইয়া আসিল।

আপিস অঞ্চলে সারা দিন চাকরীর চেষ্টায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বে গোলদীঘির পুকুর হইতে এক পেট জল খাইয়া, ছাতাটী মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িয়া, পঞ্চানন ভাবিতে লাগিল—সে ত লেখাপড়া শিখিয়াছে; কিন্তু এই কি তার শিক্ষার মূল্য—ছুটী পেটের ভাতের সংস্থান করিবার সামর্থ্য নাই! কই, তাহার পিতা ত লেখাপড়া কিছুই জানত না—অথচ তাদের ত বেশ সুখেই রেখেছিল। তাহার মনে হইল, সে যদি এত দিন স্কুলের পড়ায় সময় নষ্ট না করিয়া তাহার পিতার নিকট তাহাদের জাত ব্যবসায়টা শিখিত, তাহা হইলে ত আর তাহাকে আজ এক মুঠা ভাতের জন্য সাতশ লোকের খোসামুদী করিয়া পথে পথে বেড়াইতে হইত না,—সেও ত আজ তাহার বাপের মত মোটা ভাত খাইয়া, মোটা কাপড় পরিয়া, স্ত্রী-পুত্র লইয়া আনন্দ করিতে পারিত। উচ্চতর সুখের মোহে অদৃষ্টের এ কি পরিহাস! মুখের গ্রাস পায় ঠেলিয়া এ কি উঞ্ছবৃত্তি! কিন্তু তাহারও ত আর উপায় নাই,—সে ত কাঁচিখানি পর্য্যন্ত ধরিতে শিখে নাই। এমন সময় ৬।৭ বৎসরের একটী বালিকা তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "বাবু, একটা পয়সা দাও না, মার জন্যে মুড়ি কিনে নে যাব, সমস্ত দিন আমার মা কিছু খেতে পায় নি।" বালিকার কথা শুনিয়া পঞ্চাননের বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তার নিজের মার-ই বা আজ কি অবস্থা! তাড়াতাড়ি জামার পকেট হইতে তাহার শেষ সম্বল একটী আনি বাহির করিয়া বালিকার হাতে দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দুশ্চিন্তায় তাহার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিতেছিল। পুকুর হইতে সে আরও ২।৪ অঞ্জলি জল পান করিল।—পনের দিনের মত খরচ দিয়া সে মাসাবধি বাটী হইতে আসিয়াছে,—জননীর মিতব্যয়িতায় তাহাতে না হয় ২০ দিন চলিতে পারে। তার পর—? এমন কোন্ উপায় নাই, যাহাতে আর এক বেলা চলিতে পারে। তাহ'লে—? দুশ্চিন্তার মর্ম্ম-বেদনায় টলিতে টলিতে সে রাস্তায় বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিল—কোথায় যাইবে?—বাটী? সেখানেই বা কে আছে! কুঁড়ে ঘরখানির নীরব হাহাকার শুনিবার জন্যই কি সে বাটী যাইবে? দেশের লোকই বা তাহাকে কি বলিবে? তার চাইতে সে তাহার পিতার নিকট যাইবে—। স্থূল দেহে নহে—প্রেত দেহে! পিতার নিকটে কৈফিয়ৎ চাহিবে—তাহার এ অবস্থার জন্য দায়ী কে! সে ত শিশু ছিল,—সংসারের কোন অভিজ্ঞতাই তাহার ছিল না। তাহার পিতা তাহাকে যে পথে চালাইয়াছে, সে সেই পথেই চলিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে অন্ধকার রাত্রে রেলের লাইনের উপর মাথাটী রাখিয়া সে শুইয়া রহিল; শুনিতে পাইল, হুস্ হুস্ করিয়া একখানি ট্রেণ আসিতেছে, এখনই তাহার মাথাটী গুঁড়া করিয়া গাড়ী চলিয়া যাইবে। তার পর—? ব্যস্, সব শেষ! অদূরে রেলের কুলী-বস্তির পর্ণকুটীর হইতে শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রুত হইল। শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া পঞ্চাননের বুকের ভিতর দুর দুর করিয়া উঠিল। চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, চারিদিকে চাহিয়া সে দেখিল—নিবিড় অন্ধকারে ধরণী আচ্ছন্ন! সে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া ছুটিল—আশা, যদিই তাহারা বাঁচিয়া থাকে—যদি একবার তাহার স্নেহের পুত্তলী শিশুটীকে বক্ষে লইতে পারে! ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে ১৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রাত্রি দুইটার সময় পঞ্চানন বাটী আসিয়া পৌছিল। চোরের মত পা টিপিয়া ঘরের দাবায় উঠিয়া দেখিল, ঘর ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। দুই হাতে কম্পিত বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে পঞ্চানন ডাকিল "মা!" বৃদ্ধার চক্ষে ঘুম নাই,—পঞ্চানন চলিয়া যাইবার তিন দিন পরেই, তাহার কঠিন পীড়া বলিয়া কোন দুর্বৃত্ত বৃদ্ধার নিকট হইতে পঞ্চানন-প্রদত্ত গাভী বিক্রয়ের টাকা কয়টী ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়াছে। সেই অবধি প্রায় এক মাস কাল ঘটী বাটী বেচিয়া বৃদ্ধা কোন রকমে চালাইয়াছিল। আজ তিন দিন হইল তাহার শেষ সম্বল ফুরাইয়া গিয়াছে। শাশুড়ী বউ উভয়েই একরূপ উপবাসী,—পড়সীর বাটী হইতে এক মুঠা ভাত আনিয়া কোন রকমে শিশুটীকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। পুত্রকে এমন অসময়ে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া ব্যাকুল ভাবে বৃদ্ধা বলিল, "কি বাবা, অসুখ সেরেছে?" পঞ্চানন কথা কহিতে পারিল না, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া বৃদ্ধার অনাহার-ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধা আবার বলিল, "কি রে বাবা, অমন কচ্চিস্ কেন?" পঞ্চাননের মুখে কথা নাই। বৃদ্ধা চোখের জল মুছিতে মুছিতে নিদ্রিতা বধূকে জাগাইয়া বলিল, "বউ, ওঠরে,

চাকরী কত্তে গিয়ে বাছার কি হাল হ'য়েছে দেখ।" জননীর মুখে চাকরীর কথা শুনিয়া সে আর সামলাইতে পারিল না, বালকের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এমন সময় বাহিরে, "পঞ্চানন, পঞ্চানন; ও পঞ্চানন বাবু" বলিয়া জমীদার বাটীর সরকার হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহাদের ঘরের দাবায় আসিয়া বসিয়া পড়িল। পঞ্চাননের জননী বাহিরে আসিয়া, জমীদার-বাটীর সরকারকে দেখিয়া; মাথায় কাপড় টানিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া পুত্রকে ডাকিয়া দিল। পঞ্চানন বাহিরে আসিলে আগন্তুক বলিল, "পঞ্চানন বাবু, আপনি শীগ্‌গির করে আপনার বাবার নরুন কাঁচির থলেটা নিয়ে আমার সঙ্গে একবার আসুন—জমীদার বাবুর মেয়ের বিয়ে—বরপক্ষের নাগতে বেটা নেশা করে কোথায় পড়ে আছে—খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না,—আমাদের নাপতের হঠাৎ কলেরা হয়েছে। জমীদারের কড়া হুকুম—যেথান থেকে হ'ক নাপিত আনা চাই। দুতিন গ্রামে লোক পাঠালাম—কোথাও নাপিত পাওয়া গেল না! তাই আপনার কাছে আমি নিজেই এসিছি। যাই হোক, নাপিতের ছেলে ত, এতে আর লজ্জা কি? নিন্, আর দেরী কর্ব্বেন না, দয়া করে একবার এসে জমীদারের মান রক্ষে করুন।" পঞ্চাননের মাথা তখন ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতেছিল,—কোন কথা তলাইয়া বুঝিবার, বা কোন প্রশ্ন করিবার শক্তি তখন তাহার ছিল না। কিছুক্ষণ সরকারের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, যন্ত্র-চালিতের মত সে তাহার আদেশ পালন করিল।

বিবাহ-সভায় যাইয়া পঞ্চানন দেখিল, বরবেশে তাহারই অন্তরঙ্গ সহপাঠী পরেশ। পরেশ তাহাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "এ কি! পঞ্চানন বাবু!" পঞ্চানন কিছুক্ষণ তাহার দিকে নির্ব্বাক ভাবে চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে বলিল, "মাপ কর ভাই—আর আমি পঞ্চানন বাবু নই; পঞ্চানন বাবু হবার যা মজা, তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পেইছি! আর আমার পাস-করা পঞ্চানন প্রামাণিক হবার বাসনা নেই—আজ থেকে আমি নারাণ পরামণিকের ছেলে পাঁচু পরামাণিক!"

ভারতে খাদ্য-দ্রব্যাদির ব্যবসায়

শ্রীশচীন্দ্রকুমার সরকার

বিগত তিন বৎসরে, অর্থাৎ ১৯২১-২২ হইতে ১৯২৩-২৪ পর্য্যন্ত, ভারতের খাদ্য-দ্রব্যাদির ব্যবসায় কিরূপ ক্রম-বিকাশ লাভ করিয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। খাদ্য-দ্রব্যাদি যে যে ভাগে বিভক্ত তাহা এই,—মাছ, ফল ও সবজি, খাদ্যশস্য, মদ্য, নিছক খাদ্যদ্রব্য (provisions and oilman's stores), মসল্লা, চিনি, চা, অন্যান্য (কফি, হপ্‌স্ ও লবণ) এবং তামাক। এই সকল দ্রব্যের আমদানী, রপ্তানি ও পুনঃরপ্তানির তিনটি তালিকা নিয়ে দিলাম। ইহার সহিত ইহাদিগের একটা উৎপন্নের তালিকা দিতে পারিলে এই প্রবন্ধটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত, এবং পাঠকবর্গেরও পারি-পার্শ্বিক সমস্ত অবস্থাগুলিও জানা থাকিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় সবগুলি পাওয়াও দুষ্কর, অথবা তাহাদের সংখ্যামালা শেষ সাল পর্য্যন্ত এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

তালিকা

	আমদানি			পুনঃরপ্তানি			রপ্তানি		
সাল	১৯২১-২২ লাখ	১৯২২-২৩ লাখ	১৯২৩-২৪ লাখ	১৯২১-২২ লাখ	১৯২২-২৩ লাখ	১৯২৩-২৪ লাখ	১৯২১-২২ লাখ	১৯২২-২৩ লাখ	১৯২৩-২৪ লাখ
মৎস্য	১৯	২৪	৩০	১৫	১২	১২	৬১	৫৪	৬৩
ফল ও সবজি	১,৬৮	১,৮৪	১,৭১	৫২	৭৯	২১	৬৩	৬৩	৭২
খাদ্যশস্য	৯,৩৬	৫৪	৪৪	১	০০	১	২৯,৯৯	৪২,৪৮	৫০,৮৭
মদ্য	৩,৩৭	৩,০১	২,৭২	৫	৪	২	০০	০০	০০
নিছক খাদ্যদ্রব্য	২,৭০	২,৭৭	২,৮১	১৩	৫	৫	৭১	৬১	৬০
মসল্লা	১,৯৩	২,৪৫	২,৫৯	১০	১৮	৮	১,০০	১,১০	১,১১
চিনি	২৭,৫০	১৫,৪৯	১৫,৪৫	১,৭১	২,৬৩	১,৬১	২৫	১০	৯৭
চা	৫৬	৪৬	৮২	১	২	৩	১৮,২২	২২,০৪	৩১,৬২
অন্যান্য	১,৭০	১,৯৪	১,২৯	৭	৮	৭	১,৩৯	১,২৫	১,৫৮
তামাক	১,৬৫	২,২৬	২,২৬	১০	৫	৪	৭১	৮৩	১,০৩
মোট	৫০,৬৩	৩১,০০	৩০,৩৯	২,৮৫	৩,৯৬	২,৪৮	৫৩,৫১	৬৯,৫৮	৮৯,১৬

উপরিউক্ত তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আমদানি গড়ে প্রতি বৎসর ৪৭,৩৪ লাখ টাকা, রপ্তানি গড়ে প্রতি বৎসর ৭০,৭৪ লাখ টাকা ও পুনঃরপ্তানি গড়ে প্রতিবৎসর ৩,৫২ লাখ টাকা। তাহা হইলেই রপ্তানি ও পুনঃরপ্তানির যোগফল হইতে আমদানি বিয়োগ করিলে প্রমাণ হয় যে, গড়ে প্রতিবৎসর আমরা ৩৬,৪২ লাখ টাকার খাদ্যদ্রব্যাদি বিদেশে পাঠাইয়া দিতেছি, এবং বিনিময়ে অতগুলি টাকা লাভ করিতেছি। এখন আলোচ্য বিষয় এই যে, নগদ এতগুলি টাকা লাভ করা বেশী লাভজনক কিংবা নগদ লাভ বেশী না করিয়া দেশে অত টাকা মূলের খাদ্যদ্রব্য ধরিয়া রাখা বেশী লাভজনক। অধিকন্তু অনাবশ্যক বাড়্তি মাল বিদেশে পাঠাইয়া দিয়া তাহার বিনিময়ে যে লভ্য টাকা পাওয়া যায়, তাহার সাহায্যে আবশ্যক মাল ক্রয় করাও যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। যে প্রণালীতে আমাদের দেশে ব্যবসা চলিতেছে, তাহাতে স্থূলচক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যে, যেহেতু আমদানি প্রতি বৎসর কমিতেছে ও রপ্তানি প্রতি বৎসর বাড়িতেছে, সেহেতু আমরা প্রতি বৎসর আমাদের অভাব মোচন করিয়া বাড়তি মাল বিদেশে পাঠাইয়া উত্তরোত্তর লাভবান ও সমৃদ্ধিশালী হইতেছি। এই কথাটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু কথাটি সত্য কি? আমাদের দেশে সমগ্র লোকসংখ্যার প্রায় ৭২ শতাংশ নিছক কৃষিজীবী, তাহার উপর যদি কৃষি বা ভূমি-সংশ্লিষ্ট উপজীবীর সংখ্যা ধরা যায়, তাহা হইলে এই শতাংশের মাত্রা বাড়িয়া প্রায় ৮২ হয়। সকলেই জানেন যে, শস্য সংগ্রহের কয়েকমাস পর পর্য্যন্ত আমাদের কৃষকগণ দুইবেলা খাইতে পায়, তাহার পর তাহারা সপরিবারে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইবার বড়মানুষি কাহাকে বলে জানেনা। অপিচ এই অবস্থা পূর্ব্বে ছিল এবং এখন নাই এমন নহে; বরং তাহার বিপরীত। এমন অবস্থায় আমরা যে লাভবান হইতেছি তাহা কিরূপে বিশ্বাস হয়? এখন তালিকা হইতে এক একটি দ্রব্য পৃথক ভাবে আলোচনা করা যাক্।

প্রথম, মাছ। দেখা যায় আমদানি প্রথম বৎসর ১৯ লাখ, পর বৎসর ২৪ লাখ, ও শেষ বৎসর ৩০ লাখ, ও রপ্তানি ও পুনঃ রপ্তানি ঐ ঐ বৎসর ৭৫লাখ, ৬৬ লাখ ও ৭৬ লাখ টাকা। অর্থাৎ রপ্তানীর মূল্য গড়ে প্রতি বৎসর ৭২ লাখ ও আমদানি ২৪ লাখ। ইহা স্বাভাবিক; কারণ নিতান্ত নিরক্ষর লোকেও জানে যে সে চালানি মাছ কদাচিৎ ব্যবহার করে। তাহাও আবার সব জাতি সকল অবস্থায়ও নহে। যে বিবিধ প্রকারের মাছ নামধেয় জিনিষের ব্যবসা হয় তাহা এই,—শুষ্ক আলোনা মাছ, শুষ্ক লোনা মাছ, ফিস্‌ম (Fishmem) ও হাঙ্গরের পাখ্‌না ও ভিজা লোনা মাছ (নাপি)।

দ্বিতীয় ফল ও সব্‌জী। আমদানি ফল ও সব্‌জির মূল্য গড়ে ১,৭৪ লাখ, পুনঃরপ্তানি ৫১ লাখ ও রপ্তানি ৬৬ লাখ টাকা। আমদানির ভিতর টাট্‌কা ফল ও সব্‌জির মধ্যে সিংহল হইতে নারিকেলই প্রধান, ও শুষ্ক ফলমূলের মধ্যে বাদাম, কিস্‌মিস ও খেজুর প্রধান। ইহার মধ্যে খেজুর গত তিন বৎসরে প্রতি বৎসর এক ক্রোর টাকার অধিক আমদানি হইয়াছে; তন্মধ্যে মেসোপটেমিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। শুষ্ক ফলের চালানে মেসোপটেমিয়া, তৎপরে পারস্য, মস্কট, ইটালি ও ফ্রান্স উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত আফগানিস্থান হইতেও যথেষ্ট শুষ্ক ফল আমদানি হয়, কিন্তু তাহার হিসাব "বিদেশী জলপথ বাহিত বাণিজ্য" তালিকা হইতে বর্জ্জিত। রপ্তানি ৬৬ লাখ টাকার মালের মধ্যে এক পেঁয়াজের মূল্য গড়ে ৩৩ লাখ টাকা, বাকী নানাবিধ ফল ও সব্জি দ্বারা পরিপূরিত।

তৃতীয়, শস্যাদি—আমদানি প্রথম বৎসর ৯,৩৫ লাখ ও পরবৎসর বহুল পরিমাণে কমিয়া ৫৪ লাখ ও গত বৎসর মাত্র ১৪ লাখ টাকা, পুনঃরপ্তানি একান্ত নগণ্য। রপ্তানি, যাহার দরুণ আমাদের দেশে তথাকথিত চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষের স্থিতি, প্রতি বৎসর যে পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় ক্রমশঃ আমাদের এমন অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে, আইন দ্বারা এই অবাধ রপ্তানি বন্ধ না করিলে দেশে সুনিশ্চয় একান্ত অন্নাভাব ঘটিবে। রপ্তানির মূল্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, প্রথম বৎসর ৩০ ক্রোর, দ্বিতীয় বৎসর ৪২ ক্রোর ও শেষ বৎসর ৫১ ক্রোর টাকার শস্যাদি ভারত হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। এখন দেখা যাক্ কি কি শস্যাদি কোন্ কোন্ দেশে কত পরিমাণে গিয়াছে। শস্যাদির মধ্যে প্রধান চাল ও গম, এবং ময়দাও নেহাত নগণ্য নহে। সরকারি বিবরণী দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এমন কোন দেশ পৃথিবীতে নাই, যেখানে ভারতীয় চাল প্রেরিত হয় না। গত বৎসর ৩৫ ক্রোর টাকার রপ্তানি চালের মধ্যে ২৭½ ক্রোর ব্রহ্ম, ৫ ক্রোর বাঙ্গলা, মাদ্রাজ ১⅓, ও বাকী বোম্বাই, সিন্ধু ও বিহার পাঠাইয়াছিল। ভারতের ভাণ্ডার বাঙ্গলা আজ ব্রহ্মের নিকট পরাজিত, অধিকন্তু বাংলায় আজকাল ব্রহ্মদেশ হইতে চাল আমদানী করিতে হইতেছে, এবং যদিও বাংলার সংখ্যামালা সরকারি নীলকেতাবে বাহ্যতঃ লঘু, তথাপি অন্ততঃ কলিকাতাবাসী অনেকেরই জানা আছে যে, কলিকাতা বন্দর হইতেই গ্রাহাম, রেলি ইত্যাদি কোম্পানীর দয়ায় কত কোটী টাকার চাল যে রপ্তানি হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। চাল ও গম এই দুইটিই প্রধান। গম ও ময়দার রপ্তানিও বড় কম নহে—প্রথম বর্ষে ৩,৩৩ লাখ, পরবর্ষে ৪,৭৪ লাখ ও এ বৎসরে ১০,২৬ লাখ। ইহার মধ্যে সিন্ধুপ্রদেশেরই প্রাধান্য, তৎপরে বোম্বাই। পাঞ্জাবের গমের বহির্গমনের পথ করাচী বন্দর। গত বর্ষের মোট ১০,২৬ লাখের মধ্যে সিন্ধু হইতে ৯,২৭ লাখ টাকার গম রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসর সমস্ত রপ্তানি গমের ৭৮ শতাংশ যুক্তরাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিল এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে ঐ অনুপাত প্রায় একই রূপ। ময়দার রপ্তানি প্রায়শঃ ভারতের নিকটবর্ত্তী এসিয়া বা আফ্রিকার দেশগুলিতে প্রেরিত হয়। অন্যান্য রপ্তানি শস্যের মধ্যে গত বর্ষে বার্লী ১,৭৭ লাখ, জাওয়ার ও বাজরা ১৬ লাখ, জনার ভুট্টা ৬৭ লাখ, কড়াই ৬০ লাখ, ছোলা ৮০ লাখ, ডাল ৩৬ লাখ ও অন্যবিধ ১,৩৫ লাখ উল্লেখযোগ্য।

জিজ্ঞাস্য এই যে, এত বহুল পরিমাণে শস্যাদির অবাধ রপ্তানি হইলে দেশের লোকে খাইতে পায় কি?

চতুর্থ, মদ্য—মদ্যের রপ্তানির মূল্য একান্ত নগণ্য, পুনঃরপ্তানি গড়ে প্রতিবৎসর ৩⅓ লাখ, কিন্তু আমদানির ঘটা দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। দেশে দেশীয় মদ্য যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, এবং যখন রপ্তানী নাই বলিলেই হয়, তখন বুঝিতে হইবে, সমস্ত উৎপন্ন মদ্য দেশেই নিঃশেষিত হয়; অধিকন্তু গাঁজা, আফিম্, চরস ইত্যাদি গরীবের দেশে ইতর লোকের মধ্যে যথেষ্ট চলন আছে। ইহার উপর বৎসরে গড়ে প্রায় ৩০৩ লাখ টাকার মদ্য বিদেশ হইতে আমদানি হয়। ১৯২১-২২ সালে ৩,৭৭ লাখ, ১৯২২-২৩ সালে ৩,৪৩ লাখ ও গত বৎসর ৩১৫ লাখ টাকার মদ্য আমদানি হইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর দেখা যাইতেছে যে আমদানি কিছু কিছু কমিতেছে; ইহার কারণ শুল্ক বৃদ্ধি ও তন্নিবন্ধন মূল্য বৃদ্ধি ও তন্নিবন্ধন লোকের কিয়ৎপরিমাণে বদ্ অভ্যাস ত্যাগ বা স্বল্প মূল্যের দেশীয় মদ্যপান, অথবা অন্যপথাবলম্বী হওয়া, অথবা কতকগুলি লোকের আদৌ এই পাপের সহিত অসহযোগ। গত বৎসর যত মদ্য আমদানি হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এল্, বিয়ার ও পোর্টার ৭৮ লাখ, স্পিরিট্ ২০৬ লাখ, মিষ্ট মদ্য (liqueur) ৩ লাখ ও ওয়াইন্ মদ্য (wine) ২৬ লাখ টাকা। তালিকার সংখ্যা হইতে রচনার সংখ্যা কিছু বেশী; কারণ, তালিকা হইতে ঔষধাদির সহিত মিশ্রণের মদ্য, গন্ধদ্রব্যের মদ্য, ও মেথিলেটেড্ স্পিরিট্, এইগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে। স্পিরিট্ নামধের পাপ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আমদানি হয়।

পঞ্চম, নিছক খাদ্যদ্রব্যাদি (provisions and oilman's stores)—ইহার আমদানি, রপ্তানি ও পুনঃরপ্তানি হইতে অনেক বেশী। পুনঃরপ্তানির মূল্য যদিও যৎসামান্য, কিন্তু রপ্তানি গড়ে প্রতি বৎসর ৬৪ লাখ, তন্মধ্যে মাখন গড়ে ৬ লাখ, ঘি ৪০ লাখ, আচার, চাটনি মোরব্বা ইত্যাদি ১২ লাখ ও বাকি অন্যান্য। এখন আমদানির একটি দ্রব্য ও মূল্য তালিকা দেওয়া যাক্; তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে, কি কি জিনিষের আমাদের দেশে চাহিদা আছে। গত ১৯২৩-২৪ সালের হিসাব দিতেছি,—শূকর মাংস ১৪॥০ লাখ, বিস্কুট ও কেক্ ২৭ লাখ, মাখন ১ লাখ, টিনের ফল ৮ লাখ, টিনের মাছ ১৪ লাখ, টিনের অন্যান্য ৪৯ লাখ, পনির (cheese) ১১॥০ লাখ, কোকো ও চোকোলেট্ ৫ লাখ, শ্বেতসার মিশ্রিত খাদ্য ৪॥০ লাখ, দুগ্ধজাত খাদ্য (শিশু ও রোগীর জন্য) ২৫ লাখ, শ্বেতসার ও দুগ্ধজাত অন্যান্য খাদ্য ১৫ লাখ, ঘি ১ লাখ, আইসিং গ্লাস্ (isinglass) ১ লাখ, জ্যাম্ ও জেলি ৮ লাখ, চর্ব্বি ৫০ হাজার, জমাট দুধ ইত্যাদি ৪৭ লাখ, আচার, মোরব্বা, চাটনি ইত্যাদি ৫ লাখ, ভিনিগার ৩৪ হাজার, ও অন্যান্য ৮ লাখ। ছোটগুলি যদিও ধর্ত্তব্য নয়, কিন্তু মোটা মোটা টাকার যে সকল মাল আমদানি হয়, তাহার অধিকাংশই সাহেবদিগের জন্য বা সাহেবি ভাবাপন্ন বাবুদিগের জন্য, কোথাও বা রোগী ও শিশুদিগের ব্যবহারের জন্য। সাহেবরা তাঁহাদের দেশীয় জিনিষ ব্যবহার করিবেন, বিশেষতঃ নিজেদের রুচিকর খাদ্যদ্রব্যাদি ব্যবহার করিবেন, ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না; কিন্তু রোগীর বা শিশুর খাদ্য বিদেশ হইতে আসিবে ইহা লজ্জার কথা। জমাট দুগ্ধের অধিকাংশ ব্রহ্মদেশে আমদানি হয়। ইহার কারণ বোধ হয় ব্রহ্মবাসীরা বৌদ্ধ বলিয়া বৎসকে বঞ্চিত করিয়া গাভী দোহন করিয়া লওয়া পাপ মনে করেন। সেইজন্য অপর ধর্ম্মাবলম্বীরা তাঁহাদের হইয়া পাপ করিলে তাঁহাদের পাপ হইবে না, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। অনেকটা আমাদের দেশের নিষ্ঠাবান লোকের কালিঘাটের মহাপ্রসাদ পাওয়ার ন্যায়। আচার, মোরব্বা ইত্যাদি যেগুলি বিদেশ হইতে আইসে (বিশেষতঃ ইংলণ্ড হইতে), সেগুলি অধিকাংশ ভারত হইতে বা অন্য দেশ হইতে ইংলণ্ডে প্রথম নীত হইয়া, তথা হইতে লোচন-লোভনীয় শিশি বা টিনে আবদ্ধ হইয়া পুনরায় এদেশে প্রেরিত হয়। আর আমরা মহা আদরে সেগুলি বিলাতী মনে করিয়া সেবা করি। সার জন উডরফের "ভারত কি সভ্য?" গ্রন্থে লিখিত আছে; ইঙ্গ-বঙ্গ সম্প্রদায়ের কোন একটি ভদ্রলোকের বাটীতে তাঁহার এক দিন বৈকালিক চা-যোগের নিমন্ত্রণ হয়। গৃহস্বামী চায়ের সহিত একটিন American "parched rice" রাখিয়াছেন। টিন খুলিয়া দেখা গেল তাহা আর কিছুই নহে, নেহাত আমাদের দেশীয় মুড়ি। কাপড়ের কোঁচড়ে মুড়ি খাওয়া অতি অসভ্যতা, কিন্তু টিনে ভরা স্বদেশ হইতে বিদেশে প্রেরিত এবং সেই মাল পুনরায় ভারতে বিলাতী ছাপ সমেত আমদানি হইলে আর খাইতে লজ্জা নাই। Slave mentalityর পরাকাষ্ঠা!

ষষ্ঠ, মসল্লা—মসল্লার আমদানি প্রতি বৎসর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। পুনঃরপ্তানি প্রথম বৎসর অপেক্ষাকৃত কম, দ্বিতীয় বৎসর প্রথম বৎসরের প্রায় দ্বিগুণ এবং গত বৎসর আবার প্রথম বৎসরের ন্যায় কমিয়া গিয়াছে; এবং রপ্তানি অতি অল্পহারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমদানির ভিতর সুপারি প্রধান। গত বৎসর ২৫৮ লাখ টাকার মসল্লা আসিয়াছে, তন্মধ্যে ষ্ট্রেট্‌স্ সেট্‌লমেণ্ট ১৬৮ লাখ টাকার সুপারি পাঠাইয়াছে। লবঙ্গ গত বৎসর ৪২ লাখ টাকার আমদানি হইয়াছে, ও বাকি অন্যান্য। রপ্তানি মসল্লার মধ্যে লঙ্কা, মরিচ, আদা ও এলাচ প্রধান। সাধারণতঃ ভারতের নিকটস্থ দেশগুলি হইতে মসল্লার আমদানি হইয়া থাকে, যথা সিংহল, ষ্ট্রেট্‌স্ ও কেনিয়া ইত্যাদি, ও ইয়োরোপ ও আমেরিকান দেশগুলিতে রপ্তানি হইয়া থাকে।

সপ্তম, চিনি—খাদ্যদ্রব্যাদির আমদানি বাণিজ্যে চিনিই প্রধান। প্রতি বৎসর ইহা সমুদায় আমদানির পঞ্চাশ-শতাংশ বা ততোধিক স্থান অধিকার করে। পুনঃরপ্তানিতে ইহার স্থান ততোধিক। কিন্তু ভারতীয় চিনির রপ্তানি মোট খাদ্যদ্রব্যাদির রপ্তানির হিসাবে অতি অল্প। গত ফাল্গুন মাসের "ভারতবর্ষে" "ভারতে চিনির ব্যবসায়" শীর্ষক প্রবন্ধে চিনির বিষয়ে অনেক কিছু আলোচনা করিয়াছি। সেজন্য এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আর বিশেষ কিছু বলিলাম না।

অষ্টম, চা—ভারতে চায়ের আমদানি ও রপ্তানি যথেষ্ট হয়।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, যখন ভারতে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়, তখন আবার আমদানির আবশ্যকতা কি? কথাটি ঠিক। কিন্তু অন্যান্য বিদেশী ব্যবসায়ের ন্যায় ভারতীয়ের হাতে কোন ব্যবসাই নাই। এস্থলে, বিদেশী মহাজনেরা আমদানি ও রপ্তানিতে দুই তরফা লাভ করিবেন, তাহা আর আশ্চর্য্য কি। আমদানি প্রথম বৎসর ৫৪ লাখ, দ্বিতীয় বৎসর ৪৫।।০ লাখ, ও গত বৎসর ৮২ লাখ। পুনঃ রপ্তানি-ঐ তিন বৎসরে যথাক্রমে ১ লাখ; ১।।০ লাখ ও ৩ লাখ। সাধারণতঃ সিংহল, ষ্ট্রেইটস্, জাভা ও চীন হইতে চা আমদানি হয়। রপ্তানি প্রতি বৎসর বাড়িতেছে, ১৯২১-২২ সালে ১৮,২২ লাখ, ১৯২২-২৩সালে ২২,০৪ লাখ, ও ১৯২৩-২৪ সালে ৩১,৬২ লাখ। চা সাধারণতঃ দুইপ্রকার, কালো ও সবুজ। ভারতে আমদানি চায়ের অর্দ্ধেকের অধিক সবুজ ও রপ্তানি চায়ের প্রায় সমস্তটি কালো। রপ্তানি চায়ের গড়ে প্রতি বৎসর ৮৯ শতাংশ ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, ও বাকি অন্যান্য দেশে। ইংরাজী ভাবা ভাবীরা চায়ের ভক্ত। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে চা অপেক্ষা কফির চলন অধিক। সংবাদপত্রের পাঠকেরা বোধ হয় সকলেই জানেন, যে সকল মহাজন ভারতে চায়ের ব্যবসা করিতেছেন, তাঁহারা কিরূপ পরিমাণে লাভবান হইতেছেন, আর কুলিরা কিরূপ পরিমাণে দৈনিক বেতন পাইতেছে। চাঁদপুরে গুর্খা পুলিদের হস্তে চা-কুলিদের নিগ্রহ ইতিহাসের কথা দাঁড়াইয়াছে।

নবম, অন্যান্য খাদ্য—তিনটি জিনিস, কফি, হপ্‌স্ (hops) ও লবণ, একত্র "অন্যান্য খাদ্য" এই আখ্যা পাইয়াছে। ভারতে চায়ের ন্যায় যদিও প্রচুর কফির চাষ আছে, তথাপি বিদেশ হইতে ইহার আমদানি হইয়া থাকে, প্রধানতঃ সিংহল হইতে। প্রতি বৎসর গড়ে ১৭ লাখ টাকার অধিক কফি এদেশে আমদানি হইয়া থাকে। কফির রপ্তানি বাণিজ্য যথেষ্ট হয়,—১৯২১ ২২সালে ১,৩৯ লাখ, পর বৎসর ১,২৪ লাখ, ও গত বৎসর ১৫৭ লাখ। ইহার মধ্যে ইংলণ্ডে গড়ে প্রতি বৎসর ৫০ ও ফ্রান্সে গড়ে প্রতি বৎসর ৪৪।।০ লাখ, ও অন্যান্য অনেক দেশে কিছু কিছু পরিমাণে রপ্তানি হয়। দক্ষিণ ভারতে অর্থাৎ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কফি জন্মে, এবং এইজন্য গত তিন বৎসর ভারত হইতে বিদেশে যত কফি রপ্তানি হইয়াছে, মাদ্রাজ হইতে গড়ে তাহার ৯৫ শতাংশ প্রেরিত হইয়াছে। হপ্‌স্ একপ্রকার উদ্ভিজ্জ, ইহা হইতে মদ্য ও ঔষধাদি তৈয়ারি হইয়া থাকে, এবং ইয়োরোপীয়ানরা ইহা খাইয়াও থাকে। ইহার আমদানি অতি সামান্য, গড়ে তিন বৎসরে ৩½ লাখ আসিয়াছে; ইহার রপ্তানি নাই। লবণের রপ্তানি বা পুনঃ রপ্তানি নাই বলিলেই হয়, কিন্তু আমদানি প্রচুর। ইহা অতি লজ্জার কথা যে ভারতের তিন দিক সমুদ্র বিধৌত হওয়া সত্ত্বেও এবং কিছু কিছু সৈন্ধব লবণের খনি থাকা সত্ত্বেও আমাদিগকে বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর গড়ে ১,৪৩ লাখ টাকার লবণ ক্রয় করিতে হয়। পরিমাণ ও মূল্যের হিসাবে বাংলা ও ব্রহ্মের অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; কারণ গত কয়েক বৎসরই সমুদায় আমদানির ৮৬ শতাংশ বাংলা ও ১৫ শতাংশ স্থান ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া আছে। অন্যান্য প্রদেশগুলিতে নাম মাত্র আমদানি হয়। গড়ে প্রতি বৎসর সরকারের প্রায় ২ ক্রোর টাকা আমদানি শুল্ক লাভ হয়, এবং ইহাই বোধ হয় ভারতে দেশের আবশ্যক মত লবণ তৈয়ারি করিতে না দেওয়ার একটি কারণ। যেহেতু দেশীয় পণ্যের উপর শুল্কের হারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে দেশের লোকে আর্ত্তনাদ করিবে। অপর একটি কারণ এই যে, ইয়োরোপ হইতে ভারতাভিমুখী জাহাজ যত ভারতের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, তত তাহার বোঝা কমিতে থাকে, কাজেই ওজন বজায় রাখিবার জন্য বাজে মাল যথা লবণ ইত্যাদি বোঝাই দিয়া ওজন বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। যে সকল প্রধান প্রধান দেশগুলি হইতে লবণ আমদানি হয়, তাহা একবার মানচিত্র দর্শন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে—কিরূপে বিলাত হইতে ভারতে আসিবার পথে পড়ে। সেগুলি এই,—যুক্তরাজ্য, জার্ম্মানী, স্পেন, ইজিপ্ট, এডেন ও ইটালিয়ান ইষ্ট আফ্রিকা।

দশম, তামাক—ইহার পুনঃ রপ্তানি গড়ে প্রতি বৎসর ৬ লাখ টাকা, রপ্তানি গড়ে প্রতি বৎসর ৮৬ লাখ, ও আমদানি গড়ে ২০৬ লাখ টাকা। রপ্তানির ভিতর দেখা যায় যে, কাঁচা তামাকই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রপ্তানি হয়, এবং তৈয়ারি তামাক যথা সিগার, সিগারেট ইত্যাদি গড়ে প্রতি বৎসর ৮½ লাখ টাকার রপ্তানি হয়। রপ্তানি প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু তৈয়ারি তামাকের ব্যবসায়ে হ্রাসবৃদ্ধি হইতেছে। আমদানি তামাক প্রতি বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার মধ্যে কাঁচা তামাকের আমদানির আধিক্য দেখিয়া মনে হয় যে, অস্মদ্দেশে যে কয়েকটি বৃহৎ সিগারেটের কল স্থাপিত হইয়াছে, তাহারা উৎকৃষ্ট বিদেশী তামাক ব্যবহার করিতেছে। গত বৎসর ২২৬ লাখ টাকার আমদানি তামাকের মধ্যে ১৫৭ লাখ টাকা কেবল আমদানি সিগারেটের মূল্য। অসহযোগ আন্দোলনের যে কোন সভায় খদ্দরের বস্ত্র পরিহিত দুই একটি লোক দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই খানেই আবার "খদ্দরের" সিগারেটের পরিবর্ত্তে হাতী মার্কা সিগারেট মুখে অনেকগুলি অজাতশ্মশ্রু ভাবী রাজনীতিজ্ঞকে বিচরণ করিতে দেখা যায়।

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কথা কহিতে কহিতে বম্‌পাস্ টাউনের (Bompas townএর) অনেকখানি অতিক্রম করিয়া ফেলা হইয়াছে। 'বম্‌পাসের' এপাশ ওপাশ দু'পাশেই, বিশিষ্ট ব্যবধানে, উদ্যানসহ pompous (জাঁকালো) বিল্‌ডিং সকল বাঙ্গালীর বাহাদুরী ঘোষণা করিতেছে। বাঙ্গলার হাওয়া মাড়োয়ারী ধনেশদেরও বেশ ব্যাপ্‌টাইজ্ করিয়াছে; নূতন ব্রতীরা আর ধর্ম্মশালাতেই তুষ্ট ন'ন,—বিলাস-বালাখানায় ঝুঁকিয়াছেন। আরম্ভ দেখিয়া মনে হয়—অচিরে বাঙ্গালীর মতই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিবেন।

সকল সৌধের ফটকেই কর্ত্তাদের নামাঙ্কিত প্রস্তর বা ধাতুফলক দেখিলাম। নামের সহিত সংযুক্ত—কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, আবাস, নিবাস, নিকেতন, উদ্যান, আশ্রম, সৌধ, ধাম, ভবন, কুটীর, মন্দির, সদন, সবই পাইলাম,—পাইলাম না কেবল 'ঘর আর বাড়ী' সুতরাং সংসার-ছাড়া জিনিস। নির্ম্মাণ-বৈচিত্র্য ও শিল্পাতিশয্য দেখিলে বিলাসের বাসা বলিতে ইচ্ছা হয়। বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে হাঁপ ছাড়িবার হাঁসপাতালও আছে। সাধন-কুটীর, শান্তি-নিকেতনও আছে,—সাধক বা শান্তিভোগীর সাক্ষাৎ মিলিল না। তবে খোস্‌খবর সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

যাহা হউক, নামাঙ্কিত উক্ত ফলকগুলিতে বাঙ্গালার বড় বড় নামী জষ্টিস্, ভকীল, ডেপুটি, ডাক্তার, ড্রগিষ্ট, কবিরাজ, শিক্ষক, লেখক, সম্পাদক, পাব্‌লিসার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি অনেককেই পাইলাম। "হাউস্-অফ্-লর্ডস্" (House of Lords) বলিলেই হয়। গোয়েন্‌কা গেটে সশস্ত্র শাস্ত্রি পাহারা, নগেন্দ্র গেটে কিশোরী হস্তে কেশতৈল। একটি গেট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহার সংশ্রবে সুকৌশলে নির্ম্মিত একখানি (সুতরাং অদ্বিতীয়) প্রকাণ্ড পয়জার! যদি বিজ্ঞাপন হিসাবে হয়—ভাল; নচেৎ জান্ ও মান লইয়া সেথায় মাথা গলাইবার সাহস, বোধ হয় চোরের পক্ষে, সম্ভব নয়।

ভাবিতে লাগিলাম—নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা দুই হাজার বৎসর পরে এই সব ফলক-সাহায্যে বৌদ্ধস্তূপের বহুৎ কঙ্কাল আবিষ্কার করিবেন; এবং এই প্রস্তরবহুল সাঁওতাল প্রান্তরটি যে ভিক্ষু ও শ্রমণে শোভিত ছিল, তাহা নির্ব্বিবাদে প্রমাণ হইয়া যাইবে।

বম্‌পাস্ টাউনের সমৃদ্ধ অংশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যাওয়া হইল। মধ্যে একটি নির্জ্জলা পাহাড়ী নদী পড়ে,—বালুময়, কোথাও কোথাও প্রস্তর-পঞ্জরমাত্র দৃশ্যমান। শুনিলাম, একটু খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায়, এবং সে জল না কি যেমন স্বাদু, তেমনি স্বাস্থ্যকর। উপরটা দেখিলে শ্রদ্ধা হয় না; নামটিও কবিদের মনে ধরিবে না, কাব্যেও অচল,—"বাওড়া"।

স্থানে স্থানে সুন্দর উদ্যানযুক্ত অট্টালিকা, ফাঁকে ফাঁকে আকাশ বাতাস আলো, মাঝে মাঝে খোলা ময়দান, অদূরে পাহাড়, জমি বেশ খট্‌খটে; পথের দুই পার্শ্বে আম, জাম, কাঁটাল, মহুয়া প্রভৃতি ছায়াবহুল বৃক্ষের শ্রেণী;—সবই শরীর ও মনের অনুকূল, সুতরাং স্বাস্থ্যকর। এসব স্থানে যে দেহ-মন বল পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই,—যদি তাগাদা আর অনাটনের চাপ্ না থাকে। জল-হাওয়াটা অবশ্য স্থানের গুণ; তবে ওই যে "ভাল-লাগা-লাগি"—সেটা বোধ হয় ট্যাক্সই নয়,—নূতনের গুণ।

অমরকে বলিলাম—"এ স্থানটি তোমার 'কমলালয়',—তোমার ধাতে খুব সইবে। এ দেশের মাটিতে লোহা ফলে, জলেও লোহার অংশ বেশী। দিন কতক থাকলে লোহার ভীম বনে যাবে। এদেশবাসীদের দেহ আর রং লক্ষ্য করেছ কি?"

অমর হাসিয়া বলিল—"তুমি আর আমাকে বলবে কি, —এসে পর্য্যন্ত ঐ কথাই মাথায় ঘূরচে। দেখি—"

বলিলাম—"যা' কর নিজেই কোরো,—সস্ত্রীক নয়—"

অমর। কেন?

বলিলাম—"পুরুষে "লোহার ভীম" হ'লে দুঃখু নেই,

কিন্তু "ভীমা" নামের পুষ্করিণীও ভয়ঙ্কর ! 'লৌহ-কুসুম'টা আকাশ-কুসুম থাকাই ভাল।"

অমর। কোন্ কাজের কথাই তোমার সঙ্গে হবার যো নেই।

বলিলাম—"এবার থাক বন্ধু !"

মাতুল সহসা—"উঃ—এ ঘাড়ভাঙ্গা গাছগুলো কি গাছ মশাই ? যেমন্ দেশ, তার গাছও তেম্‌নি," বলিয়া উঠিলেন।

বলিলাম—"যোজনগন্ধা,—বড় মিঠে গন্ধ।"

মাতুল বিরক্তি ও বিদ্রূপব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, হনুমানে শুঁকবে বলে শ্রীরামচন্দ্রের সৃষ্টি বুঝি ! আহা, কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা বটে ! দশরথের ওই ছেলেটিই মানুষের মত ছেলে ছিলেন কি না !"

বলিলাম - "হঠাৎ এ ভাব যে এল ?"

মাতুল। মানুষকে ফুলের সৌরভ উপভোগ করতে হলে, আগে একখানি এয়ারোপ্লেন্ কিন্‌তে হয় ! ওই আপুদে গাছের আগাটা দেখ্‌তে গিয়ে, ঘাড়টায় এমন খট্‌কা লেগে গেল ! বেশ আম জাম কাঁটাল চল্‌ছিল, কোথেকে মাঝখানে পাঁচপাঁচটা—কি বল্লেন—"ভোজন্‌-রস্তা" ?—হনুমানে-খেগো নাম বটে !

শুনিয়া আমি ত অবাক্। ভগবানের কাণ্ড দেখিয়া হাসি আর চাপিতে পারি না। চিরদিনই লক্ষ্য করিতেছি, যেখানেই যাই—আমার ভাগ্যে লোক জোটান্ ভাল। চীনযাত্রায় এক চাড়ুয্যে জুটিয়াছিলেন। হঠাৎ এক দিন বলিয়া বসিলেন—"সেই গোপালকুণ্ডুর গল্পটা বলতেই হবে !" আমি ত কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিলাম না, কোন্ গোপালকুণ্ডুর উল্লেখ কবে করিয়াছি। অনেক জেরা করিয়া বুঝিলাম, জাহাজ-যাত্রার প্রথম দিন অনেকের মনে অনেক ভাব-তরঙ্গ উঠিয়াছিল। সেই সময় কপালকুণ্ডলার কথাও ওঠে, এবং "কপালকুণ্ডলাই" চাড়ুয্যের কাছে "গোপালকুণ্ডু" দাঁড়াইয়াছে ! প্রাচীন শিলালিপি উদ্ধার অপেক্ষা এ কাজটি কঠিন ছিল কি না, তাহার বিচার পণ্ডিতেরা করিবেন,—আমি আত্মহত্যা করিতে নারাজ।

আজ যোজনগন্ধাকে এত অল্প সময়ের মধ্যে ভোজন-রস্তায় রূপান্তরিত করিতে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কে বড় ! চাড়ুয্যে না মাতুল !

বলিলাম—"কেন মাতুল,—গাছের ওপর এত গরম হ'লেন কেন ?"

মাতুল ম্লানমুখে বল্লিলেন—"কি কুক্ষণেই যাত্রা ক'রে-ছিলাম,—গলাটা ত যেতেই বসেছিল,—এঁরা একেবারে গরদান্ নিলেন ! আপদ চুকে গেল—"

বুঝিলাম, মাতুলের ঘাড়ে মক্ষম্ লাগিয়াছে

তিনি নিজেই বলিয়া চলিলেন—"এ সব কি গাছ, না, মানুষমারা কল্ ! এখানে একটা health officerও নেই ! এর জড়্ মেরে দেওয়া উচিত।"

মাতুলের বেশ তোয়াজের শরীর,—দেখিয়াই সেটা বুঝিয়াছিলাম। দেহের উপর ষোলআনা দৃষ্টি রাখেন, তাই পরিবারের অসুখটা বড়ই ভাবনার কারণ হইয়াছে। যাহা হউক, বলিলাম—"এটা যে Non-regulated পরগণা—আইনের বড় একটা আঁট্ নেই।"

মাতুল। তা বুঝতে পেরেছি,—তা না ত আর এই সব তাড়কার মত সৃষ্টিছাড়া গাছ খাড়া ক'রে রেখেছে ! রাখতে হয়—আধখানা ক'রে বাদ দে না বাবা ;—আর রাখাই বা কেন ? এ কি একটা জায়গা মশাই,—পছন্দ দেখুন না,—যা পেয়েছে পুঁতেই চলেছে ! বাংলা দেশের মত দেশ আছে মশাই,—সব পদ্ধতি-দুরস্ত।—এই রায়েদের শিব-মন্দির, গায়েই বিলেতী কেষ্টচূড়ো, পরেই আমলকী, তার পর কদম,—পাশেই কামিনী বষ্টুমী বেগুনী ভাজচে, ধারেই নিমগাছ, তার পর বকুল ;—তলাতেই পল্টুর পানের দোকান ;—এক দোনা নিন্—জরদা আর পানের বোঁটায় চূণ চাইতে হবে না। তার পর গলিতে পা দিয়েই, ফুস্ করে বাড়ী ঢুকে পড়ুন,—হাস্‌না-হেনা ভর্ ভর্ ক'রে গন্ধ ছড়াচ্ছে ; বলুন ?

বলিলাম—"আহা, কি শুনালে মামা ! ও ছেড়ে স্বর্গও চাই না।" এই বলিয়া, হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিলাম :—

"নমো নমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি !
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি !
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদ-ধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লব-ঘন আম্র-কানন, রাখালের খেলা-গেহ,
স্তব্ধ অতল দীঘি কালো জল, নিশীথ-শীতল স্নেহ।

* * * দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজ গ্রামে।
কুমারের বাড়ী দক্ষিণে ছাড়ি রথগুলা করি বামে !
রাখি হাটখোলা নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে—"

মাতুলের আর অধিক শুনিবার সহিষ্ণুতা রহিল না, চোখ মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ; বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"ইয়া, ঈশ্বরগুপ্ত না হ'লে এ কথা আর কে বলে,—কেমন, তিনিই ত ?"

বলিলাম—"আর কার সাধ্য !"

মাতুল। হুঁ হুঁ, আর একবার বলুন ত !

আবার আবৃত্তি করিলাম। শুনিয়া বিমুগ্ধ মাতুল বলিলেন—"সে সব কবি আর জন্মাবে না।"

বলিলাম—"রামঃ—আর জন্মায় !"

মাতুলটি আগেকার বনেদী বংশাবতংস, তাই পুরাতনের এত পক্ষপাতী। এ সব ভুল চুক ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহাকে ক্ষুণ্ণ করা ভিন্ন অন্য কোন লাভ নাই।

কথায় কথায় কার্স্‌টেয়ার টাউনের (Carstair toun-এর) কেজোপটীতে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। অনবরত ঢং ঢং শব্দে অস্থির করিয়া দিল। অমর আমার হাত ধরিয়া সেই দিকেই টানিয়া লইয়া চলিল, বলিল—"দেখবে এস, এখানকার পেটা-লোহার জিনিস প্রসিদ্ধ। এরা লোহা পিটে পিটে বড় বড় কড়া, পরাত, কলসী, চাটু প্রভৃতি কি সুন্দর তয়ের করে ; কিন্‌লে সাত পুরুষ কেটে যায় ; এ ঢালায়ের জিনিস নয় যে, পড়লেই পাঁচ টুক্‌রো ! সস্তাও বেশ।"

দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম বটে। আধ মোণ লোহার তাল্ হাতের জোরে পিটিয়া বড় বড় কটাহ বা পরাতে পরিণত করা, অর্থাৎ হাজার লোকের খোরাকের খপ্পোর বানানো, অসুরের শক্তিসাপেক্ষ। ছোট বড় সব সাইজ্ই পাওয়া যায়। কিন্তু যে কারণে খদ্দর ভদ্দর বাঙ্গালীর কাছে আজও কদর পায় নাই, ইহারাও সেই কারণেই অভদ্রের কোটায় পড়িয়া আছে ; যেহেতু সৌখীন সৌষ্ঠবের নহে ও ভারি—তাই বাবুদের বাড়ী প্রবেশ নিষেধ। অন্যান্য প্রদেশে ইহাদের আদর যথেষ্ট, বিশেষ করিয়া ধনী রহিস্‌দের বাড়ী। অমর বাবু নয়, সে একখানা মাঝারি কড়া কিনিয়া ফেলিল। কন্যাপক্ষ চিরদিনই অধমর্ণ, মাতুল তাই তাড়াতাড়ি সেখানি বহন করিবার ভার লইতে অগ্রসর হইলেন। অমর দিল না।

আমার পরাত্ লইবার বরাত্ নয়, মাটির সরায় শেষ দিন কয়টা সরাইয়া দিতে পারিব। আমি ভাবিতে লাগিলাম এই কর্ম্মকারদের ভীম-শ্রমের কথা। এই শীতের দিনে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে উদায়াস্ত এই পেটাপিটির পর—'আধ-পেটা'য় সংসার-পালন !

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে একটি বাগিচায় ইঁদারা-খনন-কার্য্য দেখিয়া আসিয়াছি। মাটী কাটিয়া নয়,—পাথর কাটিয়া। তিন হাত মৃত্তিকা খননের পরই—পাষাণ-পিট্ দেখা দিয়াছে ! ইহারই অন্ততঃ ৩০ ফিট্ কাটিতে হইবে ! একবৎসরে প্রায় পাঁচ ফিটে পৌছান হইয়াছে ! কাজ হাড়ভাঙ্গা, পাওনা আধপেটা।

ভারতে ইতর-সাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ গরীব শ্রমিকদের মধ্যে পাপের ভয়, ভগবানে নির্ভর, ইজ্জৎ-জ্ঞান এবং সংসার আছে,—তাই ইহাদের জেলের বাহিরে দেখিতে পাই।

মাতুল বলিয়া উঠিলেন—"ও-মশাই, এখানেও যে 'মেডিকেল্ হল্', হোমিওপ্যাথ, বৈদ্য, সবই বিরাজমান ! তবে আর আমাদের কল্‌কেতা কসুরটা করলে কি ! গেরোয় টেনে এনেছে দেখচি,—বালা জোড়াটা যাবে কি না !

বলিলাম—"অসুখ বিসুখ আর কোথায় নেই মাতুল ; তবে এসব স্বাস্থ্যকর স্থান—এখানে কম্। 'যদি'র উপায়ও ত' রাখতে হয়।"

মাতুল বলিলেন—"কি বলচেন মশাই, এঁরা ত' আর এখানে দল্ বেঁধে আর ঘর বেঁধে, উপোস করতে আসেন নি ! এই কি 'যদি'র আয়োজন ! আবার "রাজ-বৈদ্য"টা কি মশাই ? যেমন যক্ষ্মা—রাজ-যক্ষ্মা, মক্কা—পাটনেয়ে-মক্কা ?"

বলিলাম—"রাজ-বৈদ্য" নামটি বোধ করি গৌরবাত্মক, অর্থাৎ—বৈদ্যের মধ্যে ওঁরা বোধ হয় M. D. (London) রাজাদের সঙ্গে সম্পর্ক নামে মাত্র। গড়াগড়া রাজ-বৈদ্য দেখচি,—এত রাজা-ই বা কোথায় ?

মাতুল আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"আপনি বলেন কি—মশাই, খবরের কাগজ দেখেন না বুঝি। "বাণিজ্য-নিপাত"

সমাচার আমি আজ বিশ বৎসর পেয়ে আসচি, এবং স্বচক্ষে দেখেও আসছি। তাতে দেখেছি—গরীবেরা বেশ নিয়মিত ভাবে মরচে আর কমচে; আর রাজা মহারাজা বছরে দু'তিন বার জন্মাচ্চেন। এ হারে জন্মালে, দিনকতক পরে এই গরীবের দেশটা—রাজার দেশ দাঁড়িয়ে যাবে;—সঙ্গে সঙ্গে সব দুঃখের অবসান। এখন থেকে রাজ-বৈদ্য ভয়ের না থাকলে—তখন 'ম্যাও' ধরবে কে?"

বলিলাম—"আপনার অনুমান অকাট্য বটে। মাথাটি মালগুদাম—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মাতুল ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"একটু দাঁড়ান—এক-পো রাবড়ী নিয়ে নি। এই দোকানটা দেখে রাখুন—তোফা তয়ের করে।"

অন্য চর্চ্চার সুযোগ হইল না, ভিন্ন পথে যে-যাহার বাসায় ফিরিতে হইল। অমরকে বলিলাম—"সকালে আস্‌চো ত'?" মাতুল বলিলেন—"ভাব্‌বেন না—আমি নিজেই পৌঁছে দেব।"

শ্রীমান অর্দ্ধপথেই "কাজ আছে" বলিয়া জয়হরি সহ ফিরিয়াছিল। পৌঁছিয়া দেখি—জয়হরি খুব মনোযোগের সহিত এক কাঁসী লঙ্কা-ফোড়ন্‌-দেওয়া কড়াইশুঁটি-ভাজা চর্ব্বণ করিতেছে। আমি উপস্থিত হইতেই শ্রীমানের দিকে চাহিয়া, খুব উৎসাহের সহিত বলিল—"এইবার সব এনে ফেলুন!"

অর্থটা অচিরে আত্মপ্রকাশ করিল,—কড়াইশুঁটি-ভাজা, কচুরী, পান্তুয়া আর চা উপস্থিত হইল। জয়হরি আমার দিকে তাকাইয়া বলিল—"আপনি না থাকায় এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে হয়েছে।" অর্থাৎ 'তাঁর চুপ করে না থাকাটা' এইবার আরম্ভ হইবে!

চা'য়ের অনুরোধে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া যোগ দিলাম। দেখি, দোরের কাছে সেই পলাতক কুকুরটা উঁকি মারিতেছে। শ্রীমানকে বলিলাম—"এই যে—ও এল' কখন?" শ্রীমান বলিল—"ওর ডাক্ শুনতে পেয়েই ত' ফিরেছিলুম। দেখি, ধাওয়া নদীর ধারে কেঁদে কেঁদে ফিরচে।" বলিলাম—"আজকের ব্যবস্থা কি করবে? নয় এটি নয় ওটি;—একটিকে ধর্ম্মশালায় পাঠান চাই!" শ্রীমান হাসিয়া বলিল—"বাবা বলেচেন—তাঁর ঘরেই থাকবে।" জয়হরি এ প্রসঙ্গে কর্ণপাতও করিল না—"উঃ—আস্তো একটা লঙ্কা চিবিয়ে ফেলেছি" বলিয়া দুইটা পান্তুয়া একত্রেই গালে ফেলিল।

আহারের আয়োজন পর্দ্দায় পর্দ্দায় চড়িতে লাগিল। বিপ্রদাস বাবুর "পাকপ্রণালী" প্যাঁটরা ছাড়িয়া পাকশালায় পৌঁছিয়া পরিপাকের পথ মারবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। রাত্রে ফুলকোলুচি, বেগুনভাজা, একত্র সংমিশ্রণে আলু কপি কড়াইশুঁটি ভাজা, গল্‌দা চিংড়ির কালিয়া, রোহিতের কোর্‌মা, পাঁপর প্রভৃতি; এবং কমলা ও বাতাবির রস-কোষ সম্মিলনে—শ্বেতপাথরের রেকাবী আলোকরা চাট্‌নি; কাগজিলেবুর রস-সিক্ত লবণ-সংযুক্ত আদার সূত্রবৎ ফালি; খেজুরে গুড়ের সুজির পায়স, হালুয়া, রসগোল্লা, ইত্যাদি চলিল।

দেখি ভিতরটা নিরেট হইয়া গিয়াছে;—সিগারেটের ধূম্ টাগরার ওপরে প্রবেশ-পথ পায় না। যাক্, ওটা তেমন মারাত্মক নয়; এখন নিদ্রার প্রয়োজন, কিন্তু শিয়রে শত্রু। শ্রীমানকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"নিকটে ভাল ডাক্তার আছেন কি?"

শ্রীমান উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন—ডাক্তার কেন?"

বলিলাম—"তা হ'লে একটা "মর্ফিয়া ইন্‌জেক্‌সন্" নিয়ে শুই। ভগবান কুকুরটার ত' কিনারা ক'রে দিলেন, এখন—"

শ্রীমান কেবল হাসে! একের বিপদে অন্যের যে কি করিয়া হাসি আসে তাহা বুঝিতে পারি না।

জয়হরি আশ্বাস দিয়া বলিল—"আজ অসাড়ে ঘুম হবে মশাই।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কার?"

জয়হরি বেশ সহজভাবেই বলিল, তাহার নিজের।

বলিলাম—"সে সম্বন্ধে ত কাহারো সন্দেহ উপস্থিত হয় নি। গত রাত্রে নিদ্রাটা কি তবে ভাল হয় নাই?"

জয়হরি বলিল—"তা আমি ত' বুঝতে পারি নি; বল্‌চেন—"নাক ডেকেছিল";—আজ আর তার ফাঁক নেই, তাই বলচি।"

হাসিবার কথা হইলেও, আমি কিন্তু শুনিয়া একটু আশ্বস্ত হইলাম; কারণ, নিদ্রা সম্বন্ধে জয়হরির জানাশোনা অধিক থাকাই সম্ভব।

যাহা হউক,—কাজে—আশার অর্দ্ধেক ফলও পাই নাই। স্মরণ আছে, ১১—১২ শেষ একটা পর্য্যন্ত বাজিতে শুনিয়াছিলাম। তাহার পর একটা অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। নাসিকা-ধ্বনির একটা দম্‌কা ধাক্কা মোটরের বিকট ওয়ার্নিংএর (warningএর) মত সহসা ধ্বনিয়া উঠিবার পরক্ষণেই জয়হরি জাগ্রতের মতই জোর গলায় বলিয়া উঠিল—"কে ডাকে?"

বুঝিলাম, তাহারই নাকের আওয়াজটা তাহার নিজের কাণে ঢুকিয়া এই বিভ্রম ঘটাইয়াছে! বলিলাম—"কেউ নয়। তুমি ঘুমোও";—বলাটা অবশ্য বাহুল্য ছিল!

অবাক্ হইয়া অন্যমনস্ক ভাবে কিছুক্ষণ এই অভিনব ব্যাপারটা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

শ্রাবণে

শ্রীরামেন্দু দত্ত

শ্রাবণ আজি বানের বেগে প্লাবন এল নিয়ে;
অধীর ধরা ধন্য হল সুধার ধারা পিয়ে!

উষর মরুর হল্‌দে বালি
ধূসর হয়ে জল্‌ত খালি,
সেথায় আজি পাথার হল
অথৈ সলিল দিয়ে।

যূঁথির বনে মোতির মেলা—
জলের ফোঁটা দোলে!
সোণার কাঠির পরশ পেয়ে
কলির আঁখি খোলে।

জীবন, ধরার শ্যামল বুকে
উথ্‌লে আজি উঠ্‌লো সুখে,
ভেজার নেশায় আজকে বিভল
সকল বেদন ভোলে!

ব্যাকুল শ্রাবণ মিলন মেলায়
বিপুল আয়োজন;
আঁধার মগন গগন হ'ল,
আকুল ত্রিভুবন!

ধীরে ধীরে কখন বাদল
বাজিয়ে দিল মৃদঙ মাদল,
মধুর মৃদু সুরের সীধু
ভরল পরাণ, মন!

বিজলী, কা'র কাজল—চোখের
উজল চপল চাওয়া!
কুন্তল কা'র উড়িয়ে দিল
উতল বাদল হাওয়া!
ঈশান কোণে নাচের তোড়ে
বিষাণ বাজে পাহাড় ওড়ে,
সৃষ্টিনাশা পাগল নেশার
জাগ্‌ল প্রবল ধাওয়া!

মুখর মেলা আবার হ'ল
নীরব ধীরে ধীরে!
কেউ আর ধরায় চম্‌কালো না
চপল চাওয়ায় চিরে!
থাম্‌ল মৃদঙ, থাম্‌ল মাদল,
নাম্‌ল নীরব ধরায় বাদল,
কালো মেঘের কুন্তল কা'র
রইল গগন ঘিরে!

ঈশান—কোণের প্রলয় নিশান
নামিয়ে কে ঐ ভাঙে?
বিষাণ—বাদল থামিয়ে দিয়ে
সন্ধি বুঝি মাঙে!
নীরব ধারায় সুধুই ধরায়
কাহার আঁখির অশ্রু গড়ায়,
শ্রাবণে আজ কোন্ বেদনে
নিখিল বক্ষ রাঙে?

সাময়িকী

এবারের সাময়িকী ঘটনার মধ্যে প্রধান কথা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীদিগের বেতনের প্রস্তাব সম্বন্ধে হাই-কোর্টের মামলা ; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সেই কথাটীই বলি।

বিগত ২৩শে আষাঢ় সোমবার হাইকোর্টে বিচারপতি শ্রীযুক্ত সি, সি, ঘোষ, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ব্যারিষ্টার মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত স্পেসিফিক রিলিফ এক্টের ৪৫ ধারায় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট মাননীয় মিঃ কটনের উপর মন্ত্রীদের বেতন বাবত ১,৭১,০০০৲ টাকার দাবী অতিরিক্ত বাজেট সম্পর্কে তুলিতে না দিবার আদেশ প্রার্থনা করিয়া যে দরখাস্ত করেন, তৎসম্পর্কে রায় প্রদান করেন। বিচারপতি তাঁহার সুদীর্ঘ রায়ে দরখাস্তকারীর পক্ষের কৌন্সিলী মিঃ এন, এন সরকার এবং মাননীয় মিঃ কটন ও মন্ত্রীদ্বয়ের পক্ষে এডভোকেট জেনারেল মিঃ এস, আর, দাশের যুক্তিতর্কের বিশদ আলোচনা করিয়া বলেন দরখাস্ত-কারীর প্রার্থনা এই যে (১) স্থায়ী অর্ডারের ৯৪ সংখ্যক বিধি অনুসারে অতিরিক্ত বাজেটে ৬ষ্ঠ দাবী নাকচ হইয়া যায় এবং (২) স্পেসিফিক রিলিফ এক্টের ৪৫ ধারায় তিনি দেখাইতে চাহেন (ক) দরখাস্তকারী যে রাজস্ব প্রদান করেন তাহা হইতেই এই দাবীর টাকা দেওয়া হইবে (খ) গত অধিবেশনে তিনি ভোট দিয়া এই দাবী অগ্রাহ্য করেন, কাজেই ঐ বিষয়ে পুনরালোচনায় তাঁহার ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ হইতেছে (গ) বঙ্গীয় কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে দরখাস্তকারীর কর্ত্তব্য এই যে কাউন্সিলের কার্য্য বিধিসঙ্গত ভাবে চলিতেছে কি না তাহা দেখা।

ইহার উত্তরে প্রতিপক্ষ বলিতে চাহেন যে (১) দরখাস্তকারী যে আকারে আদেশ চাহিয়াছেন, তাহা কোন কোর্ট কোন সময় প্রদান করেন নাই; এবং তিনি সেরূপ দাবী করিতে পারেন না (২) পার্লামেণ্ট ভারত-গবর্ণমেণ্ট আইন পাশ করিবার সময় স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ব্যবস্থাপক সভার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ; তাহার কার্য্যাবলীর সম্বন্ধে শাসন বা বিচার-বিভাগ কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই (৩) দরখাস্তকারী মিঃ কটনের নিকট যে ন্যায় বিচার চাহিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, এমন তিনি দেখাইতে পারেন নাই (৪) দরখাস্তকারীর ব্যক্তিগত স্বার্থের কোন ক্ষতি হইত না, সর্ব্বসাধারণের যেমন তাঁহারও তেমনি ক্ষতি হইতে পারিত। অথচ আইনে ব্যক্তিগত ক্ষতি দেখাইতে হইবে এবং (৫) ৯৪ সংখ্যক বিধিই চুড়ান্ত নহে ; ২১, ২৮ ও ৩৯ সংখ্যক বিধি এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট আইনের ৭২ (ঘ) ধারায় প্রেসিডেণ্টের ঐ দাবীর আলোচনা উঠিতে দিবার যথেষ্ট অধিকার আছে।

তৎপরে বিচারপতি এই সকল বিতর্কের আলোচনা করিয়া এবং স্পেসিফিক রিলিফ এক্টের উৎপত্তি হইতে এ যাবৎ উহা যে আকারে দাঁড়াইয়াছে; তাহার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়া বলেন যে, তাঁহার মতে দরখাস্তকারী প্রার্থনার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তিতর্ক দেখাইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ মিঃ কটন যে, তাঁহার ন্যায় বিচারের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। এই সকল কারণে বিচারপতি দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন ; মামলায় প্রতিপক্ষের ব্যয়ও তাঁহাকে দিতে হইবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী মামলার রায় প্রকাশ হইলে শ্রীযুক্ত কুমার-শঙ্কর রায় চৌধুরী ও কিরণশঙ্কর রায় চৌধুরী প্রভৃতির পক্ষে কৌন্সিলী মিঃ এস, সি, বোস প্রেসিডেণ্ট মাননীয় মিঃ কটন ও মন্ত্রীদ্বয়ের উপর ইন্‌জাংশন প্রার্থনা করেন। প্রতিবাদীদের পক্ষে এডভোকেট জেনারেল মিঃ এস, আর, দাশ দাঁড়াইয়াছিলেন। বিচারপতি প্রেসিডেণ্টের উপর ইন্‌জাংশন জারীর আদেশ প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু মন্ত্রীদিগের উপর ইন্‌জাংশন জারীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই সম্পর্কের খরচাও বাদীপক্ষকে প্রদান করিতে হইবে।

এদিকে হাইকোর্টে ত এক অঙ্কের অভিনয় অপরাহ্ণ প্রায় তিনটার সময় শেষ হইল ; ওদিকে কিন্তু সেই দিনই, সেই সোমবার সাড়ে তিনটার সময়ই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের সময়। এই জন্যই হাইকোর্টেও এত তাড়াতাড়ি। হাইকোর্ট হইতে যখন ইন্‌জংসন বাহির হইল এবং তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত কটন মহোদয়ের নিকট প্রেরিত হইল, তখন আর ইতি-কর্ত্তব্য স্থির করিবার সময় ছিল না। সুতরাং তখনকার মত যে নিরাপদ পন্থা, তাহাই অনুসৃত হইল ;—সভাপতি মহাশয় ব্যবস্থাপক সভার বৈঠক আরম্ভ হইলেই ঘোষণা করিলেন যে, মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর এক সপ্তাহের জন্য ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন বন্ধ রাখিলেন ; ৩০শে আষাঢ় পুনরায় অধিবেশনের দিন স্থির হইয়া গেল। পরে যে এই ব্যাপারের কি হইবে, তাহাই জানিবার জন্য সকলে উৎসুক রহিলেন।

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমনে সমগ্র দেশের মধ্যে একটা গভীর হাহাকার উঠিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে কেন, ভারতবর্ষ খুঁজিলেও সার আশু-তোষের মত আর একটী মানুষ মিলিবে না ;—এমন তেজস্বী, এমন মনস্বী, এমন কর্ম্মী পুরুষের তিরোধানে দেশের যে কি ক্ষতি হইল, তাহা এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমরা সকলেই মনে করিয়াছিলাম, হাইকোর্টের বিচারাসন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আশুতোষ বাঙ্গালা দেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার ন্যায় 'বেঙ্গল টাইগারে'র নেতৃত্বে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। কিন্তু, আমরা ভাবিলাম এক, বিধাতা অলক্ষ্যে বসিয়া অন্য বিধান করিলেন,—আশুতোষ অকস্মাৎ চলিয়া গেলেন।

তিনি ত গেলেন,—আত্মীয় স্বজন, দেশবাসী সকলকে অপার শোক-সাগরে ভাসাইয়া দিয়া, এই অসময়ে তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার জীবন-ব্যাপী সাধনার কীর্ত্তি-সৌধ বিশ্ব-বিদ্যালয় পড়িয়া রহিল ; একবার জিজ্ঞাসা করিবারও সময় হইল না, সুযোগ হইল না,—কাহার উপর এই গুরুভার তিনি ন্যস্ত করিয়া গেলেন, কে তাঁহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবে। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য কত জন কত রকম প্রস্তাব করিতেছেন। ভবানী-পুরের সাউথ সুবারবন কলেজের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'আশুতোষ কলেজ' নামকরণ হইল, বিশ্ব-বিদ্যালয় সংসৃষ্ট যে বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে, কেহ প্রস্তাব করিয়াছেন, সেইটীর নাম 'আশুতোষ ভবন' হউক ; কেহ বলিতেছেন, কলিকাতার কোন একটা বড় রাস্তার নাম আশুতোষ রোড হউক ; কেহ বা বলিতেছেন গোলদীঘির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া আশুতোষ স্কোয়ার নাম দেওয়া হউক। এ সকলই হউক ; কিন্তু ইহাই কি সেই পুরুষ-সিংহের স্মৃতিরক্ষার জন্য পর্য্যাপ্ত? ইহাতেই কি সেই পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি সাধিত হইবে? সকলেই একবাক্যে বলিবেন, সার আশুতোষের স্মৃতি-রক্ষার জন্য এ সকল আয়োজন যথেষ্ট নহে—ইহাতেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় সার আশুতোষের অতুল কীর্ত্তি ; বলিতে গেলে সার আশুতোষই বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ই সার আশুতোষ। এমন করিয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য মন প্রাণ সমর্পণ আর কেহই করেন নাই। সার আশুতোষ সত্যই বলিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান ছিল,—তিনি স্বপনে জাগরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গলচিন্তা করিতেন। সেই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় অর্থাভাবে বিপন্ন। সে দিন যে আয়-ব্যয়ের বিবরণ বাহির হইয়াছে, তাহাতে প্রায় দুইলক্ষ টাকা ঋণ দেখা যাইতেছে ; বর্ত্তমান বৎসরের শেষে সেই ঋণ চারি লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে। অবশ্য সার আশুতোষের স্মৃতি-সভায় এবং সেদিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণ সভায় বাঙ্গলার গবর্ণর মাননীয় শ্রীযুক্ত লিটন বাহাদুর বলিয়াছেন যে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই আর্থিক দুরবস্থা দূর করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিবেন ; সার আশুতোষের কীর্ত্তিস্তম্ভ রক্ষার জন্য তিনি সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হইবেন। গবর্ণমেণ্ট যাহা করিতে পারেন, যাহা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বোধ হয়, তাহা তাঁহারা করিবেন। কিন্তু সে জন্য আমাদের নিশ্চেষ্ট হইলে চলিবে না। সার আশুতোষের স্মৃতি রক্ষার জন্য অন্য যাহা

কিছু হয় হউক, কিন্তু দেশের লোকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, তাঁহার এই কীর্ত্তি বজায় রাখা। তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিবার জন্য তিনি যাহা মনে করিয়াছিলেন, এখনও যাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই, তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলেই তাঁহার আত্মার তৃপ্তি হইবে। দেশের সকলকে তাহার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। ইহার জন্য যথোচিত চেষ্টা যত্ন দেখিলেই আমরা বুঝিব যে, আমরা সত্যসত্যই সার আশুতোষের প্রতি ভক্তিমান।

বিগত ১লা আষাঢ় হইতে দুই দিন বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-স্মৃতি-উৎসব হইয়া গেল। নানা স্থান হইতে অনেক সাহিত্য-সেবক এই বঙ্কিম-তীর্থে সমাগত হইয়াছিলেন। সকলেই বৃষ্টি-বাদল উপেক্ষা করিয়া সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির তর্পণ করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় এই উৎসবে সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছিলেন। যাহাতে প্রতি বৎসর এই উৎসব সুসম্পন্ন হয়, তাহারও ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বঙ্কিমের স্মৃতি-রক্ষার জন্যও ক্রমে চেষ্টা হইবে। আমরা এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগী মহোদয়গণকে এই কার্য্যের জন্য অভিনন্দিত করিতেছি। এই উৎসবের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে ; ভরসা করি, বঙ্কিম-উৎসব-সমিতি কথা কয়টী প্রণিধান করিবেন।

বঙ্কিম-স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনাই প্রার্থনীয়। কিন্তু এই দুই বৎসরই দেখিলাম, কার্য্যকরী সমিতি তাহা না করিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কার্য্যপ্রণালীরই অনুসরণ করিতেছেন। সেই চারিটী শাখা, চারি শাখার চারিজন সভাপতি, সেই বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ পাঠের জন্য দেশব্যাপী নিমন্ত্রণ প্রেরণ, সেই সময়াভাবে অনেক প্রবন্ধ অপঠিত, কতকগুলি বা পঠিত বলিয়া গৃহীত, সেই সুলিখিত প্রবন্ধাবলিকে কবন্ধ করিয়া পাঠ, সেই তাড়াতাড়ি কার্য্য শেষ। আমরা বঙ্কিম সম্মিলনে এ প্রকার কার্য্য-প্রণালীর মোটেই সমর্থন করি না। আমরা বলি, বঙ্কিম-স্মৃতি-উৎসবে শাখা-প্রশাখার কোনই প্রয়োজন নাই, সকল সাহিত্যিকের নিকট প্রবন্ধ চাহিয়া নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণেরও কোন দরকার নাই। যে দুই দিন উৎসব হইবে, সে দুই দিনে তিনটী কি চারিটী প্রবন্ধ পঠিত হইবে ; এবং সেই সকল প্রবন্ধের বিষয় হইবেন বঙ্কিমচন্দ্র। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেই আলোচনা করিবেন ; অন্য কোন প্রসঙ্গই সভায় উপস্থাপিত করা হইবে না। এই ভাবে উৎসবের কার্য্য পরিচালিত হইলে সত্যসত্যই তাহা বঙ্কিম-উৎসব হইবে। এখন যাহা হইতেছে, তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনেরই দ্বিতীয় সংস্করণ। ইহা প্রার্থনীয় নহে। আগামী বর্ষে যাহাতে এই ভাবে কার্য্য পরিচালিত হয়, তাহার ব্যবস্থা হইলে, সকলেই প্রীত হইবেন এবং উৎসবও সুসম্পন্ন হইবে।

কিছু দিন পূর্ব্বে আমরা এক দিন মহিলা-কর্ম্মি-সংসদের কার্য্যভবন দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। মহিলাদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এই মহিলা-কর্ম্মি-সংসদের অন্যতম উদ্দেশ্য। তা ছাড়া, সংসদ একটী আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। উপায়-হীনা, আশ্রয়হীনা, সহায়হীনা, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহবঞ্চিতা বাঙ্গলার নারীদিগকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। আশ্রমবাসিনী কয়েকটী মহিলাকে চরকা ও তাঁতের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে দেখিলাম। সংসদের উদ্দেশ্য যে মহৎ, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে বাঙ্গলার অন্য সকল সদনুষ্ঠানের ন্যায় এই মহিলা-কর্ম্মি-সংসদেরও প্রধান অসুবিধা—অর্থাভাব। খুব সম্ভবতঃ যথেষ্ট অর্থাভাবে সংসদ তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে পারিতেছেন না। অথচ বাঙ্গলায় ইহার বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সংসদের কর্ত্রী শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার মহাশয়া আজ সমগ্র বঙ্গদেশে—শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতে—প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ধৈর্য্য-সহকারে প্রতীক্ষা করিলে কালে তিনি সংসদকে একটী মহান প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে পারিবেন।

সোণার কাটি

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু

কলিকাতা সহরের একটা ছোট গলির উপরে একখানা পুরাতন বাড়ী,—বোধ হয় কালে কোন বড়লোকের নাটমন্দির বা পূজার বাড়ী ছিল। হোটেলের অন্নে দেহধারী কতকগুলি অল্প-বেতনের কেরাণীবাবু কুটুরী ভাড়া লইয়া এখন ইহাতে বাস করিতেছেন। এই বাড়ীর উঠানের এক পার্শ্বে একটী জলের কল আছে। এই কলে প্রত্যহ স্নান করিতে আসিত একটী স্ত্রীলোক। তার বয়স অনুমান বাইশ তেইশ বৎসর হইবে। এই বাড়ীর ঠিক সাম্‌নেই গলির অপর পারে একটা বড় বাড়ীর একটা অংশে সে বাস করিত। তার নাম ছিল কনক, তার কান্তিও ছিল ঠিক কনকের মত। অমন স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতিমাখানিকে ভগবান যে কেন শুধু রূপ বিক্রী করিবার জন্য সৃষ্টি করিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইত না। বাড়ীতে তাহার স্নানের অসুবিধার জন্যই হউক, অথবা যেখানে এতগুলি পুরুষ "হোমরুল"এর কঠিন 'শতমুখী' শাসন হইতে মুক্ত হইয়া একাকী বাস করেন, সেখানে জাল ফেলিতেই হউক, সে রোজ স্নান করিতে এই বাড়ীতেই আসিত। বাড়ীর ভাড়াটে বাবুরা কোন দিন ইহাতে আপত্তি করেন নাই, বরং তাঁহারা ইহা পছন্দই করিতেন। কাহারও কাহারও শুধু দর্শন দ্বারা নয়ন-মনের তৃপ্তি-সাধন হইত ; কোন কোন রসিক বাবুর বাক্যালাপ, রসালাপ পর্য্যন্তও বিনা পয়সা-কড়ি খরচায় হইয়া যাইত। কাজেই ইহাতে কাহারও আপত্তির কোন কারণ ছিল না ; বরং তাঁহারা আপনাদিগকে এজন্য গৌরবান্বিত মনে করিতেন ; এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে নিজেদের এই সৌভাগ্যের কথা বলিয়া বেড়াইতেন। এই বাড়ীতে একজন ভাড়াটিয়া ছিলেন—গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তিনিই কেবল এই ব্যাপারটী পছন্দ করিতেন না ; কিন্তু সাহস করিয়া কিছু বলিতেও পারিতেন না। এ বিষয়ে একবার একটু ইঙ্গিত করিতেই, সবাই মিলিয়া তাঁহার মত নীতিবাগীশকে অন্যত্র বাসা খুঁজিতে সুপরামর্শ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ গরীব মানুষ,—অল্পবেতনের চাকুরী করিতেন,—অনেকগুলি পোষ্য। এই বাড়ীর 'রুম'গুলির ভাড়া ছিল অপেক্ষাকৃত কম,—তাই ইচ্ছাসত্ত্বেও তিনি এই স্থান ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

সেদিন রবিবার। বাসার অনেকেই স্নানাদি সমাপন করিয়া আহার অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন। কনক আসিয়া চৌবাচ্চার একটু আড়ালে বসিয়া স্নান করিতেছিল। দুই চারিজন অতিরিক্ত সুরসিক যুবক তৈল মাখিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ; এবং কনকের জন্যই যে তাঁহাদের স্নানে বিলম্ব হইতেছে,—হোটেলে যদি ঠাণ্ডা ভাত খাইতে হয়, তবে সে জন্য কনকই যে একমাত্র দায়ী, তাহা বুঝাইয়া দিতেছিলেন ; এবং কটাক্ষে মনের সুদূর দেশের আরও অনেক কথা টেলিগ্রাফ্ করিয়া জানাইতেছিলেন। কনক হাসিয়া হাসিয়া উত্তর দিতেছিল এবং ইচ্ছা করিয়াই স্নানে বিলম্ব করিতেছিল। এমন সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় আহার সমাপন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। আহার করিয়া রৌদ্রে অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছিল, তাই অত্যন্ত পিপাসা পাইয়াছিল। জলের কুঁজায় হাত দিয়া দেখিলেন, কুঁজা শূন্য,—আজ সকালে জল রাখিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। গ্লাস লইয়া কলের নিকটস্থ হইয়া, কনককে স্নান করিতে দেখিতে পাইয়া অপ্রতিভ হইয়া, লজ্জিত ভাবে ফিরিয়া আসিলেন। প্রায় পনের মিনিট গত হইল, কনককে ফিরিতে দেখিলেন না। ব্রাহ্মণের পিপাসা প্রবল হইল। অগত্যা পুনরায় গ্লাস লইয়া কলের নিকটস্থ হইলেন। একটী রসিক যুবক বলিতেছিলেন—'কি গো কনক, তুমি আমাদের আজ নাইতে দেবে না?' কনক ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—'নাবে, নাবে,—অত ব্যস্ত কেন?" এমন সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় চৌবাচ্চার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন—'মা, বড় পিপাসা, একটু জল নিতাম।' 'নিন্ না, নিন্ না' বলিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া, সরমজড়িত কোমলতাময় সঙ্কোচের সহিত সে বাল্‌তী উঠাইয়া, গায়ে কাপড় টানিয়া দিয়া চলিয়া গেল। কনকের এই মূর্ত্তিটী বাবুদের চক্ষে আজ নূতন ঠেকিল। সেই প্রগল্‌ভা, চঞ্চলা স্ত্রীলোকটী,—যার ব্যবসাই

পরের মন মজান ও নিজে না মজা,—সে যে এমন এক মুহূর্ত্তে একটী গৃহস্থের কুলবধূর, সরমজড়িত পল্লীবালার অভিনয় করিতে পারে, তাহা দেখিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইলেন।

একজন স্নান করিতে করিতে গুণ্ গুণ্ করিয়া রাগিনী ভাঁজিতে ভাঁজিতে বলিলেন—'এটা কি রাগিনী বুঝ্লে হে সুরেন্? এই সময়েরই রাগিনী,' এই বলিয়া তিনি পুনরায় রাগিনীর আলাপে মন দিলেন। আর একজন বলিয়া উঠিলেন—'বেশ মিষ্টি ভাই, উঁচু থেকে নেবে এসে নীচের কোমলে যেখানটায় দাঁড়াচ্ছে, সেইখানটা ভারি মিষ্টি!'

বিশ্ব-প্রকৃতির কণ্ঠেও কি আজ কনকের জীবন-রাগিনী এমনি করিয়া করুণ মধুর কোমলে আসিয়া দাঁড়াইল!

(২)

কনকের ভিতর এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। সেদিন স্নান করিয়া আসা অবধি তাহার মন যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। সেদিন সে ভাল করিয়া আহার করিল না, সারাদিন বসিয়া বসিয়া কি যেন কেবলি ভাবিতে লাগিল। চুল বাঁধিল না, বেশভূষা করিল না, কাহারও সহিত দেখা করিল না,—বলিয়া পাঠাইল, শরীর খারাপ। অনেকক্ষণ বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া ভাবিয়া বুঝিল, তাহার ভিতরে কি যেন এক পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—জগৎ সংসার তার চোখে এত দিন যেমন ভাবে, যেমন গতিতে চলিয়া যাইতেছিল, আজ যেন তাহা আর নাই। সংসারের সুর-তালের মাঝে আজ তাহার মন বেতালা, বেসুরা বাজিতেছিল। কেন যে হঠাৎ এমন সুন্দর মোহময় সংসার বিষময় হইয়া উঠিল, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। কি যেন নাই, কি যেন তার চাই, এমনি একটা ভাব কখনো কখনো মনের মাঝে উঁকি মারিয়া ডুবিয়া যাইতেছিল। অনেক চিন্তায়, কতক নিদ্রায়, কতক অনিদ্রায় বহু কষ্টে সে রাত্রির অবসান হইল।

পর দিন প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিবার জন্য কনক বাহির হইয়া পড়িল। একটু অগ্রসর হইয়া এক স্থানে দেখিল, একটী কুলী রমণী তাহার শিশু সন্তানকে স্তন্য পান করাইতেছে। হঠাৎ তাহার উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহার প্রাণের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল; কিন্তু সে ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না, উঠিয়াই ডুবিয়া গেল। আরো কিছুদূর অগ্রসর হইতেই তাহার দৃষ্টি পড়িল, একটী গৃহস্থের জানালার উপর—জানালায় দাঁড়াইয়া কোলের শিশুকে মা আদর করিতেছিলেন,—শিশুর গোলাপ ফুলের মত দুইটী গণ্ডে অঙ্গুলি সংলগ্ন করিয়া নাড়া দিতেছিলেন; শিশু হাসিয়া আকুল হইতেছিল; শিশুর মা অজস্র চুম্বনে তাহাকে আরো হাসাইয়া আকুল করিতেছিলেন। মাতৃস্নেহের সেই অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কনক হঠাৎ যে কখন সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল, তাহা সে জানে না। শিশুকে লইয়া মা চলিয়া গেলে, তাহার জ্ঞান হইল যে, বোধ হয় অনেকক্ষণ সে সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে চলিতে লাগিল। এখন যেন মনের মাঝে একটু একটু স্পষ্টীকৃত হইতে লাগিল—তার সারা অন্তরের বেদনার ও সকল চিন্তার কেন্দ্র কোথায়!

স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া এটা সেটা করিতে করিতে বাক্স খুলিয়া সে একখানা ছবি বাহির করিল। ছবিখানায় আঁকা ছিল—একটী ১৫।১৬ বৎসর বয়স্কা মায়ের কোলে একটী দুই তিন মাসের শিশু,—মায়ের প্রথম সন্তান। মা ১৯।২০ বৎসর বয়স্ক শিশুর পিতাকে এই প্রথম সন্তান প্রথম দেখাইতেছেন। তাঁহাদের লজ্জিত মুখে সাফল্যের আনন্দ উথলিয়া পড়িতেছিল। এ ছবিখানা তাহাকে দিয়াছিল তাহার প্রথম যৌবনে তাহারই একজন প্রণয়ী। কিন্তু ছবিখানাকে সে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিত। সে তাহার জীবন অজস্র আনন্দের মাঝে, অফুরন্ত স্ফূর্ত্তি, হাসি, গানের মাঝে, প্রাণ-বেচা-কেনা ব্যবসার মাঝে কাটাইয়া দিবে, এই ছিল তার জীবনের আদর্শ। ছোট ছেলেমেয়ে তার কখনো ভাল লাগিত না। আজ কিন্তু এই ছবিখানি তাহার বড়ই সুন্দর লাগিতেছিল। অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া আশা মিটিতেছিল না। বাঁধাইয়া সাম্নে টাঙ্গাইয়া রাখিবার জন্য সে ছবিখানি দোকানে পাঠাইয়া দিল।

পাশের বাড়ীতে একটী শিশু কাঁদিতেছিল। ইতি-পূর্ব্বে যখনি এই শিশুকে কাঁদিতে শুনিয়াছে, তখনি সে বিরক্ত হইয়াছে। এই কান্না কখনো কখনো তার সঙ্গীত সাধনায় বাধা জন্মাইত বলিয়া, এই বেসুরা বেতালা

শিশুদের উদ্দেশে এবং তাহাদের পিতামাতা ও সৃষ্টি-কর্ত্তার উদ্দেশে সে শত গালি দিত। আজ কিন্তু তাহার সে ভাব নাই,—আজ যেন সে এই শিশুর কান্নার মাঝে বিশ্বের সুর খুঁজিয়া পাইতেছিল। আজ তার মনে হইতেছিল, ঐ শিশুটী যখন কাঁদে, তখন যদি তার মা তাকে তাহার নিকটে লইয়া আসে, তবে সে তাহাকে খেলা দিয়া, ছবি দেখাইয়া, কান্না ভুলাইয়া হাসাইয়া দেয়।

কনকের মনে সুখ নাই, প্রাণে শান্তি নাই। আহার-নিদ্রা সে এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছে, বেশভূষার প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই; দিন রাত বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কেবলি ভাবে, আর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। এমনি করিয়া আরো দুই চারি দিন গত হইল। এখন আর সে বাবুদের বাসা বাড়ীতে স্নান করিতে যায় না, খুব ভোরে গঙ্গায় গিয়া স্নান করিয়া আসে।

সেদিন বৈকালে বড় গরম পড়িয়াছিল; তাই সে মাথার কাছের জানালাটা খুলিয়া দিয়া, বাহিরের দিকে অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়া ছিল। অনেকক্ষণ পরে তাহার মনে হইল, তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার মন তাহার চক্ষু দুইটীকে নিয়োজিত করিয়াছিল একটী ফলভরে অবনত আম্রবৃক্ষের প্রতি—গাছটী যেন তাহার সকল ঐশ্বর্য্যে, সকল ভূষণে ভূষিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল! কনকের সমস্ত অন্তর কাঁপিয়া একটী সুগভীর দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া পড়িল,—কেন, তা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না।

এক দিন সে গঙ্গা হইতে স্নান করিয়া ফিরিতেছিল, কোন কারণে ফিরিতে একটু দেরী হইয়াছিল। অন্যমনস্ক ভাবে কি ভাবিতে ভাবিতে সে চলিয়াছে। একটা বাড়ীর সাম্নে আসিয়া পৌঁছিতেই সহসা তাহার কর্ণে একটী বালকের চীৎকার-ধ্বনি পৌঁছিল—'মা—আ—আ—'। চাহিয়া দেখিল, একটি সাত-আট বৎসরের বালক একটী খাকীরঙ্গের হাফ্ প্যাণ্ট ও কামিজ পরিয়া হাতে বই শ্লেট লইয়া ছুটিতে ছুটিতে বাড়ীর দরজার সাম্নে আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে—'মা'! মা সেই চীৎকারে ছুটিয়া দরজার নিকট আসিতেই, বালক ছুটিয়া মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মা ছেলেকে একেবারে কোলে উঠাইয়া লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। এই 'মা—আ—আ—' ধ্বনি বালকের কণ্ঠে যেমন ক্রমে উঁচু হইতে উঁচু পর্দ্দায় ধ্বনিত হইতেছিল, তাহা সঙ্গে সঙ্গে সপ্ততাল বেধের মত, এক মুহূর্ত্তে যোগীর ষটচক্র ভেদের মত, কনকের অন্তস্তল ভেদ করিয়া গভীর হইতে গভীরতম প্রদেশে ধ্বনিত হইয়া গেল। তাহার প্রতি শিরায় শিরায়, প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে, প্রত্যেক স্নায়ুতে বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। তাহার বোধ হইল, যেন আকাশ হইতে তাহার উপর বিদ্যুৎ বর্ষিত হইল,—সে পড়িয়া যাইতে যাইতে নিজেকে সামলাইয়া লইল।

আজ সে পথ দেখিতে পাইল। এই কয়েক দিন যাহা সে অন্তরের ভিতর হাতড়াইতেছিল, আজ তাহা একেবারে স্পষ্ট হইয়া গেল। তার বুভুক্ষিত অন্তরের আকুল পিপাসা সে আজ বুঝিতে পারিল,—তার প্রাণ চায় এমনি একটী আকুল 'মা' ডাক। যেদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে প্রথম মাতৃ সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—'মা, বড় পিপাসা,' সেই দিনই তার প্রাণের মাঝে কেমন একটা ব্যাকুলতার ভাব, অভাবের অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে সময় সে বুঝিতে পারে নাই—তার সকল অন্তর এই 'মা' ডাকই চায়। তাহাকে কেহ কখনো 'মা' বলিয়া ডাকে নাই,—'মা' ডাকের ভিতর বিশ্বের কতটা শক্তি আছে, তা সে কখনো জানে নাই। তাহার ভিতরের মাতৃশক্তি ঘোর সুষুপ্তিতে মগ্ন ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'মা' ডাক তাহার সুপ্ত মাতৃত্বে আঘাত করিয়া, ঘুমের ঘোর কাটাইয়া দিয়াছিল। আজ সে ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে জাগিয়া উঠিল।

(৩)

এ কয়েক দিনের অস্থির উদ্বিগ্ন চিত্ত তাহার এখন একটা নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল। কনক তাহার গত জীবনের কথা অনেক ভাবিল। তাহার মনে অনুতাপ জাগিয়া উঠিল, কিন্তু সে কোন পথ দেখিল না; ভাবিল, নারীজন্মটা তার একটা অসার্থকতার ভিতর দিয়াই কাটিয়া গেল। তাহার নিজের প্রতি কেমন একটা বিষম ঘৃণা হইল। সে এসকল বিষয় যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মন অস্বস্তিতে পূর্ণ হইতে লাগিল। ক্রমে তাহার মন এতদূর কাতর হইয়া পড়িল যে, সে কলিকাতা ত্যাগ করাই স্থির করিল। জিনিষপত্রাদি সব বেচিয়া ফেলিয়া, কিছু অর্থ সম্বল করিয়া, অতি সাধারণ বেশে সে কাশী যাত্রা করিল।

সে একখানা স্ত্রীলোকের গাড়ীতে উঠিয়াছিল। যদিও বেশভূষা তাহার তেমন কিছু ছিল না, তথাপি অন্যান্য আরোহিণীরা তাহাকে ঘৃণিতা স্ত্রীলোক বলিয়া বুঝিয়াছিলেন; কেহই তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া বসিতে রাজী হইলেন না। অন্যান্য বেঞ্চে খুব ভিড় হইতেছিল, তথাপি, সে যে বেঞ্চে বসিয়াছিল, সেখানে প্রথমে কেহই বসিলেন না। পরে গাড়ী যখন মোকামা ঘাটে পৌঁছিল, তখন অত্যন্ত ভিড় হওয়ায় নূতন আরোহিণীদের মাঝে কেহ কেহ বিতৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া এই বেঞ্চে বসিয়া পড়িলেন। কনকের পাশেই বসিয়াছিলেন একটী শিশু কোলে করিয়া তাহার মা। শিশুটী মায়ের কোলে খেলা করিতে করিতে মাঝে মাঝে কনকের দিকে হাত বাড়াইতেছিল। কনক উৎফুল্ল হইয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া ডাকিল—'এসো'। মা কনকের কোলে দিতে যাইতেছিলেন,—হঠাৎ তাঁহার শাশুড়ী তাঁহার হাত হইতে শিশুকে ছিনাইয়া লইলেন, এবং তাহার মায়ের কাণে কাণে কি বলিলেন—কনক লজ্জায় মরিয়া গেল! জানালার দিকে ফিরিয়া সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, মনে মনে বলিল, হায়, ভগবান! এই হতভাগিনী পাপিনী স্পর্শ করিলে ঐ শিশুর অমঙ্গল হইবে! তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া পাষাণের বুকে নির্ঝরের মত বহিয়া চলিল। সে সারাপথ কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইল। পরদিন দ্বিপ্রহরে সে কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইল।

(৪)

কাশীতে আসিয়া না ভদ্র না ইতর এমন একটা পল্লীতে অনেক চেষ্টায় তাহার একটু থাকিবার স্থান মিলিল। এখানে আসিয়া সে অনেকটা শান্তি পাইল। সকালে খুব ভোরে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া সে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন করিত, দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর একটু পড়াশুনা করিত, বৈকালে ঘাটে নামকীর্ত্তন শুনিয়া এদিক ওদিক বেড়াইয়া দিন কাটাইয়া সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিয়া আসিয়া আবার পড়াশুনায় মন দিত। এরূপ করিয়া তাহার দিন কাটিতে লাগিল। যদিও তাহার প্রাণের নব জাগরিত আকুল আকাঙ্ক্ষা ক্রমে অনেকটা সংযত হইয়া আসিয়া মনে শান্তি আনিতেছিল, কিন্তু এরূপ জীবনে সে কখনো অভ্যস্ত নয়। রাত্রিতে বাসায় ফিরিয়া তাহার বড়ই নিঃসঙ্গ বোধ হয়। গত জীবনের মোহময় স্ফূর্ত্তির ছবি স্বপ্নের মত তাহার চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠে, প্রাণের মাঝে কেমন একটা হাহাকার জাগিয়া উঠে। কিন্তু সেই গত জীবনে ফিরিতে আর তাহার আদৌ ইচ্ছা হয় না,—উহার উপর তাহার প্রবল ঘৃণা জন্মিয়াছে।

এক দিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিয়া সে একখানি উপন্যাস লইয়া পড়িতেছিল। সে দিন বাহিরে খুব মেঘ ও আঁধার জমিয়াছিল, অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতেছিল। উপন্যাসখানিতে বর্ণিত হইয়াছিল স্বামী স্ত্রীর পবিত্র ভালবাসার ইতিহাস। পশ্চিমের একটা ছোট সহরে সামান্য একখানা ছোট বাড়ী ভাড়া লইয়া দুইটী প্রাণী থাকিতেন। স্বামী খুব সামান্যই বেতন পাইতেন। তাহা দিয়াই তাঁহার স্ত্রী কেমন পারিপাট্যের সহিত সংসার চালাইতেন, তাঁহার স্বামীকে কত আরামে রাখিয়াছিলেন, এবং কত নিবিড় পবিত্র প্রেমের মাঝখান দিয়া সহজ ও সরলভাবে তাঁহাদের জীবন-প্রবাহ চলিয়া যাইতেছিল, তাহাই গ্রন্থকার দেখাইয়াছিলেন। বইখানি পড়িতে পড়িতে আঁধার প্রাণে মেঘের উপর মেঘ জমিয়া তাহাকে একেবারে গাঢ় অন্ধকারে ডুবাইয়া দিতেছিল। পুস্তক শেষ করিয়া সে আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল; বলিল—'হায়, বাবা বিশ্বনাথ, হতভাগিনীর জীবন বৃথা গেল! এ হৃদয় চির আঁধারেই ডুবিয়া থাকিবে। এ বর্ষার অবসান নাই। এ হৃদয় শরতের চাঁদের বিমল জোছনায় কখনো উজ্জ্বল হইবে না।

পর দিন সকালে গঙ্গাস্নান করিয়া সে একটী গলির ভিতর দিয়া বাসায় ফিরিতেছিল। দেখিল, একটী যুবক স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। যুবকের দক্ষিণ হস্তে একটী ব্যাগ্, বাম হস্তে স্ত্রীর হাত ধরিয়া চলিয়াছেন—স্ত্রীর কোলে শিশু পুত্র। যুবককে দেখিয়া কনক শিহরিয়া উঠিল; তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে দেখিয়া তাহার সমস্ত প্রাণের আকুল আকাঙ্ক্ষা মাথা নাড়া দিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এ যে সেই দেবেন্দ্রনাথ! সে যখন তার প্রথম যৌবনে প্রথম রূপের ব্যবসা খুলিয়া বসিয়াছিল, তখন এই দেবেন্দ্রনাথ তাহার অতুল রূপরাশি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। সে কলেজের শত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও তাহার কাছে আসিত। কনকের সেই স্বর্গীয় রূপরাশির অধঃপতনে সে প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইয়াছিল, সহানুভূতিতে তার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল। সে আসিয়া বলিয়াছিল, পূর্ব্বজন্মে তুমি কত তপস্যা ক'রে এমন রূপ আর এমন কণ্ঠস্বর পেয়েছ, নষ্ট ক'রো না,—চলো; তোমায় নিয়ে কোথাও চ'লে যাই। আমরা স্বামী-স্ত্রীর মত থাকিব, চিরদিন আমি তোমায় সমান ভালবাসিব। তোমার এই দু'দিনের অধঃপতনের কথা মনে করিয়া আমি তোমাকে কখনো হীন মনে করিব না,—অবশ্য যদি তুমি মন থেকে চিরদিনের জন্য এই কুপ্রবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দাও।' হতভাগিনী কনক তখন নিত্য নূতনে মুগ্ধ—আরো নূতন, আরো নূতন, আরো ভাল চাই! ক্রমেই তার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যাইতেছিল। সে অনন্ত স্ফূর্ত্তির অন্ত খুঁজিতে খুঁজিতে চলিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথকে সে প্রত্যাখ্যান করিল। তার পর আজ সাত আট বৎসর গত হইয়াছে। সে দেবেন্দ্রনাথকে চিনিল; কিন্তু দেবেন্দ্র তাহাকে চিনিল না বা লক্ষ্য করিল না,—তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে মনের আনন্দে অসীম প্রেমের লহর তুলিয়া গল্প করিতে করিতে হাসিয়া খেলিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষিত হইতেছিল সেই সুন্দর-কান্তি শিশুর প্রতি—তার কাজল-পরা বড় বড় চো'খ দু'টীর প্রতি, তার ভুবন-ভুলান হাসির প্রতি—ভগবানের আনন্দময় ভাবের অভিব্যক্তির প্রতি! দেবেন্দ্রনাথ সেই অল্পপরিসর পথে কনকের ঠিক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। তাহার শরীরের হাওয়া পর্য্যন্ত তাহার গায়ে লাগিল। কনকের সমস্ত শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইল, হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন হইতে লাগিল, দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে লাগিল, তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। পথের পাশে একটু দাঁড়াইয়া, নিজের চঞ্চল দেহ-মনকে একটু স্থির করিয়া, একটী সুগভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে আবার চলিতে লাগিল। ভাবিল—হায়, হতভাগিনী আমি! সেদিনও যদি ফিরিতাম, তবে আজ এ জগতে আমার মত সুখী কে! হায়, অমন সুন্দর শিশুটী! একটীবার কোলে করিতে দেয় না? না, না, তা দেবে কেন? আমি যে অপবিত্রা, আমার স্পর্শে ওদের অমঙ্গল হয়।

সেদিন বাসায় ফিরিয়া কনক বিছানায় পড়িয়া রহিল। রাঁধিল না, আহারও করিল না, শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাসে ঘরের বায়ু যেন কাঁপিতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল—'বিশ্বনাথ, কেন উহাদিগকে আজ আমার সামনে এনে ফেল্‌লে? কেন আমায় এ জ্বালা দিলে? তোমার উদ্দেশ্য কি? দিন দিন জ্বালা যে বাড়িয়াই চলিল। দুঃখকষ্ট যে জানিতাম না। তোমার আশ্রয় লইয়াছি, কিন্তু তুমিও তো আমার দুঃখের বোঝা দিন দিন বাড়াইয়াই চলিয়াছ!' হঠাৎ খোলা জানালা দিয়া তাহার নজর পড়িল সাম্‌নের বাড়ীর একটী জানালার দিকে! দেখিল, একটী যুবক সেখানে দাঁড়াইয়া, তাহার বুভুক্ষিত অন্তরের সমস্ত জ্বালাময়ী তৃষা দিয়া, লালসাময় বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া, তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। ক্রোধে কনকের গা কাঁপিতে লাগিল। তাহার প্রতি এম্‌নি তীব্র কটাক্ষ করিল, যেন সম্ভব হইলে চোখের দৃষ্টি দিয়া তাহাকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দেয়। খপ্ করিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া সে কি যেন একটু ভাবিল। তার পরে কাঁচি বাহির করিয়া নিজ হস্তে তার সেই সযত্নবর্দ্ধিত কত সাধের চব্বিশ বৎসরের কেশরাশি কাটিয়া ফেলিল; গায়ে এক-আধখানা গহনা যাহা ছিল তাহা খুলিয়া ফেলিল। সেদিন সন্ধ্যায় যখন সে থান কাপড় পরিয়া নিরাভরণে কেশহীন মস্তকে বিশ্বনাথের আরতি দেখিতে গেল, তখন আর তাহাকে দেখিয়া কোন স্ত্রীলোক সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া সরিয়া গেল না—তার পূর্ব্ব জীবনের ইতিহাস যেন মুছিয়া গিয়াছে। আজ তাহাকে ভদ্রঘরের বিধবা ব্রহ্মচারিণীর মতই দেখাইতেছিল।

(৫)

একটি বৎসর কাটিয়া গেল। ব্রহ্মচারিণীর জীবনে বিশ্বনাথের কৃপায় একটু একটু করিয়া শান্তি আসিতে লাগিল। এক দিন খুব ভোরে উঠিয়া কনক গঙ্গাস্নানে বাহির হইয়াছে; গলি হইতে নামিয়া নদীর তীর বাহিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ সবিস্ময়ে সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, কাপড়ে মোড়া কি একটা রাস্তায় পড়িয়া রহিয়াছে! তখনও ঊষার আলোক বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই,—নদীর ধারে লোকজনের যাতায়াত বিশেষ আরম্ভ হয় নাই। নিকটে গিয়া লক্ষ্য করিয়া অধিকতর বিস্ময়ে সে দেখিল—একটি সদ্যপ্রসূত শিশু! 'হায়, কোন্ হতভাগিনী তার বুকের ধন এম্‌নি করিয়া ফেলিয়া গেল!' এদিক ওদিক তাকাইয়া অতি সাবধানে সে শিশুটিকে উঠাইয়া কোলে লইল, কোলে

লইয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল—তার কত কালের তাপিত, বুভুক্ষিত বুক যেন আজ শীতল হইল! মনে মনে বলিল—'বাবা বিশ্বনাথ, তোমার কৃপায় আজ আমি ধন্য হইলাম।' সেদিন আর তার গঙ্গাস্নান হইল না। শিশুকে কাপড়ের ভিতরে ঢাকিয়া লইয়া সে বাসায় ফিরিয়া আসিল। আজ প্রভাতের নবীন আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাহার বহুদিনের আঁধার হৃদয়েও নবীন উষার আলো ফুটিয়া উঠিল।

যে কনক এক দিন শিশুর কান্নায় ভয়ানক বিরক্ত হইত, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে অশান্তি ঝঞ্ঝাটের কারণ, আমোদ-প্রমোদ স্ফূর্ত্তির অন্তরায় মনে করিত, সন্তান হওয়ার কষ্টকে পাপের সাজা মনে করিত,—সে আজ তাহার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া, নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সব বিসর্জ্জন দিয়া, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এই ক্ষুদ্র শিশুর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিল। আজ তাহার হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছিল না, আজ যেন তাহার ব্যর্থ জীবন সার্থকতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। নিষ্ফল জীবনের করুণ দীর্ঘশ্বাস আজ তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছে, তাহার স্থলে আজ আশা ও আনন্দের মলয় সমীর বহিয়াছে।

তাহার অক্লান্ত যত্নে, যথাসাধ্য অর্থব্যয়ে ও অনবরত বিশ্বনাথের চরণে এই বালকের মঙ্গল প্রার্থনায় বালক জীবনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। সে এখন গঙ্গাস্নান ত্যাগ করিয়াছে,—বিশ্বনাথের আরতি দেখাও আর তাহার হইয়া উঠে না। কাহারো কাছে তাহার 'বিশ্বনাথ'কে রাখিয়া যাইতে তাহার সাহস হয় না,—যদি চাকরাণী তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়, যদি তাহার কোল হইতে সে পড়িয়া যায়। খোকা একটু বড় হইলেও তাহাকে লইয়া বাহির হইতে কনকের সাহস হইত না,—যার ছেলে সে যদি কাড়িয়া লয়! সে দিবারাত্রি ঘরে বসিয়া এই বালক বিশ্বনাথের সেবা করিতে লাগিল, এবং অধীর ভাবে কেবল সেই দিনটির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল—যেদিন তার ক্ষুদ্র 'বাবা বিশ্বনাথ' তাকে 'মা!' বলিয়া ডাকিবে,—যে দিন তাহার বিড়ম্বিত নারীজীবন মাতৃত্বের গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

সত্যই তাহার জীবনে সে দিন আসিল। এক দিন সকালে বিশ্বনাথ ঘুমাইতেছিল, সে নিকটে বসিয়া অনিমেষনেত্রে শিশুর মুখপানে চাহিয়া ছিল। শিশু জাগিয়া চক্ষু মুদিত অবস্থাতেই পাশে হাতড়াইয়া দেখিল, তার চিরপরিচিত বুকখানি নাই। খোকা কাঁদিয়া উঠিয়া ডাকিল—'মা!' তার মা একেবারে পাগলিনীর মত অধীর হইয়া, তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার মুখে শত শত চুম্বন করিয়া ক্ষুধার্ত্ত অন্তরের তীব্র জ্বালা দূর করিল। কনকের ভিতরকার সুপ্ত জননী শিশুর 'মা' ডাকের সোণার কাটির স্পর্শে আজ সত্য সত্যই জাগিয়া উঠিল।

সাহিত্য-সংবাদ

প্রবীণ সাহিত্যিক "পরিণয়-কাহিনী" "হেমেন্দ্রলাল", "সরমার সুখ" প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত নূতন ধরণের নূতন উপন্যাস "উৎপলা" প্রকাশিত হইল; মূল্য ২৷৷০।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস "সনাতন গোস্বামী" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২৲।

ডাঃ রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর প্রণীত "খাদ্য" চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল; মূল্য ২৲।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস "মহাপ্রস্থান" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৸০।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত "শান্তিকুটীর" বাহির হইয়াছে; মূল্য ১৷৷০।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষ প্রণীত নূতন নাটক "স্বাধীন গরীব" প্রকাশিত হইল; মূল্য ৷৷০।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত নূতন কাব্য "প্রেমের জয়" বা "সুভদ্রা হরণ" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত "দেবদেবী ও ঋষি বংশাবলী" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৷৷৵০।

শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর সাধু প্রকাশিত নূতন সামাজিক নাটক "প্রতিমা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১।৵০।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু প্রণীত নূতন উপন্যাস "গলগ্রহ" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "পয়জারে পয়মাল" ও "দরোর প্রেম" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য প্রত্যেকখানি ৸০।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত নূতন নাটক "দিল্লী অধিকার" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১।০।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea,**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.

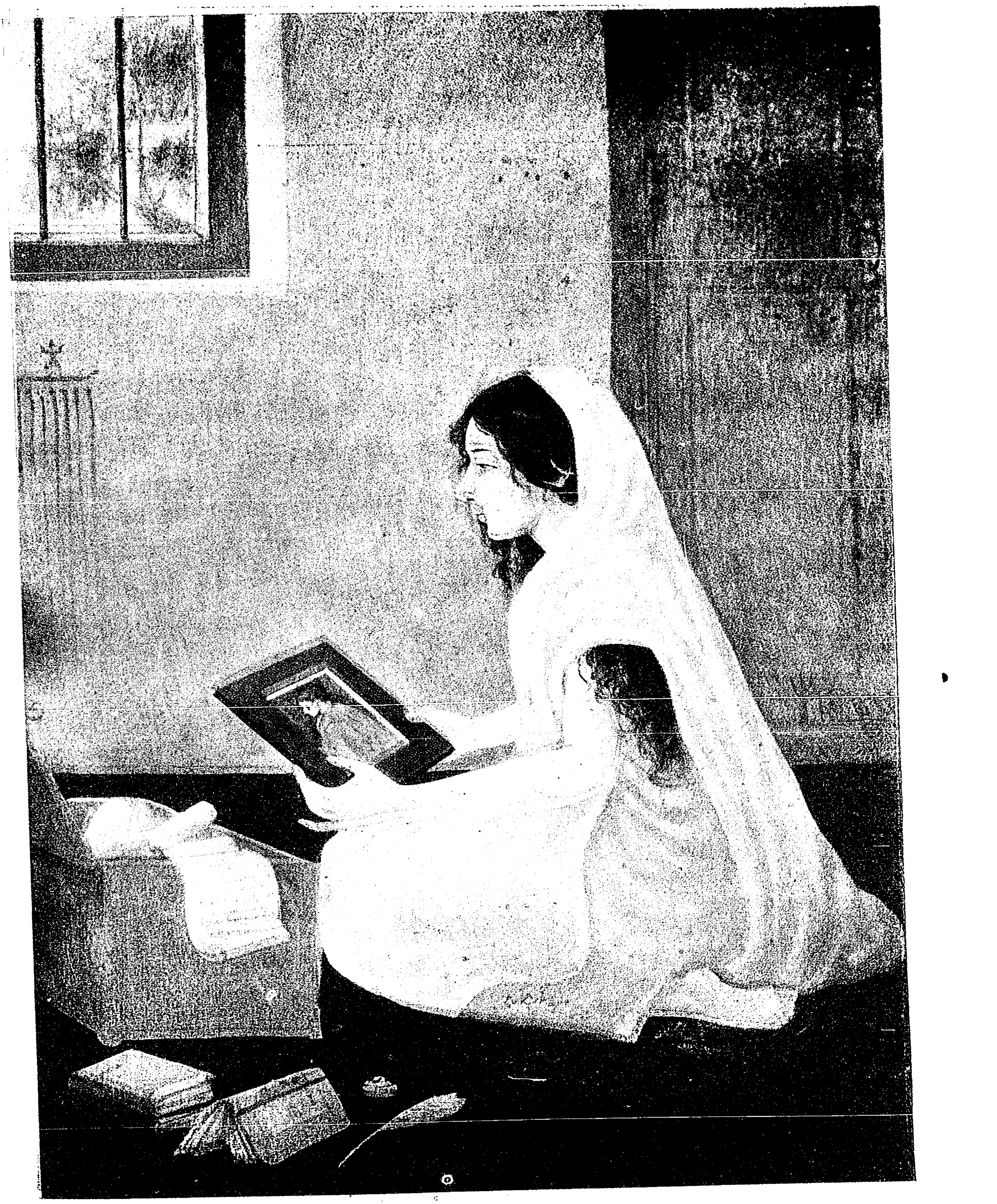

শেষ সম্বল

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATION